ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের

ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এ্যাম্পেয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮) অবলম্বনে

মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে

এনায়েত রসুল

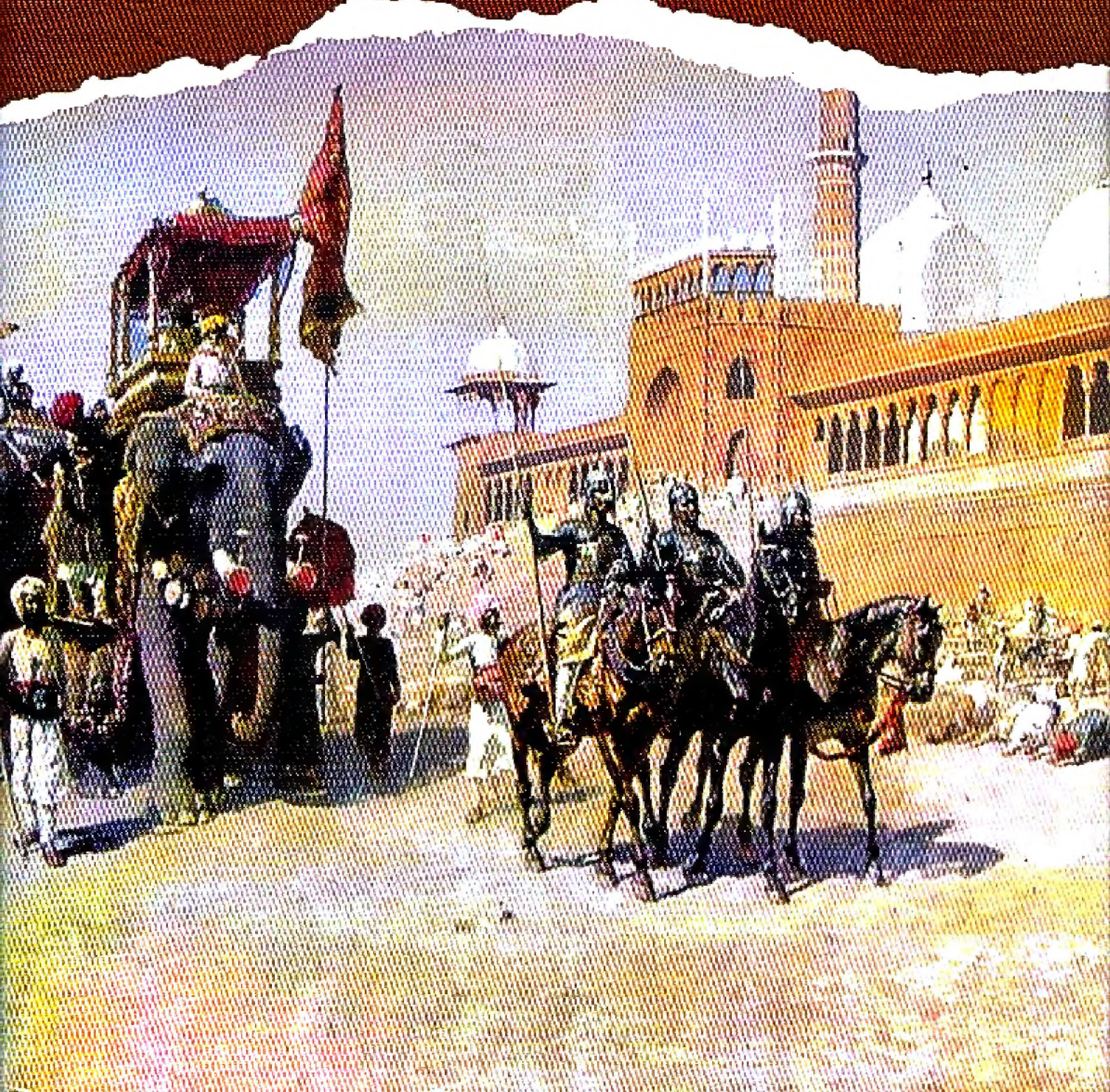

এনায়েত রসুল স্বনামখ্যাত শিশুসাহিত্যিক মোহাম্মদ নাসির আলী ও বেগম মেহেরুন নিসার দ্বিতীয় পুত্র। তিনি ১৯৫৩ সালের ১২ জুন বিক্রমপুরের ধাইদা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৫ সালে ইসলামিয়া ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অষ্টম শ্রেণিতে পড়ার সময় বার্ষিক ম্যাগাজিন 'কোরক'-এ স্বরচিত গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রথম লেখালেখির জগতে প্রবেশ। প্রথম লেখা ছড়া প্রকাশিত হয় সেই একই বছর 'জুনিয়র রেডক্রশ' পত্রিকায়। পড়ালেখা করেছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে। সব বয়সী পাঠকের জন্যে লেখেন এনায়েত রসুল। তবে শিশুসাহিত্য সৃষ্টির প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে তিনি মনে করেন। শিশু-কিশোর মানসিকতা উপযোগী গল্প-ছড়া লেখা এবং তাতে সহজ শব্দের ব্যবহার করা এনায়েত রসুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ পর্যন্ত প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা ১৬৭।

এনায়েত রসুল ২০০৮ সালে 'মিনা মিডিয়া এ্যাওয়ার্ড', এবং শিশুসাহিত্যে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ 'মাসিক বিক্রমপুর সাহিত্য সম্মাননা পুরস্কার ২০১৫' অর্জন করেন। এ ছাড়া তিনি 'অনুশীলন সাহিত্য পরিষদ-২০১৫' সম্মাননায় ভূষিত হন। বর্তমানে জাতীয় দৈনিক 'আমার দেশ'-এ সহ-সম্পাদক ও শিশুকিশোর পাতা 'এক্কাদোক্কা'র সম্পাদক হিসেবে কর্মরত।

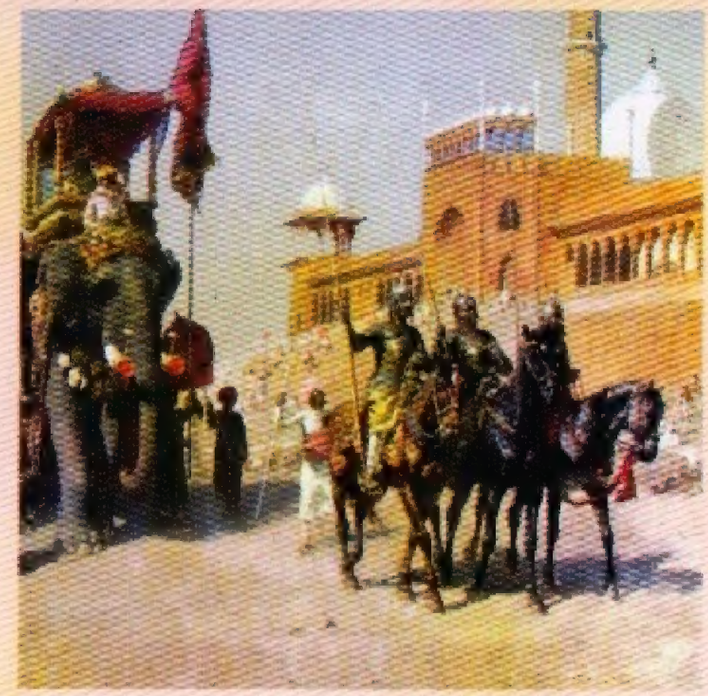

সুপ্রাচীনকাল থেকেই ধন-সম্পদ ও শিল্প-সাহিত্যে ভরপুর এ উপমহাদেশ ছিলো এক সমৃদ্ধ জনপদ। এখানকার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা ছড়িয়ে পড়েছিলো সারা পৃথিবীতে। আর এ কারণেই বহির্বিশ্বের মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ উপমহাদেশ ভ্রমণ করেছেন। যাঁরা ভ্রমণে এসেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ইবনে বতুতা, ফা হিয়েন, হিউয়েন সাং, টার্ভিনিয়ার প্রমুখ। এঁরা বিপুল কৌতূহল নিয়ে এ জনপদের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন।

ফরাসী পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার মোগল সাম্রাজ্য ভ্রমণে এসেছেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলের শেষ দিকে ১৬৫৬ সালে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে তিনি সমাজের সকল পেশার ও ধর্মের মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন এবং সে সব কথা পরবর্তী সময় 'ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এ্যাম্পেয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮)' বইতে লিখে গেছেন। সে বইটি বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে 'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' নামে। পাঁচশত বছর আগের স্বনামখ্যাত ফরাসী পর্যটকের লেখা এ বইটি ইতিহাসপ্রিয় পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

মোগল সাম্রাজের পথে পথে

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের

ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এ্যাম্পেয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮) অবলম্বনে

মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে

এনায়েত রসুল

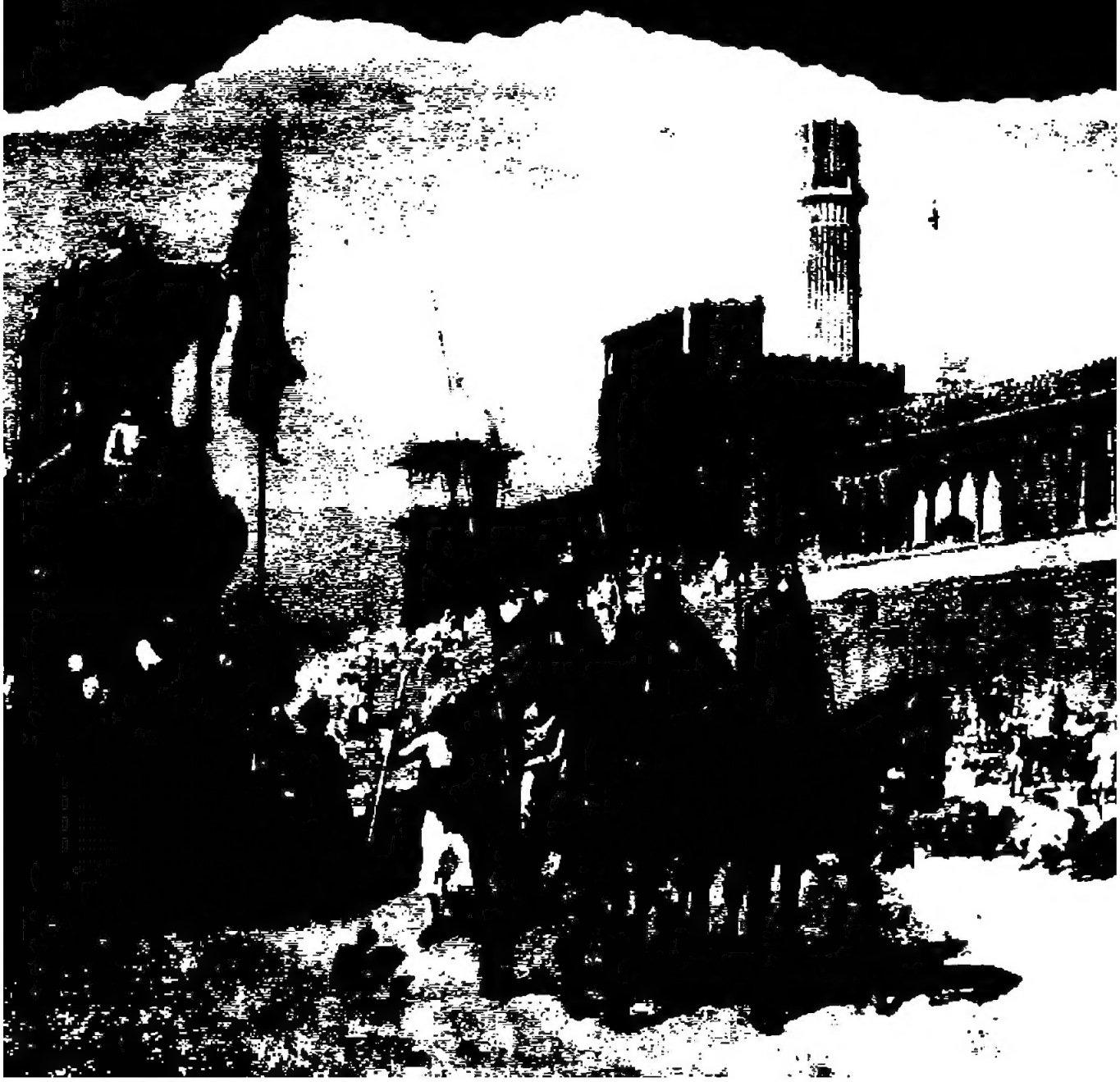

©
এনায়েত রসুল

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৮

স্বরবৃত্ত প্রকাশন ৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০'র পক্ষে মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ঢাকা প্রিন্টার্স ৩৬ শ্রীশদাস লেন ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত
অক্ষরবিন্যাস ঈশিন কম্পিউটার ৩৪ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
রাজিবুর রহমান রোমেল

দাম : ৪০০ টাকা মাত্র

ISBN : 978 984 91871 0 3

Mogul Samrazzer Pothe Pothe By Enayet Rasul
Published by Mohammad Rahmat Ullah
Sarobritto Prokashon, 38/2Ka Banglabazar, Dhaka-1100
First Published : February 2018, Price Tk. 400 Only $ 5.00 £ 3.00

U.K. Distributor : Sangeeta Limited, 23 Brick Lane, London.
U.S.A. Distributor : Muktadhara, 37-69. 2nd floor, 74 St, Jackson Height, N.Y. 11372.
Canada Distributor : Anyamela, 300 Danforth Ave. (1st floor, Suite-202), Toronto
ATN Mega Store, 2970 Danforth Ave, Toronto.
স্বরবৃত্ত প্রকাশন-এর যেকোনো বই ঘরে বসেই পেতে ভিজিট করুন : www.rokomari.com.sarobritto

উৎসর্গ

আমার হজসঙ্গী
আলহাজ হাবিবুর রহমান
শ্রদ্ধাস্পদেষু
প্রিয়জনেষু

সূচি

গ্রন্থ প্রসঙ্গে [নয়]
মুখবন্ধ [তের]
ভারতবর্ষ ও ভিনদেশী পর্যটক [পনের]
বার্নিয়ার প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স [তেইশ]

শাহজাদা-শাহজাদীদের কথা ২৭—৩৬
শাহজাদা দারা শিকো কেমন ছিলেন। সুলতান সুজার চরিত্র। আওরঙ্গজেবের চরিত্র। মুরাদের চরিত্র। শাহজাদী জাহান আরার মানসিকতা। বিভিন্ন দেশে প্রেমের ধরন। কনিষ্ঠা শাহজাদী রওশন আরার স্বভাব।

গৃহযুদ্ধোত্তর ঘটনা ৩৭—৭৬
উজবেক তাতার দূতদের কথা। ডাচ দূতের কাহিনী। আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অন্য দিক। এক খোজার বিচিত্র প্রেম কাহিনী। শাহজাদীর প্রেম। আরো পাঁচ দূতের কথা। হাব্‌সী দেশের কথা। সুলতান আকবরের শিক্ষাব্যবস্থা। ইরানের দূত। আওরঙ্গজেবের শিক্ষক মোল্লা শাহের কাহিনী। জ্যোতিষীদের মজার গল্প। ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি। সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র। মগ ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কথা। আওরঙ্গজেবের মহত্ত্ব।

ভারতবর্ষের কথা ৭৭—১১৫
মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লেখা বার্নিয়ারের পত্র। ভারতীয় দেশীয় রাজাদের কথা। রাজপুত্রদের শৌর্যবীর্য। 'মোগল' কাদের বলা হয়? মোগল সেনাবাহিনীর কথা। ওমরাহদের কথা। সম্রাটের বিলাস-ভ্রমণ। মনসবদারের মর্যাদা। রৌজিনদার বা পদাতিক। পদাতিক ও বন্দুকচি। গোলন্দাজ বাহিনী। মোগলদের ধনদৌলত। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ। আর্থিক অবনতির কারণ কি? শিল্পী ও শিল্পকলার অবস্থা। শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা। ভারত ও অন্যান্য দেশ। বিচারের সুযোগ।

দিল্লী ও আগ্রা ১১৬—১৭১
মঁশিয়ে ভেয়ারের কাছে লেখা বার্নিয়ারের পত্র। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শহর। দিল্লীর কাহিনী। দুর্গের অভ্যন্তর। বাজারের জ্যোতিষী। পর্তুগীজ জ্যোতিষী। বাইরের শহর। মধ্যযুগের শহর। দোকানপাটের কথা। খাবারদাবারের কথা। কারিগরদের কথা। রাজপ্রাসাদের বর্ণনা। কারখানার বর্ণনা। আমখাসের কথা। সম্রাট

সন্দর্শনের প্রথা। মোসাহেবির উৎসব। হারেমের মেলার বর্ণনা। কাঞ্চনবালার কাহিনী। বার্নাডের কথা। হাতির লড়াই। দিল্লীর মসজিদ ও সরাই। দিল্লীর লোকজন। আগ্রার কথা। আগ্রার পাদ্‌রী সাহেব। জাহাঙ্গীরের খ্রিস্টান প্রীতি। খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম। ডাচ বণিকদের কথা। তাজমহল।

ভারতের হিন্দুদের কথা ১৭২—২০৯

ফরাসী ও ভারতীয় সূর্যগ্রহণ। পুরীর জগন্নাথ। সতীদাহ ও সহমরণ। সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কথা। হিন্দুশাস্ত্রের কথা। সংস্কৃত চর্চা ও কাশীধামের কথা। হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা। হিন্দুদের ভৌগোলিক ধারণা। হিন্দু দেবদেবীর কথা। হিন্দুদের কালগণনা। সুফীদের ধর্ম ও দর্শন।

সোনার বাংলা ২১০—২২০

বাংলাদেশের সম্পদ প্রসঙ্গে। বাংলাদেশের আহার্যের প্রাচুর্য। বাংলাদেশের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণের কারণ। বাংলার জলবায়ু। বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। মগ দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী। পিপলি বন্দর থেকে হুগলীর পথে বার্নিয়ার।

পরিশিষ্ট • ২২১

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' বইটির মূল লেখক হিসেবে বিখ্যাত পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের নাম উল্লেখ করায় বিদগ্ধ পাঠকদের মনে হতে পারে এটি বার্নিয়ারের লেখা Tarvels in the Mogul Empire (1656-1668 A.D.) বইটির হুবহু অনুবাদকর্ম। প্রকৃত পক্ষে, বাংলায় প্রণীত এ বইটিকে কোনো ভাবেই বার্নিয়ারের মোগল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ কাহিনীর হুবহু অনুবাদকর্ম বলা যাবে না। অন্যদিকে, এ বইটির বিষয়বস্তু বার্নিয়ারের ভ্রমণ বর্ণনা ও উপলব্ধি থেকে আলাদা কিছুও নয়। এই পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের সমাধান হিসেবে বলা যায়, 'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' বার্নিয়ারের ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এ্যাম্পেয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮ খ্রি.)' বইটির সাহায্য নিয়ে লেখা রয়েছে সে কারণে আমাকে অনুবাদকও বলা যেতে পারে–আবার ভাষান্তরকারকও বলা যেতে পারে। এই দুই সম্বোধনই আমার জন্য সমান অর্থ বহন করে।

এই সত্যকথনের পর অনুসন্ধিৎসু পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন আসতে পারে, আমি যদি বার্নিয়ারের ট্রাভেলস ইন দ্য মোগল এ্যাম্পেয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮ খ্রি.) বইটির তথ্য-প্রমাণ, বক্তব্য ও বিশ্লেষণকে নির্ভর করে এ বইটি লিখে থাকি, তাহলে তাঁর মূল বইটি কেনো হুবহু অনুবাদ করিনি? বিদগ্ধ পাঠকদের এ প্রশ্নের জবাবে বিনয়ের সঙ্গে বলবো, একাধিক যুক্তিসঙ্গত কারণেই বার্নিয়ারের সেই জগতখ্যাত বইটির হুবহু অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিনি। এ সত্যটিকে তো মেনে নিতেই হবে যে, মোগল যুগ থেকে একবিংশ শতাব্দীতে পা রাখতে গিয়ে আমরা এক দীর্ঘ সময় পেরিয়ে এসেছি। এ সময়ের ভেতর ইতিহাসের নানান স্থাপনা ও ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ-দৃষ্টিভঙ্গিও বদলে গেছে। এ কারণে সেই সময়কে নিয়ে লেখা কিছু কিছু ভ্রমণ কাহিনীতে এমন অনেক কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, যে সবের আবেদন এ সময়ে নেই বললেই চলে। অথবা সে সময়ের মূল্যায়ন বর্তমান সময়ে স্থূল মনে হচ্ছে। যেমন যুদ্ধযাত্রা বা রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সুদীর্ঘ বিবরণ। এসবের ঐতিহাসিক মূল্য নেই– এ কথা বলার মতো ধৃষ্টতা দেখাবো না। তবে এখনকার পাঠকদের জীবনে বই পড়ার মতো সময় খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আর কোনো ঘটনার দীর্ঘ বর্ণনা পড়ার মতো ধৈর্যও তাদের নেই। এ সব বিবেচনায় রেখে

অতিকথন ও ঐতিহাসিক বিচারে কম আবেদনময় কিছু বর্ণনা আক্ষরিক অনুবাদ করা থেকে বিরত থেকেছি।

মোগল যুগকে নিয়ে লেখা যে কোনো প্রামাণ্য ইতিহাসের বইয়ে রাজা-বাদশাহদের জীবনযাত্রার দীর্ঘ বর্ণনা পাওয়া যায়– পাওয়া যায় না যা তা হলো সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপকরণ। বার্নিয়ারের মোগল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ নিয়ে লেখা বইটিতে সব তথ্য খুব সমৃদ্ধভাবেই রয়েছে। এ কারণেই তাঁর এ বইটি ভ্রমণ সংক্রান্ত সাহিত্য অঙ্গনে চিরস্থায়ী আসন অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে যারা মোগল বাদশাহদের কর্মকাণ্ড নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা বার্নিয়ারের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্বীকার করে নিয়েছেন। যেমন সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস ১৮৫৩ সালে এক চিঠিতে ফ্রেডরিক এঙ্গেলসকে লিখেছেন :

...One can read noting more brilliant, Vivid and striking than old Francois Bernier (nine years physician to Aurangzebe):"

এ চিঠির জবাবে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : "Old Bernier's things are really very fine. It is a real delight once more to read something by a sober old clear-headed Frenchman, who keeps hitting the nail on the haed."... চিঠি দুটির ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় রেখে এ বইয়ের পরিশিষ্টে তার অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে।

ইতিহাসপ্রেমীরা সামাজিক ইতিহাসের বিশ্বাসযোগ্য উপাদানের জন্য বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীকে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করেন। 'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' বইটিতে সেই মূল্যবান সম্পদকে সচেতনতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। সচেতনতার কারণেই The History of the Late Rebellion in the State of the Great Mogul এবং Remarkable Occurrences after the War নামে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় দুটি পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ না করে সারানুবাদ করা হয়েছে। এর ভেতর শুধু সেই অংশগুলোই রাখা হয়েছে যার মাঝে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান রয়েছে। অবশিষ্টাংশ নিষ্প্রয়োজনীয় বর্ণনায় ভরপুর থাকায় তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

ইতিহাসবিদদের বিবেচনায় বার্নিয়ারের মোগল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ কাহিনীর অন্যতম মূল্যবান সম্পদ হলো তাঁর লিখিত কিছু চিঠিপত্র। সে কারণে চিঠিপত্রগুলোর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করা হয়েছে। অবশ্য কাশ্মিরে যুদ্ধযাত্রার বিবরণ সম্বলিত কয়েকটি চিঠিকে এ তালিকায় রাখা হয়নি। এসব চিঠির মধ্যে যতোটুকু সামাজিক ইতিহাসের উপাদান রয়েছে কার্ল মার্কস তাঁর চিঠিতে তা উল্লেখ করেছেন। মার্কসের চিঠির অনুবাদ এ বইয়ের পরিশিষ্টিতে সংযোজিত হয়েছে। কৌতূহলী পাঠক সেখানে থেকে তা পড়ে নিতে পারবেন।

এ নিশ্চয়তা দেয়া যাচ্ছে যে, ট্রাভেল্‌স ইন দ্য মোগল এ্যাম্পায়ার (১৬৫৮-১৬৬৮ খ্রি.) বইটিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধের, তথা মোগল

আমলের সামাজিক ইতিহাসের যে সব মূল্যবান উপাদান রয়েছে, 'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' বইটির জন্য তার সবটুকুই অনুবাদ করা হয়েছে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের দেশের ইতিহাস-সাহিত্যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান কমই রয়েছে। যারা ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব পালন করেছেন তারা রাজা-বাদশাহদের ক্ষমতা দখল নিয়ে যতোটা তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের শাসন-পদ্ধতি এবং জনজীবন ও নাগরিক সমাজের জীবন-সংগ্রামকে ততোটা প্রাধান্য দেননি। ইতিহাস লিখিয়েরা যতোদিন ইতিহাসের অবহেলিত এই দিকগুলো তাদের লেখার ভেতর তুলে না আনবেন, ততোদিন এসব কর্ম প্রকৃত ইতিহাসগ্রন্থ হয়ে উঠবে না। বার্নিয়ারের লেখার মাঝে এ ধরনের কাঙ্ক্ষিত ও প্রয়োজনীয় তথ্য রয়েছে বলেই এ বইটিকে নিজের মতো করে পাঠককুলের হাতে তুলে দেয়ার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ইতিহাস-সাহিত্যের ভান্ডারকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য এ ধরনের ভ্রমণ কাহিনী অনুবাদ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

অনুবাদ প্রসঙ্গে বলার সুযোগে বিনয়ের সঙ্গে একটা দুর্বলতার কথা জানিয়ে দিই, অনুবাদের কাজে Literal Translation, অর্থাৎ 'অক্ষরিক অনুবাদ' বলে যে একটি পদ্ধতি রয়েছে, তার প্রতি আমার আস্থা নেই। আমি লাইন ধরে অনুবাদ (আক্ষরিক) করার চেয়ে রূপান্তর করাকে বেশি যুক্তিসঙ্গত মনে করি। সে সঙ্গে এ কথাও বিশ্বাস করি, সেই রূপান্তর করতে গিয়ে কিছুতেই মূল লেখকের তথ্য-উপাত্ত ও ভাবনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না। সেই নীতিতে অবিচল থেকে বার্নিয়ারের কোনো বিবরণ ও মন্তব্যকে বিকৃত না করে যথাযথ সাবধানতার সঙ্গে গ্রহণ করার কারণে বইটির মূল লেখক হিসেবে ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের নাম ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে।

রূপান্তর কর্মের সময় Travels in the Mogul Empire (1656-1668 A.D) : By Francois Bernier ; Second Edition, Revised by Vincent A. Smith (Oxford, 1914) বইটি ব্যবহার করা হয়েছে। আশা রাখছি, যে সব পাঠক ইংরেজি অনুবাদ পড়েছেন বা পড়ার সুযোগ পাননি তাদের কেউই 'মোগল সাম্রাজ্যের পথে পথে' পড়ে নিরাশ হবেন না।

আল্লাহ সবাইকে সুখী রাখুন!

—এনায়েত রসুল
১ জানুয়ারি ২০১৮

মুখবন্ধ

ইতিহাস বৃক্ষের শিকড়ের মতো। যে শিকড় মাটির যতোটা গভীরে প্রবিষ্ট তার বৃক্ষ ততোটাই মজবুত ভিতের ওপর দণ্ডায়মান। ঠিক একই রকম, যে জাতির ইতিহাস যতো প্রাচীন সে জাতি ততোটাই সমৃদ্ধ। এদিক দিয়ে বিচার করলে আমরা, ভারতবর্ষের অধিবাসীরা নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ জাতি। কারণ আমরা নানা যুগের নানা জাতির সুপ্রাচীন ও বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য ধারণ করে চলেছি আমাদের আচার-ব্যবহার ও জীবনস্রোতের মাঝে।

বর্তমান সময়ে 'ইতিহাস' বলতে আমাদের মনে যে বোধটি জেগে ওঠে, ইতিহাসের যে অবকাঠামোর কথা মনে পড়ে, একশো বছর আগেও তেমন ইতিহাস লেখা হতো না। কারণ, ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য কি, কেমন করে একটি তথ্য-সমৃদ্ধ ইতিহাস লেখা যায়– সে সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। এ কারণেই আজকাল ইতিহাস বলতে আমরা যে মাধ্যমটিকে বুঝে থাকি মধ্য বা প্রাচীন যুগের ঘটনাবলি নিয়ে আগে তেমন কোনো ইতিহাস লেখা হয়নি।

কিছুদিন আগেও ইতিহাস বলতে রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা, রাজা-বাদশাহদের বংশ-পরিচয় আর রাজ্য জয়ের কথাকে বোঝাতো। তাই বলে আমি এ কথা বলতে চাইছি না, অতীতে ইতিহাস বলতে পণ্ডিতজনেরা যা লিখে গেছেন বর্তমান যুগে তার কোনো মূল্য নেই। ইতিহাসের পাঠক ও গবেষকদের কাছে ঘটনা ও তারিখ বা বংশক্রম– কোনোটাই অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রকৃত সত্য হলো, ঘটনাক্রমই ইতিহাস। আর ঘটনার পটভূমি ছাড়া রচিত ইতিহাস আত্মা ছাড়া দেহের মতো অসাড়– মূল্যহীন। তারপরও বলতে হবে, ইতিহাস শুধু ঘটনাক্রম বা তারিখের তালিকা নয়– যুগের কথা, যুগের সংস্কৃতি, রীতিনীতি, জনজীবনের ভেতরের আচার-ব্যবহার আর এর উত্থান-পতনের কথাই হলো বর্তমান যুগে ইতিহাসের স্বীকৃত সংজ্ঞা।

দেশে দেশে যে সব আদিবাসী রয়েছে, তাদের জীবনযাত্রা, তাদের পারিবারিক বন্ধন পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মাচরণ, কথ্য ও লিখ্য ভাষার ক্রমবিকাশ, যুদ্ধ ও সাংসারিক কাজে ব্যবহার্য হাতিয়ার, তৈজসপত্রের বর্ণনা, মুদ্রা ব্যবস্থা ইত্যাদির ব্যাপক আলোচনা ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

সুপ্রাচীনকালেই আমাদের এই অঞ্চলটি ছিল এক সমৃদ্ধ জনপদ। সিন্ধু নদের তীর ছুঁয়ে গড়ে উঠেছিলো সিন্ধু সভ্যতা। এ ছাড়া তক্ষশিলা আর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিলো বিশ্বময়। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক গৌতম বৌদ্ধ, চানক্য, সম্রাট অশোক, বিক্রমাদিত্য, হর্ষবর্ধন, চন্দ্রগুপ্তসহ বহু গুণীজনের কীর্তি ও কর্মের আলোয় আলোকিত ভারতবর্ষ নিয়ে বহির্বিশ্বের মানুষদের মাঝে দুর্বার কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিলো। শিল্প-সংস্কৃতি ও জীবনাচারে ঋদ্ধ এ অঞ্চলগুলো ঘুরে যাওয়ার জন্য তাঁদের মন প্রতিনিয়ত তাগিদ দিয়েছে। পরবর্তী সময় তাঁদের অনেকেই এখানে এসেছেন। সবার নাম আমাদের জানা নেই। আর যাঁদের নাম জানা রয়েছে তাঁদের সংখ্যাও নেহায়েত কম নয়। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার। ১৬৫৮ সালের শেষভাগে ভারতে আসেন তিনি। প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ তখন ছিল মোগল শাসনাধীন।

মোগল সাম্রাজ্যের বহু অঞ্চলে ঘুরে বেড়িয়েছেন বার্নিয়ার। সে সময় তাঁকে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সহ বহু রাজপুরুষ, আমাত্য, আমির-উমরাহ ও সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। শুধু একজন শিক্ষিত চিকিৎসকই ছিলেন না তিনি, কোনো ঘটনাকে দেখে তার কার্য-কারণ খুঁজে বের করা এবং নিরপেক্ষভাবে তা লিপিবদ্ধ করার তাগিদ এবং যোগ্যতাও তাঁর ছিল। যে বছরগুলো তিনি মোগল সাম্রাজ্যে কাটিয়ে গেছেন তার ওপর ভিত্তি করে লেখা ভ্রমণ কাহিনী মোগল যুগের বহু ঘটনা ও তার বিশ্লেষণে পূর্ণ। এ কারণেই এ বইটি বাংলা ভাষায় রূপান্তর করে ইতিহাসান্বেষী পাঠকদের হাতে তুলে দেয়ার তাগিদ অনুভব করেছি।

বইটি পাঠকদের সামান্যতমও কাজে লাগলে আমাদের এ প্রয়াস সার্থক হবে।

আল্লাহ সবার মঙ্গল করুন।

ভারতবর্ষ ও ভিনদেশী পর্যটক

এ কথা নির্ভরতার সঙ্গে বলা যায়, বিভিন্ন সময় আমাদের এই উপমহাদেশে যতো পর্যটক এসেছেন, অন্য কোনো দেশে ততো পর্যটক যাননি এবং সে সব দেশ নিয়ে এতো ভ্রমণ কাহিনীও লেখা হয়নি।

ভারতবর্ষের রাজা-বাদশাহ, ইসলাম, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম, ঐশ্বর্য, শিল্পকলা, শাস্ত্রচর্চা, অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পদ যুগে যুগে বিদেশীদের আকর্ষণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ এসেছেন সিংহাসন দখল করতে, কেউ এসেছেন অর্থ উপার্জন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জনের তাগিদে। এদের মধ্যে অনেক পর্যটক এসেছেন পুব থেকে, অনেকে এসেছেন পশ্চিম থেকে। গ্রীক, চীনা, আরবীয় মুসলিম, ইউরোপীয় খ্রিস্টান– সকল ধর্মের, সকল দেশের পর্যটক এসেছেন এ উপমহাদেশে। তাদের মধ্যে কেউ মনে করেছেন এ দেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান অর্জন ও ধর্ম সাধনার মহাতীর্থ, কেউ মনে করেছেন ধনরত্ন লুণ্ঠনের স্বর্গরাজ্য।

প্রাচীন যুগে চীনা পর্যটকরা এসেছেন প্রধানত ভারতবর্ষে প্রচলিত ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমায় মুগ্ধ হয়ে। কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপীয় পর্যটকরা এসেছেন ধনরত্নের লোভে। তার আগে গ্রীক ও রোমান পর্যটকরা এসেছেন ধর্ম ও অর্থ, সংস্কৃতি ও সম্পদ– এসবের লোভে নাবিক ও বণিকের ছদ্মবেশে। কেউবা রাজদূত সেজে। তবুও তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ ভারতবর্ষীয় ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে।

আমরা জানি, গ্রীক দূত মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) লেখা ভারতবর্ষের বিবরণ না থাকলে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াতো। তার ওপর মেগাস্থিনিসের আসল বইটি হারিয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তী লেখকদের ব্যাপক উদ্ধৃতি থেকেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। বিশেষ করে রোমান ভূগোলবিদ স্ট্র্যাবোর কাছে আমরা এর জন্য ঋণী।

মেগাস্থিনিসের আগে সম্রাট আলেকজান্ডারের নৌ-সেনাপতি নিয়ার্কাসও উদ্ধৃতি আকারে ভারতবর্ষের কথা লিখে গেছেন। জে. ডবিস্নউ. ম্যাক ক্রিন্ডিলের লেখা Ancient India as described by Megasthenes and arrian (1877 A.D.) গ্রন্থ থেকেও মেগাস্থিনিসের সময়কার ভারতবর্ষের বিবরণ জানতে পারা যায়।

খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আলেকজান্ড্রিয়ান নাবিক হিপ্পলাস ভারতের উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব উপকূল ঘুরে 'প্যারিপাল্‌স মেরিস অ্যারিথ্রোয়ি' নামে যে গাইড বুক লিখে গেছেন, এ উপমহাদেশের প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তার মূল্যও কম নয়।

এসব গ্রীক ও রোমান নাবিক, দূত, সেনাপতি ও পর্যটকের পর চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনীগুলোর কথা উল্লেখ করতে হয়। খ্রিস্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী থেকে প্রায় নবম শতাব্দী পর্যন্ত একাধিক চীনা পরিব্রাজক এ দেশে এসেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত তাঁরা হলেন :

ফা হিয়েন (Fa Hian) : ৩৯৯– ৪১৪ সাল।
হিউয়েন সাং (Yuan Chawang) : ৬২৯–৬৪৫ সাল।
আই সিং (I tsing) : ৬৭৩ সাল।
সুং উন (Sung Yung), হুই সেং (Hwi Seng) ও কুং (O Kung) প্রমুখ : ৬০০–৮০০ সাল।

চীনা পরিব্রাজকদের ভ্রমণ কাহিনী প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদান। বিশেষ করে ফা হিয়েন ও হিউয়েন সাংয়ের ভ্রমণ কাহিনী না থাকলে সে যুগের ভারতবর্ষের সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাস উদ্ধার করা কষ্টসাধ্য হতো।

প্রাচীন হিন্দুযুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষীয় ইতিহাসে বিদেশী পর্যটকদের দান সম্পর্কে মোটামুটি এই হলো সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মুসলিম যুগে বেশ কয়েকজন ইউরোপীয় ও মুসলিম পর্যটক এই উপমাহাদেশে এসেছেন। মুসলমানদের মধ্যে সর্বপ্রথম বলা যায় ইবনে বতুতার (Ibn Batuta– 'The traveller of Islam') নাম। তিনি মোহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকালে ১৩৪২ থেকে ১৩৪৭ সাল পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করেন। তুঘলক যুগের ভারত সম্বন্ধে তাঁর বিবরণে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কেও তিনি অনেক কথা লিখে গেছেন।

বলা যায় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে বাণিজ্য যুগের সূচনা হয়। বণিকসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে ধনরত্নের লোভে সেই থেকে এশিয়ায় যে সব ইউরোপীয় বণিক অভিযান করেন তাঁদের মধ্যে ইতালীয় বণিক মার্কো পোলো অন্যতম।

মার্কো পোলো ও ইবনে বতুতার পর রুশ পর্যটক অ্যাথানাসাস নিকিটিনের (Athanasius Nikitin) নাম করতে হয়। বাহমনী সুলতান তৃতীয় মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৬৬৪-১৪৮২) নিকিটিন ১৪৭০ থেকে ১৪৭৪ সালের মধ্যে দক্ষিণপাথে আসেন। নিকিটিনের ভ্রমণ কাহিনী 'ইন্ডিয়ান অ্যান্ড দ্যা

ফিফটিন সেঞ্চুরি' বইটি এইচ. আর. মেজর কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ১৮৫৭ সালে হ্যাকলুইট সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাসের জন্য সম্রাট আকবরের অর্থমন্ত্রী ও নবরত্ন সভার অন্যতম সদস্য স্বনামখ্যাত আবুল ফজলের 'আকবরনামা' থাকতে কোনো বিদেশী ভ্রমণ কাহিনীর শরণাপন্ন হবার প্রয়োজন পড়ে না।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল থেকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের মধ্যে যে সব ইউরোপীয় পর্যটক ও দূত ভারতবর্ষে এসেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন:

উইলিয়াম হকিন্স	(William Hawkins)	: ১৬০১-১৬১২
টমাস রো	(Sir Thoms Roe)	: ১৬১৫-১৬১৯
ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার	(Francois Bernier)	: ১৬৫৯-১৬৬৬
টাভার্নিয়ার	(Tavernier)	: ১৬৪০-১৬৬৭
ডা. ফ্রায়ার	(Dr. Fryer)	:ও ১৬৭২-১৬৮৯
ওভিংটন্	(Ovington)	: ১৬৮৯-১৬৯২
জেমেল্লি ক্যারেরি	(Gamelli Careri)	: ১৬৯৫
নিকোলাও মনুচ্চি	(Niccolao Manucci)	: ১৭০৪

ইংরেজ ক্যাপ্টেন ইউলিয়াম হকিন্স ১৬০৯ সালে 'নিউ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র প্রতিনিধি হিসেবে আগ্রায় জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজদের জন্য সুরাটে একটি বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠার অনুমতি আদায় করা। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তিনি জাহাঙ্গীরের বন্ধু হয়ে ওঠেন এবং তাঁর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদেও অংশগ্রহণ করেন। এ করণেই জাহাঙ্গীরের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে হকিন্স যে চিত্র এঁকেছেন তা অত্যন্ত জীবন্ত হয়েছে। তাঁর সে সব বিবরণ ডবিস্নউ. ফস্টারের 'Early Travellers in India' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী সময় সম্রাট জাহাঙ্গীর হকিন্সের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং ১৬১২ সালে হকিন্স স্বদেশের উদ্দেশে ভারত ছাড়েন। ফেরার পথে হকিন্স মৃত্যুবরণ করেন।

১৬১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেম্স জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রোকে রাষ্ট্রদূত করে পাঠান। রো তাঁর দৌত্য-জীবনের যে দিনপঞ্জী লিপিবদ্ধ করে গেছেন, ঐতিহাসিক উপাদান হিসেবে তা অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হয়ে আসছে।

চ্যাপলিন এডওয়ার্ড টেরি যে সব মজার কাহিনী লিখে গেছেন তার তুলনা হয় না। টেরির কাহিনী ফস্টারের পূর্বোক্ত গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং রোরের

দিনপঞ্জীও ফস্টারের সম্পদনায় প্রকাশিত হয়েছে (Roe'sw Embassy' : Edited by sir W.Foster, Hakluyt Society, 1899)।

ফরাসী চিকিৎসক ও পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে ভারত ভ্রমণে আসেন। ১৬৫৮ সালের শেষে তিনি সুরাটে পৌছান এবং কিছুদিন শাহজাদা দারা শিকোর সঙ্গী হিসেবে কাটান। শাহজাহান তখন মারাত্মক অসুখে ভুগছেন এবং সেই সুযোগে তাঁর পুত্র শাহজাদা সুজা, শাহজাদা আওরঙ্গজেব ও শাহজাদা মুরাদ সিংহাসনলোভে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছেন। বড় ভাই দারা শিকোর বিরুদ্ধে তাঁদের চক্রান্ত। গৃহযুদ্ধের আগুনে মোগল সাম্রাজ্য ভস্মস্তূপে পরিণত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এমন পরিবেশে বার্নিয়ার ভারতবর্ষে আসেন এবং প্রথমে দারা শিকো ও পরে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে দিল্লী, লাহোর ও কাশ্মীরে যান। এ সময় ফরাসী পর্যটক টাভার্নিয়ারের সঙ্গে বার্নিয়ারের দেখা হয়। বার্নিয়ার ও টাভার্নিয়ার একসঙ্গে বাংলাদেশে আসেন এবং রাজমহল থেকে তাঁরা দুদিকে চলে যান। বার্নিয়ার যান কাশিমবাজারের পথে এবং পরে বাংলাদেশ ঘুরে মসলিপট্টম ও গোলকুন্ডায় উপস্থিত হন। গোলকুন্ডায় থাকার সময় ১৬৬৩ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি সম্রাট শাহাজানের মৃত্যু-সংবাদ পান। ১৬৬৭ সালে সুরাট থেকে স্বদেশের পথে যাত্রা করেন বার্নিয়ার। এই সময় সুরাটেই তাঁর সঙ্গে ফরাসী পর্যটক মঁশিয়ে চার্দিনের (M. Chardin) সাক্ষাৎ হয়। টার্ভানিয়ার ও চার্দিন স্বর্ণকার ছিলেন, বার্নিয়ার ছিলেন সনদপ্রাপ্ত চিকিৎসক ও দার্শনিক।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে যে সব বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত হলেন ডা. ফ্রায়ার, ওভিংটন, ইতালীয় জেমেল্লি ক্যারেরি এবং ভেনিসীয় পর্যটক নিকোলাও মনুচ্চি।

ডা. ফ্রায়ারের 'New Account of india' গ্রন্থের মধ্যে শিবাজীর রাজত্বকালে মারাঠা জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়, সাধারণভাবে ভারতের কথা কিছু জানা যায় না। তার কারণ, ফ্রায়ার সুরাট ছাড়িয়ে বেশি দূর অগ্রসর হননি।

ফ্রায়ারের মতো ওভিংটনও (১৬৮৯-১৬৯২) মোগল দরবারের কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারেননি। তাই মুম্বাই ও সুরাটের ইংরেজ বণিকদের মুখে তিনি যা শুনেছেন, তাঁর 'Voyage to Suratt' গ্রন্থে তাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

জেমেল্লি ক্যারেরি ১৬৯৫ সালে আওরঙ্গজেবের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করেন এবং এর ফলে তাঁর প্রত্যক্ষ বিবরণ অনেক দিক থেকে মূল্যবান হয়েছে।

মনুচ্চিও দারা শিকোর অধীনে কিছুদিন গোলন্দাজের কাজ করেন। তারপর রাজা জয়সিংহের অধীনে বহাল হন। মুম্বাই ও গোয়ায় কিছুদিন

কাটিয়ে তিনি মাদ্রাজ গিয়ে বাস করেন এবং ১৭১৭ সালে সেখানে মারা যান। তাঁর বিখ্যাত বই 'Storia do Mogul' ডব্লিউ. আর্ভিন ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। অনূদিত বই A pepys of Mogul India' (London, 1908) নামে প্রকাশিত হয়।

এরকম প্রত্যক্ষ ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে সময় ও অভিজ্ঞতার বিচারে মনুচ্চি ছাড়া বার্নিয়ার ও টাভার্নিয়ারের কাহিনীর মূল্যই সবচেয়ে বেশি।

বার্নিয়ার ও টাভার্নিয়ার যে সময় এ উপমহাদেশে এসেছিলেন সে সময়কে এ অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্কটকাল বলা চলে। মোগল সাম্রাজ্যের সূর্য তখন অস্তাচলের পথে। মোগল যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির যা চূড়ান্ত বিকাশ হবার তা ততোদিনে হয়ে গেছে এবং অবনতির সূচনা হয়েছে। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে বার্নিয়ার ও টার্ভানিয়ার এ দেশে আসেন।

ব্যক্তি হিসেবে বার্নিয়ার ও টার্ভানিয়েরের মধ্যে পার্থক্য ছিল এবং এই পার্থক্যের জন্য তাঁদের পর্যবেক্ষণের মধ্যেও পার্থক্য ফুটে উঠেছে। 'মধ্যযুগের ভারত' সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্ট্যান্‌লে লেন-পুল তাঁর 'আওরঙ্গজেব' গ্রন্থের ভূমিকায় এ সম্পর্কে লিখেছেন :

> Bernier writes as a philosopher and man of the world : his contemporary Tavernier (1640-1667) Views india with the professional eye of a jeweller; nevertheless his Travels...contain many valuable pictures of Mughal life and character. (Aurangzib : S. Lane-Pool: Rulers of india Series).

বার্নিয়ার তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন সত্যদ্রষ্টার মতো। কিন্তু তাঁর সমকালীন পর্যটক টাভার্নিয়ার ভারতবর্ষকে দেখেছেন স্বর্ণকারের ব্যবসায়িক দৃষ্টি দিয়ে। তাহলেও টাভার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী মূল্যবান। কারণ মোগল যুগের জীবনযাত্রার ছবি তিনি কয়েক দিক দিয়ে ভালোই এঁকেছেন। বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী এদিক দিয়ে তুলনাহীন। যেমন তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তি, তেমনি তাঁর যথাযথ বর্ণনার ক্ষমতা। সংস্কার বা স্বার্থের দিক থেকে তিনি কোনো ঘটনার বা কোনো বিষয়ের বিচার করেননি। যা দেখেছেন– উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত, তা নিরপেক্ষভাবে বোঝার চেষ্টা করেছেন, বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে– শুধু হিরে-মুক্তোর সন্ধানে তিনি আসেননি। মোগল দরবারের ঐশ্বর্য ও চাকচিক্য দেখে তিনি মুগ্ধ হলেও মোহগ্রস্ত হননি। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাজদরবার থেকে বাইরের বাজার-ঘাট পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সম্রাট, আমির-ওমরাহ থেকে শুরু করে তিনি ভারতের সকল শ্রেণির মানুষের জীবনযাত্রা লক্ষ্য

করেছেন। তাদের কথা সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতো বর্ণনা করে গেছেন। তাই ধনরত্ন ছাড়াও তাঁর দৃষ্টি ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলার ওপর আকৃষ্ট হয়েছে। এমনকি সতীদাহ সম্পর্কেও তিনি বর্ণনা করে গেছেন।

মোগলদের রাজস্ব ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, জনসাধারণের অবস্থা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও তাদের জীবনযাত্রা, ক্রীড়া-কৌতুক, বিলাসিতা, আমোদ-প্রমোদ, ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম, শিল্পী ও শিল্পকলার প্রকৃতি সহ নানা বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। কোনোটিই তাঁর পরের মুখে শোনা কথা নয়, নিজের চোখে দেখা এবং নিজের জ্ঞান দিয়ে উপলব্ধি করা। এ কারণেই বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীকে নিঃসন্দেহে মোগল যুগের, বিশেষ করে ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের ভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রীক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিশেষ মূল্যবান প্রাথমিক উপাদান গ্রন্থ বলা যায়। আর এ কারণেই বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী অবলম্বন করে বাংলায় একটি বই প্রকাশের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের পরিচয়

১৬২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বার্নিয়ার ফ্রান্সের এ্যাজো নামে এক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। চাষবাস করাই ছিল তাঁদের পৈতৃক পেশা।

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার

ছেলেবেলা থেকেই বার্নিয়ার দেশ ভ্রমণে উৎসাহী ছিলেন। তখন ইউরোপের দুঃসাহসিক অভিযাত্রীরা অজানা দেশের সন্ধানে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে একের পর এক সফলতা অর্জন করছেন। পৃথিবীর ভূগোল ও মানচিত্র নতুন করে তৈরি হচ্ছে। নতুন নতুন দেশ মানুষের চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মানুষের মনে বাইরের মানুষকে জানার ও বাইরের দেশকে দেখার প্রবল ইচ্ছে জাগছে। এমন কৌতূহল ভরা যুগে সামান্য এক কৃষক-পরিবারে জন্ম হলেও বার্নিয়ার যুগপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যখন তাঁর বয়স ২৬-২৭ বছর, তখন তিনি উত্তর জার্মানি, পোল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও ইতালি ভ্রমণ করেছেন। সে সময়টা ছিল ১৬৪৭ থেকে ১৬৫০ সাল।

সেকালের শিক্ষা-দীক্ষার কথা বিবেচনায় আনলে বার্নিয়ারকে নিঃসন্দেহে শিক্ষিত ব্যক্তি বলা চলে। শুধু সাধারণ শিক্ষা নয়, বিজ্ঞান শিক্ষার দিকেও তাঁর আগ্রহ ছিল। ১৬৫২ সালের মে মাসে তিনি শারীরবিদ্যা বিষয়ে পরীক্ষা দিয়ে উর্ত্তীণ হন এবং মন্টিপেলিয়ের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করেন।

বিখ্যাত দার্শনিক গ্যাসেন্ডি ছিলেন বার্নিয়ারের শিক্ষক। ১৬৪২ সালের জুলাই মাসে বার্নিয়ার চিকিৎসাশস্ত্রে লাইসেনসিয়েট পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হন। আগস্ট মাসে চিকিৎসক হিসেবে সনদ লাভ করে প্যারিস যান। লেখাপড়ার পাশাপাশি ভ্রমণের প্রতিও তাঁর নেশা ছিল। এ কারণে ১৬৪৫ সালে বার্নিয়ার সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন অঞ্চল ঘুরে আসেন।

প্রকৃত অর্থেই বার্নিয়ার ছিলেন একজন শৌখিন অথচ বিশ্লেষণী গুণসম্পন্ন পর্যটক। যা তিনি দেখতেন তা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সিদ্ধান্তে আসতেন। যা তিনি শুনতেন তা নিজের যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতেন। এ জন্য সমকালীন পর্যটকদের সঙ্গে বার্নিয়ারের দেখা ও উপলব্ধির মাঝে একটা পার্থক্য রয়ে গেছে। এ শুধু অতিপ্রশংসা নয়, বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর সঙ্গে অন্যদের ভ্রমণ কাহিনীর তুলনা করে পড়লে যে কোনো সচেতন পাঠকই তা অনুধাবন করতে পারবেন। বার্নিয়ারের দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য, বর্ণনাভঙ্গি ও বিশ্লেষণ রীতির বৈশিষ্ট্য সহজেই তাঁদের দৃষ্টিগোচর হবে। সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদির ব্যাখ্যা ও বর্ণনায়, মানুষের চরিত্র ও প্রকৃতি বিশ্লেষণে বার্নিয়ার যে অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা ঈর্ষণীয় বললেও ভুল বলা হবে না।

১৬৫৬ থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত বার্নিয়ার মিসর, জেদ্দা ও পবিত্র নগরী মক্কা ভ্রমণ করেন। মিসরের রাজধানী কায়রোতে তিনি প্রায় এক বছরেরও অধিক সময় অবস্থান করেন। মক্কা থেকে তাঁর ইথিওপিয়ার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা কারণে তা আর হয়ে ওঠে না। ফলে একটি ভারতীয় জাহাজে চড়ে তিনি ভারতের সুরাট বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং বাইশ দিন সমুদ্রে কাটিয়ে ১৬৫৮ সালের শেষে বা ১৬৫৯ সালের প্রথম দিকে সুরাট এসে পৌঁছেন।

এ সময় আজমীরের নিকটবর্তী কোনো এক স্থানে শাহজাদা দারার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সৈন্যদের যুদ্ধ চলছিলো। ১৬৫৯ সালের ১২ বা ১৩ মার্চ বার্নিয়ার যখন সুরাট থেকে আগ্রার দিকে যাচ্ছিলেন তখন আহমেদাবাদের কাছে দারার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। বার্নিয়ারের জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে দারা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। দারা তখন যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে সিন্ধু প্রদেশের দিকে পলায়ন করছিলেন। পলাতক দারা ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের সঙ্গে বার্নিয়ার গরুর গাড়িতে চড়ে রওনা দেন। কিন্তু পথে বার্নিয়ারের গাড়িটি নষ্ট হয়ে যায়। তখন আর নতুন করে যানবাহনের ব্যবস্থা করা সম্ভব ছিল না। তাই বিদেশী বন্ধুটিকে সেখানেই বিদায় জানিয়ে দারা অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে যেতে বাধ্য হন।

সে সময় ভারতবর্ষের পথেঘাটে চোর-ডাকাতের খুব উপদ্রব ছিল। বার্নিয়ার চোর-ডাকাতদের হাতে পড়ে নির্যাতিত ও লুণ্ঠিত হন। কোনো রকমে

প্রাণ বাঁচিয়ে তিনি আহমেদাবাদ যাত্রা করেন এবং সেখানে দিল্লীগামী এক প্রভাবশালী মোগলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এই মোগলের সঙ্গে তিনি দিল্লী যান।

আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল বলে বার্নিয়ার সম্রাট আওরঙ্গজেবের অধীনে গৃহচিকিৎসকের চাকরি নিতে বাধ্য হন। সাত বছর সেই চাকরি করার পর তিনি দানেশমন্দ খানের অধীনে চাকরি নেন। সে সময় দানেশমন্দ খান সম্রাটের দরবারে প্রভাবশালী ওমরাহ ছিলেন। তিনি বার্নিয়ারকে স্নেহের চোখে দেখতেন এবং বিশ্বাস করতেন। তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেই বার্নিয়ার রাজদরবারের অনেক গোপন কথা ও আদব-কায়দা জানতে পারেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাশ্মীর অভিযানের সময় বার্নিয়ার তাঁর সঙ্গী হন। কাশ্মীর থেকে ফিরে তিনি বাংলাদেশের দিকে যাত্রা করেন। এ সময় বিখ্যাত পর্যটক টার্ভানিয়ার তাঁর সঙ্গী হন। একসঙ্গে রাজমহল এসে বার্নিয়ার ও টাভার্নিয়ার বিচ্ছিন্ন হন। এরপর বার্নিয়ার রাজমহল থেকে কাশিমবাজারের দিকে যাত্রা করেন।

বার্নিয়ার বাংলাদেশ ঘুরে মসলিপট্টম ও গোলকুন্ডা যান এবং সেখানে শাহজাহানের মৃত্যু-সংবাদ শুনতে পান (২২ জানুয়ারি ১৬৬৬)। ১৬৬৬ সালে বার্নিয়ার যখন সুরাট থেকে নিজ দেশের দিকে যাত্রা করেন তখন বিখ্যাত ফরাসী পর্যটক শাঁর্দার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। ১৬৬৯ সালের বার্নিয়ার ফ্রান্সের মার্শাই বন্দরে পৌঁছেন।

১৬৭০ সালের ২৫ এপ্রিল বার্নিয়ার ফরাসী সম্রাটের কাছ থেকে তাঁর ভ্রমণ কাহিনী বই আকারে প্রকাশ করার অনুমতি পান। ১৬৭০-৭২ সালের মধ্যে বার্নিয়ারের জীবদ্দশায় তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর ফরাসী, ইংরেজি ও ডাচ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ বইটি সারা ইউরোপে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে।

১৬৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬৮ বছর বয়সে প্যারিসে বার্নিয়ারের মৃত্যু হয়।

ভারতবর্ষে বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর ইংরেজি অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮২৬ সালে, কোলকাতা থেকে। মূল ফরাসী থেকে জন স্টুয়ার্ট ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এটি সাকুর্লার রোডের ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ছাপা হয়। পরে ১৮৩০ সালে মুম্বাইয়ের 'সমাচার প্রেস' থেকে বইটির আরেকটি ইংরেজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। কলকাতার বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে ১৯০৪ সালে একটি ইংরেজি সংস্করণ, ভূমিকা ও টীকাসহ প্রকাশিত হয়।

বার্নিয়ার প্রসঙ্গে মার্কস ও এঙ্গেল্‌স

স্বনামখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌স ১৮৫৩ সালে বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তাঁদের চিঠি থেকে সেই মন্তব্যের অংশটুকু অনুবাদ করে দেয়া হলো।

১৮৫৩ সালের ২ জুন লন্ডন থেকে কার্ল মার্কস এঙ্গেলস্‌কে লিখেছেন:

"প্রাচ্য শহরগুলোর উত্থানের ইতিবৃত্ত বৃদ্ধ ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার যে রকম জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে বর্ণনা করেছেন, তেমন আর কেউ করতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। সাত বছর তিনি সম্রাট আওরঙ্গজেবের চিকিৎসক হিসেবে কাজ করেন। তাঁর ভ্রমণ কাহিনী যেমন মনোরম তেমনি মূল্যবান এক ঐতিহাসিক সম্পদ। তখনকার সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধেও বার্নিয়ার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। বিশাল সেনাবাহিনী কিভাবে যুদ্ধযাত্রা করতো, কেমন করে তাদের জন্য খাবার জোগাড় করা হতো, এ বিষয়গুলো সম্পর্কেও তিনি লিখেছেন। যেমন:

'সেনাবাহিনীর মধ্যে অশ্বারোহী দলই হলো সর্বপ্রধান। পদাতিক সেনাদল আসলে ততো বড় নয় বাইরে থেকে যতোটা গুজব শোনা যায়। প্রচুর প্রয়োজনীয় লোকজন বা ভৃত্য যারা সেনাদলের সঙ্গে থাকে, তাদের পদাতিক বলে গণ্য করা যায় না আর তারা যোদ্ধাও নয়। লোকলস্কর, দাসদাসী সব একত্রে গণনা করা হলে বলা চলে সম্রাটের সঙ্গে প্রায় দু-তিন লাখ সৈন্য থাকে। তার কারণ, সম্রাট দীর্ঘকালের জন্য রাজধানী ছেড়ে দূরে যান। যুদ্ধযাত্রার সময় মালপত্র কি কি প্রয়োজন হবে, সে সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তারা এই লোকসংখ্যা দেখে অবাক হবে না। কতো রকমের তাঁবু, কাপড়চোপড়, আসবাবপত্র, আহার্য, শুধু পুরুষদের জন্য নয়– স্ত্রীলোকদের জন্যও যে সঙ্গে যায় এবং তার সঙ্গে কতো হাতি, ঘোড়া, উট, বলদ, মাহুত-সহিস, ভৃত্য, খাদ্যবিক্রেতা, বণিক-ব্যবসায়ী যে থাকে, তার হিসেব নেই। ভারতের শাসকের যে বিশেষ পদমর্যাদা রয়েছে, সে জন্যই এরকম হয়।

এ কথা মনে রাখা দরকার, ভারতের সম্রাটই হলেন সে দেশের ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। তার ফলে দিল্লী বা আগ্রার মতো শহর গড়ে উঠেছে

প্রধানত সম্রাট ও তাঁর সেনাবাহিনীর প্রয়োজনকে সামনে রেখে। তাই সম্রাট যখন যুদ্ধযাত্রা করেন তখন তাঁর সঙ্গে শুধু সেনাবাহিনীই যায় না, শহরের প্রায় সকল শ্রেণির পেশাদার মানুষকেও তাঁর অনুগামী হতে হয়।

ভারতের রাজধানী বা কোনো শহরের সঙ্গে ইউরোপীয় শহর প্যারিসের তুলনা করা যায় না। দিল্লা বা আগ্রার মতো শহরকে ঠিক সামরিক শিবির ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বৈশিষ্ট্য এই যে, বেশ খোলামেলা জায়গায় শহরগুলো গড়ে ওঠে।'

"প্রায় চার লাখ সৈন্য নিয়ে আওরঙ্গজেব কাশ্মীর অভিযান করেছিলেন। এই বিশাল সেনাবাহিনীর যুদ্ধাযাত্রা সম্পর্কে বার্নিয়ার লিখেছেন:

'এতো বড় সেনাবাহিনী, এতো মা'নুষজন ও জীবজন্তুর খাদ্যসংস্থানের কথা ভেবে অনেকে হয়তো দিশেহারা হবে। তারা ভাববে, কি করে এভাবে যুদ্ধযাত্রা করা সম্ভব? তারা হয়তো জানে না, খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে ভারতবাসীরা কতো সংযমী। অশ্বারোহী সেনাদের দশজন বা বিশজনের মধ্যে একজন অভিযানের সময় মাংস খায় কিনা সন্দেহ। চাল-ডাল মিশ্রিতি খিচুড়ির ওপর গরম ঘি ঢেলে দিয়ে তারা তৃপ্তি করে খায়। এর বেশি কিছু তাদের দরকার হয় না। উটের সহিষ্ণুতার কথা অনেকেই জানে, ক্ষুধা-তৃষ্ণাও যে বিশেষ তাদের আছে, তা মনে হয় না। অভিযানের সময় এই প্রাণীদের আহারের তেমন প্রয়োজন হয় না। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে সেনাবাহিনী যখন বিশ্রাম নেয়, তখন ঘুরে ঘুরে খাবার খাওয়ার জন্য আশেপাশের প্রান্তরে জীবজন্তুদের ছেড়ে দেয়া হয়। শহরে বা রাজধানীতে ছোটবড় বণিক যারা পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচা করে, তারাও সেনাবাহিনীর সঙ্গে থেকে কাজ করতে বাধ্য হয়...।

ভারতে ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তি-মালিকানার অভাব।'...

কার্ল মার্কসের এই চিঠির উত্তরে ১৮৫৩ সালের ৬ জুন ম্যাঞ্চেস্টার থেকে এঙ্গেল্‌স লিখেন:

"ভূসম্পত্তিতে ব্যক্তি-মালিকানার অভাব সত্যই সমস্ত প্রাচ্যদেশের অন্যতম সামাজিক বিশেষত্ব। এসব দেশের ইতিহাসের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতে হলে এ কথাটি বিশেষভাবে জানা দরকার। কিন্তু কি করে এরকম ঐতিহাসিক অবস্থার উদ্ভব হলো? সামন্ত যুগেও ভূসম্পত্তির মালিকানা-স্বত্বের কোনো জটিল বিকাশ সম্ভব হলো না কেনো? আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ, এসব দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিশেষত্ব। এসব দেশের মাটির এমনই গুণ, আবহাওয়ার এমন গুণ যে, এরকম না হওয়াটাই অস্বাভাবিক। যেমন মনে করো, বিশাল মরুভূমির বিস্তার দেখা যায়, একেবারে সাহারা থেকে আরম্ভ করে আরব,

ইরান, ভারতবর্ষ ও তাতারের ভেতর দিয়ে এশিয়ার উচ্চতম উপত্যকা পর্যন্ত। এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশে কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তনও অপরিহার্য। এই ব্যবস্থা চালু করা কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সংঘবদ্ধভাবে অথবা প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকেই একমাত্র এই ধরনের কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা সম্ভব। এ জন্যই প্রাচ্যদেশের প্রত্যেক সরকারের প্রায় তিনটি করে সরকারি বিভাগ থাকে : ১. ফিনান্স (ঘরোয়া শোষণ), ২. যুদ্ধ (ঘরোয়া ও বৈদেশিক শোষণ) এবং ৩. সাধারণ পরিকল্পনা বিভাগ (প্রতি-উৎপাদনের জন্য)। ব্রিটিশ শাসকরা ভারতবর্ষে এক ও দু নম্বর বিভাগ নিজেদের স্বার্থে ভালোভাবেই পরিচালনা করেছেন, কিন্তু তিন নম্বরটি তারা ত্যাগ করেছেন। তার ফলে ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার শোচনীয় অবনতি হয়েছে। অবাধ প্রতিযোগিতা ভারতীয় পরিবেশে ব্যর্থ হয়েছে। কৃত্রিম সেচ ব্যবস্থার অবনতির ফলে জমির ফলনশক্তি নষ্ট হয়েছে। এ কারণে দেখা যায়, এককালে যে সব জমিতে আবাদ করলে সোনার ফসল ফলতো, পরে সে সব জমি পতিত রয়েছে। সর্বত্রই তাই দেখা যায়– পামিরা, পেট্রা, ইয়েমেন, মিসরের বিভিন্ন অঞ্চল, ইরান ও ভারতবর্ষে। এ থেকেই বোঝা যায়, কেনো একটি মাত্র সর্বগ্রাসী যুদ্ধের ফলে একেকটি সমৃদ্ধিশালী সভ্যতার কেন্দ্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে ধ্বংস হয়ে যায়।...

প্রবীণ বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী সত্যই অপূর্ব, চমৎকার। এরকম বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ একজন ফরাসী পর্যটকের কাহিনী যতোবার পড়া যায়, ততোই ভালো লাগে পড়তে। এমন অনেক কথাই তিনি লিখেছেন, যার গভীর তাৎপর্য না বুঝলে হয়তো তিনি তা বলতেন না। অনেক আপাতদুর্বোধ্য বিষয় তিনি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।"*

মার্কস ও এঙ্গেল্‌সের মতো স্পষ্টবাদী সমাজবিজ্ঞানীর এরকম অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ খুব কম ঐতিহাসিকের ভাগ্যে জুটেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বার্নিয়ারের মতো আরো অনেক বিদেশী পর্যটক নানা কার্য উপলক্ষে ভারতবর্ষে এসেছেন। উইলিয়াম হকিন্স, টমাস রো, টাভার্নিয়ার, ডা. ফ্রায়ার প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। এ দেশের অনেক কথা তাঁরা তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের যতোটুকু ঐতিহাসিক মূল্য থাকা উচিত, তা তাঁদের বিবরণেও রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজের চোখ দিয়ে দেখেছেন, বুঝেছেন নিজের বুদ্ধি ও মন দিয়ে। তাঁদের মধ্যে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিচক্ষণ চিকিৎসক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের দৃষ্টির মধ্যে যেমন

---

* Selected Correspondence : Karl Marx and F. Engels : (Laweence & Wishart, London : 1943) : Letters Nos. 22 & 23

স্বাতন্ত্র্য ও গভীরতা ছিল, তীক্ষ্ণতা, মনের উদারতা ও দরদ ছিল, তেমন আর কারো ছিল না। অনেকেই দেখেছেন ট্যুরিস্টের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে। কিন্তু ভারতবর্ষকে বার্নিয়ার দেখেছেন সমাজ-দার্শনিকের দৃষ্টি দিয়ে। বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনী তাই মোগল আমলের সামাজিক ইতিহাস হিসেবে স্বীকৃত এবং যে কোনো উপন্যাসের চেয়ে সুখপাঠ্য।

ভিনসেন্ট স্মিথ সম্পাদিত বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর ইংরেজি সংস্করণে যে সব টীকা ও টিপ্পনি ছিল সেগুলো ছাড়াও বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে আরো কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যাদি পাদটীকায় সংযোজন করা হয়েছে। বার্নিয়ারের বক্তব্য যথাযথ বুঝতে এগুলো সাহায্য করবে।

শাহজাদা ও শাহজাদীদের কথা

পৃথিবী ঘুরে দেখার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে আমার জন্মভূমি থেকে বের হয়ে ফিলিস্তিন ও মিসর ঘুরে দেখি। তারপর ইচ্ছা হয় লোহিত সাগরের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত ঘুরে দেখবো। তাই প্রায় এক বছর কায়রোয় থাকার পর আবার বেরিয়ে পড়ি। বত্রিশ ঘন্টা চলার পর সুয়েজ পৌছি। সুয়েজ থেকে নৌকা করে সাগরতীরের কোল ঘেঁষে জেদ্দা বন্দরে আসি। মক্কা থেকে বেশি দূরে নয়, মাত্র আধবেলার পথ। বে আমাকে ভরসা দিয়েছিলেন এবং আমিও ভেবেছিলাম যে এখানে নিশ্চিন্তে চলাফেরা করতে পারবো। কিন্তু শেষপর্যন্ত হযরত মোহাম্মদের (সা.) এই পুণ্যতীর্থে পা বাড়াতে আমার ভয় হয়। আমি শুনতে পাই, খ্রিস্টানদের সেখানে যাবার অধিকার নেই। অবশ্য এ অধিকার শুধু স্বাধীন খ্রিস্টানদের নেই, ক্রীতদাসদের আছে। সুতরাং প্রায় পাঁচ সপ্তাহ আটক থাকার পর আবার সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ি।

দেশ ভ্রমণের নেশা পেয়ে বসেছে আমাকে– মুসাফির আমি। তাই আমার বিশ্রাম নেই। ছোট একটি বজরায় উঠে যাত্রা করি– এবারে ইচ্ছে হাব্‌সীদের দেশ দেখবো। কিন্তু শুনলাম সেখানেও কোনো ক্যাথলিক খ্রিস্টানের যাওয়া নিরাপদ নয়। কয়েকজন পর্তুগীজ পর্যটককে নাকি তারা একেবারে কেটে ফেলেছে। গ্রীক বা আর্মেনিয়ানের ছদ্মবেশে অবশ্য যাওয়া যেতো, কিন্তু তাও ভরসা হয়নি। ভেবে ভেবে ঠিক করি ভারতেই যাবো। সে জন্য একটি ভারতীয় বজরায় উঠে পড়ি এবং বাইশ দিন পর সুরাটে এসে পৌছি। মোগল বাদ্‌শাহ তখন ভারতের সম্রাট।[১]

ভারতে এসে দেখতে পাই ভারতসম্রাট শাহজাহান তখন রাজত্ব করছেন। শাহজাহান হলেন জাহাঙ্গীরের পুত্র এবং সম্রাট আকবরের পৌত্র। তিনি হুমায়ুনের প্রপৌত্র এবং তৈমুরের বংশধর–সেই বিখ্যাত আমির তৈমুর, যাঁকে আমরা তৈমুর লং বা খোঁড়া তৈমুর বলে জানি।

তৈমুর ও চেঙ্গিস খানের সংমিশ্রিত বংশধরদেরই 'মোগল' বলা হয়। এই মোগলরাই এখন হিন্দুদের ভারতে রাজত্ব করছেন। তাই বলে মোগল বংশীয়রাই যে সমস্ত রাজকীয় সম্মান ও রাষ্ট্রীয় পদমর্যাদার একচেটিয়া অধিকার

---

১. ১৬৫৮ সালের শেষ কিংবা ১৬৫৯ সালের প্রথম দিকে বার্নিয়ার সুরাটে পৌছেন। সে সময় ভারতের সম্রাট ছিলেন জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহান।– অনুবাদক।

ভোগ করছে, তা নয়। রাষ্ট্রীয় বা সামরিক কোনো বিভাগেই মোগলদের একচেটিয়া আধিপত্য নেই। অন্যান্য জাতির মানুষরাও এই সব পদ অধিকার করে আছে। এদের মধ্যে অন্যতম ইরানী, আরবীয় ও তুর্কী। মোগল বলতে শুধু তৈমুর বংশীয়দেরই বোঝায় না। যে কোনো ইসলামধর্মী বিদেশী শ্বেতাঙ্গকে মোগল বলা হয়। শুধু ইউরোপীয় খ্রিস্টানদেরকে ফিরিঙ্গি (Franguis) আর হিন্দুদের বলা হয় 'জেন্টিল' (Gentil)।[২] হিন্দুদের গায়ের রং একটু কালো।

ভারতে পৌঁছে শুনতে পাই সম্রাট শাহজাহান বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর বয়স প্রায় সত্তর বছর চলছে এবং তিনি চার পুত্র ও দুই কন্যার জনক।[৩] তিনি তাঁর পুত্রদের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেছেন এবং নিজে প্রায় বছরেরও বেশি সময় ধরে কঠিন অসুখে ভুগছেন। তাঁর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বলে স্বজনরা মনে করছেন।

পিতার আসন্ন মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকায় পুত্রদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। দুঃখে নয়, সিংহাসনলোভে। দিল্লীর রাজসিংহাসনে কে বসবেন, বিশাল মোগল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর কে হবেন, তা নিয়ে লোভ, হিংসা ও বিদ্বেষের আগুন জ্বলে উঠেছে গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে। শুনতে পাই, সিংহাসনলোভে ভাইয়ে ভাইয়ে প্রায় পাঁচ বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। এই গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ আমার হয়েছিলো। এ লেখাটিতে তা বর্ণনা করার ইচ্ছে আছে।[৪]

প্রায় আট বছর আমি মোগল দরবারের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলাম। চাকরি নিতে বাধ্য হয়েছিলাম, কারণ আমার আর্থিক অবস্থা তখন শোচনীয় হয়ে উঠেছিলো। রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় চোর-ডাকাতের হাতে পড়ে আমার যা সম্বল ছিল তা প্রায় শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া সুরাট থেকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্যতম নগরী আগ্রা ও দিল্লীতে পৌঁছতে আমার প্রায় সাত সপ্তাহ সময় লেগেছে। চুরিচামারি আর লুটপাটের পর বাকি যেটুকু সম্বল ছিল, এ সময় তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

---

২. 'ফিরিঙ্গি' শব্দটি ফার্‌সী 'ফরঙ্গী' শব্দ থেকে এসেছে। মুসলমান শাসকদের শাসনামলে যে কোনো ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গকে ফিরিঙ্গি বলা হতো। – অনুবাদক।
'জেন্টিল' শব্দটি পর্তুগীজ 'Gentio' 'জেন্টিয়ো' থেকে এসেছে এবং তা থেকেই ইঙ্গ-ভারতীয় শ্যাং, 'Gentoo' 'জেন্টু' কথার উৎপত্তি। ইংরেজ যুগের প্রথম দিকে তারা সাধারণত হিন্দুদেরকেই 'জেন্টু' বলতো এবং মুসলমানদের বলতো 'মূর' ('Moros' থেকে 'Moors')। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রকাশিত ইংরেজদের লেখা এ উপমহাদেশের ইতিহাসের বইয়ে এই 'Gentoo' ও 'Moor' শব্দের ছড়াছড়ি দেখা যায়– অর্থ হলো 'হিন্দু' ও 'মুসলমান।' – অনুবাদক।

৩. শাহজাহান ১৫৯৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বার্নিয়ার যখন ভারতে এসে পৌঁছান তখন তাঁর বয়স ছিল ৬৫ বা ৬৬ বছর। শাহাজানের কন্যা দুটি নয়– চারটি।– অনুবাদক।

৪. আক্ষরিক অনুবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করছি না। কারণ গৃহযুদ্ধের প্রত্যক্ষ বিবরণ এই সময়কার বহু ঘটনাপ্রধান ইতিহাস বইয়ে মধ্যে লিপিবদ্ধ আছে।– অনুবাদক।

দিল্লী অধিপতির কাছে যখন দিল্লীতে পৌঁছি তখন আমি প্রায় পথের ফকির। বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে হয়, রাজপরিবারের চিকিৎসকের চাকরি– বাঁধা বেতনে। পরে আরেকজন বিখ্যাত ওমরাহ ও বিশেষ ব্যক্তির অধীনেও চাকরি করেছি।[৫]

মোগল সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম দারা শিকো বা ডেরিয়াস। দ্বিতীয় পুত্রের নাম সুলতান সুজা, যার অর্থ বীর রাজকুমার। তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব বা সিংহাসনের শোভা। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ, যার অর্থ সার্থক কামনা। কন্যা জাহান আরা হলেন জ্যেষ্ঠা শাহজাদী আর কনিষ্ঠা রওশন আরা বেগম বা আলোককুমারী। এ ধরনের নাম রাখা এ দেশের রাজবংশের ধারা। যেমন শাহজাহানের স্ত্রীর নাম মমতাজ মহল, অর্থাৎ বেগম মহলের মুকুটর বা শ্রেষ্ঠ মহিষী।

মমতাজের রূপ ছিল অতুলনীয় এবং তাজমহল নামে তাঁর যে স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে, তা সারা পৃথিবীতে এক বিস্ময়কর কীর্তি। মিসরের পিরামিড আমি দেখেছি। তবে আমার মনে হয় ভারতের তাজমহলের তুলনায় মিসরের পিরামিড পাথরের অবিন্যস্ত স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়।

যা বলছিলাম, রাজবংশের শাহজাদা-শাহজাদী বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের এমন নামকরণের কারণ কি? ইউরোপের মতো তাঁদের 'অমুক স্থানের লর্ড' উধাধিতে ভূষিত করা হয় না কেন? আমার মনে হয় তার প্রধান কারণ, ইউরোপের লর্ডরা যেমন ভূমির স্বত্বাধিকারী হতে পারেন, এ দেশের শাহজাদা বা ওমরাহ্‌রা তা হতে পারেন না। সম্রাটই হলেন তাঁর সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ ভূমি বা ভূসম্পত্তির মালিক। সুতরাং আর্ল, মার্কুই, ডিউক, লর্ড– এ জাতীয় উপাধি ভারতে দেখা যায় না। সম্রাট নিজে ভূমির একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলে, তিনি তাঁর অধিকার বা স্বত্ব অন্যদের দান করেন, উপহার দেন অথবা ভাতা বা বেতন হিসেবে দেন।[৬]

---

৫. এই বিখ্যাত ব্যক্তি একজন ইরানী ব্যবসায়ী, নাম মোহম্মদ সফী বা মোল্লা সফী। ১৬৪৬ সালে তিনি সুরাট আসেন এবং সেখান থেকে সম্রাট শাহজাহান তাঁকে সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হয়ে সম্রাট তাঁকে তিন হাজারী মনসবদারীতে সম্মানিত করে 'বক্‌শীর' পদে নিয়োগ করেন এবং 'দানিশমন্দ খান' উপাধি দেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাঁর আরও পদোন্নতি হয় এবং তিনি শাহজাহানাবাদের (দিল্লীর) সুবাদার নিযুক্ত হন। ১৬৭০ সালে দিল্লীতে তাঁর মৃত্যু হয়।–অনুবাদক।

৬. ইউরোপ ও ভারতের 'ভূমিস্বত্বে'র (Proprietorship of Soil) পার্থক্য সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই মন্তব্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেল্‌সের চিঠি দুটির কথা স্মরণ যোগ্য।– অনুবাদক।

দারা শিকো কেমন ছিলেন

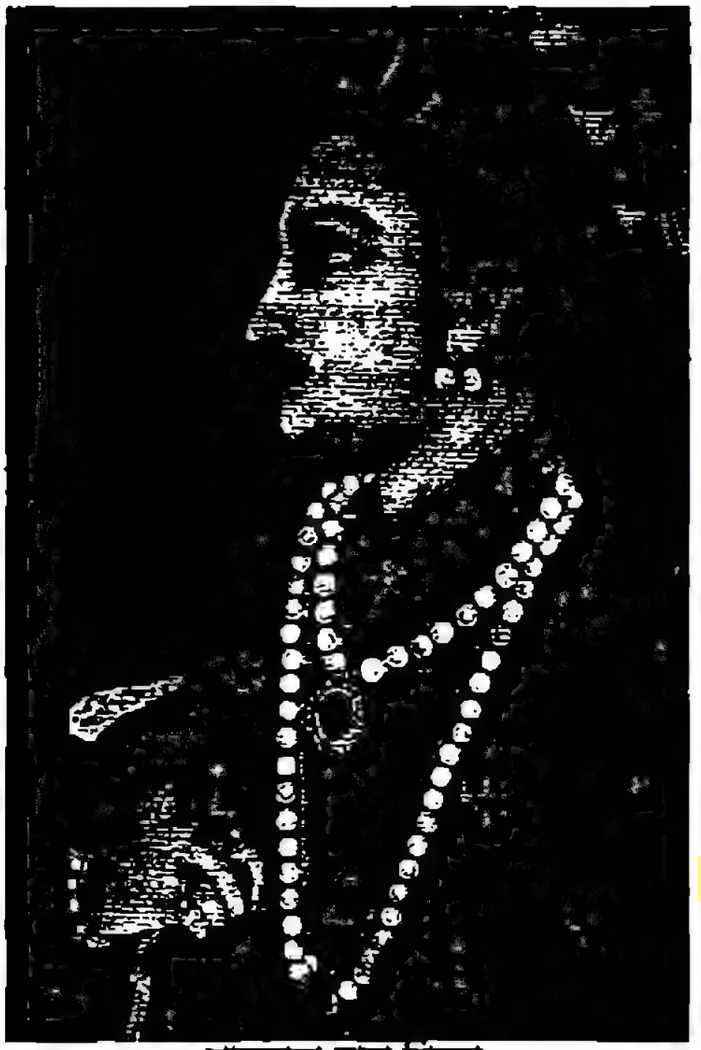

শাহজাদা দারা শিকো

শাহজাদা দারার যথেষ্ট সদ্‌গুণ ছিল। কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা এবং আচার-ব্যবহারে তাঁর মতো ভদ্র ও শিষ্ট আর কোনো শাহজাদা ছিলেন না। কিন্তু নিজের সম্পর্কে তাঁর খুব উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি ভাবতেন তাঁর মতো বুদ্ধিমান আর দ্বিতীয় কেউ নেই। প্রয়োজনের সময় কোনো ব্যাপারে যে কারো সঙ্গে সলাপরামর্শ করা যেতে পারে, তা তিনি মনে করতেন না। এই অহমিকার জন্য তাঁকে কোনো পরামর্শ দিতে কেউ সাহস করতেন না। এভাবে দারা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছেও অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

সিংহসানলোভে তাঁর ভাইদের গোপন চক্রান্তের কথা দারার বন্ধুদের মধ্যে অনেকে জানলেও তাঁর এই ঔদ্ধত্য স্বভাবের জন্য কেউ তাঁকে কিছু জানাতে সাহস করেননি।

দারা শিকো নামে এ শাহজাদার চরিত্রের প্রধান দোষ, তিনি ভীষণ বদমেজাজী। হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি যাকে খুশি যা বলতে দ্বিধা করেন না, এমনকি প্রথম শ্রেণীর ওমরাহদেরও। কথায় কথায় তিনি সবাইকে অপমান করেন, যদিও ক্রোধ তাঁর স্ফুলিঙ্গের মতো দপ্ করে জ্বলে উঠে খপ করে নিভেও যায়।

মুসলমান হিসেবে দারা নিজ ধর্মের ক্রিয়াকর্ম সবই পালন করতেন, কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তাঁর কোনো ধর্ম-গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দুদের সঙ্গে হিন্দুর মতো মিশতেন, খ্রিস্টানদের সঙ্গে মিশতেন খ্রিস্টানের মতো। তাঁর আশেপাশে সব সময় হিন্দু গুণীজন, চিকিৎসক ও শাস্ত্রকাররা উপস্থিত থাকতেন। তাদের বৃত্তিদানেও তিনি কার্পণ্য করতেন না। এ কারণে দারাকে অনেকে কাফের বলে মনে করতো। এ প্রসঙ্গে পরে বলবো, ভারতীয়দের ধর্মানুষ্ঠান নিয়ে যখন আলোচনা করবো, তখন।

খ্রিস্টান পাদ্‌রীদের সঙ্গে দারার সুসম্পর্ক ছিল। শোনা যায়, রেভারেন্ড ফাদার বুজির ওপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং বুজির মতামত তিনি শ্রদ্ধাভরে শুনতেন।[৭]

কারো কারো ধারণা, দারা কোনো ধর্মেই বিশ্বাস করেন না। সব ধর্মের প্রতি তিনি শুধু কৌতূহলবশত আগ্রহ দেখান এবং তাদের মতো করে মেলামেশা করেন।

কেউ কেউ বলে, সবটাই হলো দারার রাজনৈতিক চাতুরি। কোনো উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তিনি প্রয়োজন মতো হিন্দু বা খ্রিস্টানপ্রীতি দেখান। গোলন্দাজ বাহিনীতে তখন খ্রিস্টানদের সংখ্যা বেশি ছিল বলে তিনি তাদের সঙ্গে সৌহার্দ বজায় রাখতেন, কারণ তাতে সামরিক ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকা যেতো। হিন্দুপ্রীতি দেখাতেন দেশীয় নৃপতিদের ক্ষেত্রে, যারা অধিকাংশই হিন্দু। রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহে যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন। কিন্তু তাহলেও দারার এই ধর্ম-উদারতার কৌশল খুব বেশি কাজে লাগেনি এবং তাতে তাঁর কোনো উদ্দেশ্যই চরিতার্থ হয়নি। বরং দারার ছোট ভাই আওরঙ্গজেব তাঁর এই অস্থিরচিত্ততার সুযোগ নিয়ে তাঁকে 'কাফের' বলে প্রমাণ করেন এবং স্বচ্ছন্দে শিরশ্ছেদ করতে সক্ষম হন।

সুলতান সুজার চরিত্র

দারা শিকোর চরিত্রের সঙ্গে সুলতান সুজার অনেক সাদৃশ থাকলেও তিনি আরো বেশি হিসেবী, বুদ্ধিমান, দূরদর্শী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারেও অনেক বেশি মার্জিত ছিলেন।

ষড়যন্ত্র করতে সুজার মতো পারদর্শী আর কেউ ছিলেন না। নানা রকম উপহার, পুরস্কার ইত্যাদি দিয়ে তিনি গোপনে ওমরাহদের হাত করতেন এবং যে কোনো ষড়যন্ত্রে তাঁদের খেলার পুতুল করে তুলতেন। এভাবে সুজা যশোবন্ত সিংয়ের মতো প্রভাবশালী হিন্দু রাজাকেও নিজের দলে এনেছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে একটি মারাত্মক দোষ ছিল। ইন্দ্রিয়াসক্তি তাঁর এতো প্রবল ছিল যে, তিনি তার দাস ছিলেন বললেও ভুল বলা হয় না। নারী পরিবেষ্টিত

---

৭. কাট্টো তাঁর 'History of the Mogul Dynasty in India' (প্যারিস ১৭১৫) বইতে দারা শিকোর এই পাদরি-প্রীতির আরো বিবরণ দিয়েছেন। ভেনিসীয় পর্যটক মনুচ্চির সংগৃহীত তথ্যের ওপর নির্ভর করেই কাট্টো এই বই লিখেছেন। মনুচ্চি দীর্ঘদিন দিল্লী ও আগ্রার রাজদরবারে চিকিৎসক ছিলেন এবং ব্যক্তিগতভাবে দারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কাট্টো লিখেছেন : 'দারা যখন কর্তৃত্ব আরম্ভ করেন তখন থেকেই তাঁর অহংকার ও অপরের প্রতি তাচ্ছিল্যের মনোভাব দেখা দেয়। কয়েকজন সাহেব শুধু তাঁর বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টান পাদরিদের ওপর দারার অগাধ ভক্তি ছিল। বিশেষ করে ফাদার বুজির ওপর। এই ফাদারটির দারার ওপর বিপুল প্রভাব ছিল। – অনুবাদক।

হয়ে থাকলে সুজার কোনো চেতনাই থাকতো না। কখনো কখনো সারারাত, সারাদিন তিনি নাচগান, মদ্যপান আর আনন্দ-ফুর্তির মধ্যে বিভোর হয়ে থাকতেন।

সুজা তাঁর মোসাহেবদের দামি দামি খিলাৎ দিতেন এবং তাদের বেতন ইচ্ছে মতো বাড়াতেন বা কমাতেন। সুতরাং কোনো ওমরাহের পক্ষেই তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকার উপায় ছিল না। স্বার্থের খাতিরে হলেও তাদেরকে সুজার সঙ্গে প্রমোদ সমুদ্রে গা ভাসাতে হতো। তার ফলে তাঁর শাসনাধীন প্রদেশের অবস্থাও তেমনি শোচনীয় হয়ে পড়ে। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা ক্রমেই বেড়ে যেতে থাকে অথচ অভিযোগ জানাবার উপায় ছিল না। কার কাছে প্রজারা অভিযোগ জানাবে? সুজা ও তাঁর ওমরাহরা দিনরাত মদ ও নারী নিয়ে মশগুল থাকতেন।

সুলতান সুজা ইরানীদের পার্সী ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন– তুর্কীদের নন। ইসলাম ধর্ম বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, গুলিস্তানের কবি শেখ সাদির মতে বাহত্তর সম্প্রদায়। তার মধ্যে দুটি সম্প্রদায়ই প্রধান– তুর্কীপন্থী ও পার্সীপন্থী (ইরান)। তুর্কীরা মনে করে তারাই মোহাম্মদের (সা.) প্রকৃত বংশধর এবং ইরানীরা বিধর্মী কাফের। আবার ইরানীরা মনে করে তাদের পালিত ধর্মই আসল ইসলাম ধর্ম– তুর্কীদের ধর্ম আসল নয়। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব অতি গভীর।

সুলতান সুজার পার্সীপন্থী বা 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার কারণ হলো রাজনৈতিক। যেহেতু মোগল সাম্রাজ্যের অধিকাংশ আমির-ওমরাহ 'সিয়া' সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমান এবং মোগল দরবারে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি, তাই সুজাও সিয়াপন্থী হয়েছেন। কারণ তাতে ওমরাহদের দিয়ে তাঁর কর্যোদ্ধারে সুবিধা হয়।

আওরঙ্গজেবের চরিত্র

আওরঙ্গজেব একেবারেই ভিন্ন প্রকৃতির। জ্যেষ্ঠ ভাই দারা শিকোর মতো তাঁর বাইরের চরিত্রে কোনো চাকচিক্য ছিল না, কিন্তু তাঁর বিচার-বুদ্ধি ছিল অসাধারণ। বন্ধুবান্ধব, আমলা-অমাত্য নির্বাচনে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। তিনি এমন কাউকে আমল দিতেন না, যার দ্বারা তাঁর কার্যসিদ্ধি হবার সম্ভাবনা নেই। সেভাবেই তিনি পদমর্যাদা ও পুরস্কার বিতরণ করতেন। কতোবার যে তিনি রাজদরবারে এবং ভাইদের কাছে ধনদৌলত ও রাজৈশ্বর্যের প্রতি অনীহা ও বৈরাগের ভান করেছেন অথচ গোপনে সিংহাসন অধিকারের ষড়যন্ত্র করেছেন, তার হিসেবে নেই। ছলকলা ও কূটবুদ্ধিতে আওরঙ্গজেবের প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। যখন তিনি দক্ষিণাপথের সুবাদার হন, তখনও সবার কাছে

বলতেন প্রাদেশিক সুবাদারীতে তাঁর কোনো আকর্ষণ নেই। তাঁর বিবাগী চরিত্রের সঙ্গে এসব ঠাটবাট খাপ খায় না। দান-ধ্যান করে, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তিনি তাঁর জীবনের দিনগুলো কাটিয়ে দিতে চান। অথচ আওরঙ্গজেবের জীবন ঠিক এর উল্টো পথে চলেছে। একটার পর একটা ষড়যন্ত্র না করে তিনি বসে থাকতে পারতেন না। আর সেই ষড়যন্ত্রের ওপর এমন একটা বৈরাগ্যের মুখোশ পরানো থাকতো যে, একমাত্র দারা ছাড়া কেউ তাঁর ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধির কথা বুঝতে পারতেন না। তাঁর বাইরের বেশটা ছিল ফকির-দরবেশের– আর মনটা ছিল মতলববাজের। এই হলেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব, সম্রাট শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র।

আওরঙ্গজেবের চরিত্র সম্পর্কে দারার মতো শাহজাহানেরও কোনো উচ্চ ধারণা ছিল না। সে জন্য দারা তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন, 'আমার ভাইদের মধ্যে ঐ নামাজী ভাইটিকে নিয়েই পিতার সবচেয়ে বেশি ভাবনা।'*

মুরাদের চরিত্র

শাহজাহানের কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন অন্য পুত্রদের তুলনায় বুদ্ধিমান। তবে মুরাদ আমোদ-প্রমোদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। এসব নিয়েই তিনি চব্বিশ ঘণ্টা মশগুল হয়ে থাকতেন। এমনিতে অবশ্য তিনি উদার প্রাকৃতির ও ভদ্র ছিলেন। প্রায়ই গর্ব করে বলতেন, 'আমি কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ধার ধারি না এবং গোপন ষড়যন্ত্র ঘৃণা করি। কারণ ওটা বীরের ধর্ম নয়। আমার ধর্ম বীরের, আমার নীতি বীরের, তলোয়ার ও বল পরীক্ষার প্রকাশ্য নীতি।'

মুরাদ অবশ্য খুব সাহসী ছিলেন। কিন্তু সাহসী হলেও তিনি তেমন বুদ্ধিমান ছিলেন না। মুরাদের যতোটা সাহস ছিল তার সামান্য পরিমাণ বুদ্ধি যদি থাকতো, তাহলে হয়তো তিনিই অন্য ভাইদের সরিয়ে ভারতের সম্রাট হতে পারতেন।

শাহজাদী জাহান আরার মানসিকতা

সম্রাট শাহজাহানের জেষ্ঠ্যা কন্যা শাহজাদী জাহান আরা অনন্যসাধারণ সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। সম্রাট তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁদের এই

---

* সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অন্যান্য মহৎ গুণ সম্পর্কে পরে বার্নিয়ার এমন অনেক কথা বলেছেন, যা তাঁর মতো একজন প্রত্যক্ষদর্শীর পক্ষেই বলা সম্ভব।
আওরঙ্গজেবের চরিত্র-বিশ্লেষণে বার্নিয়ার যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তা আর কেউ দিতে পারেননি। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।—অনুবাদক

স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক নিয়ে ওমরাদের মাঝে কানাঘুষা চলেছিলো।[৮] পরিস্থিতি এমন অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিলো যে, শেষপর্যন্ত সম্রাট মৌলবীদের ডেকে এ অভিযোগের একটা ফয়সালা করে দেয়ার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। তার প্রেক্ষিতে মৌলবীরা নাকি বলেছিলেন, কন্যার সঙ্গে সম্রাটের এই সম্পর্ক রাখার মাঝে অন্যায় কিছু নেই। কারণ যে বৃক্ষ তিনি নিজে রোপন করেছেন, তাকে দেখভাল করার অধিকারও সম্রাটের রয়েছে।

মৌলবীদের এই কথার অর্থই বাইরে বিকৃত হয়ে রটেছিলো। জাহান আরার ওপর শাহজাহানের অগাধ বিশ্বাস ছিল এবং তিনি পিতার প্রতিটি দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। শাহজাহান যা খেতেন তা জাহান আরার তত্ত্বাবধানেই তৈরি হতো। অন্যের তৈরি খাবার সম্রাট খেতেন না। এ জন্য মোগল দরবারে সম্রাটের এই কন্যার প্রভাবও ছিল কল্পনাতীত। সম্রাটের সঙ্গে তিনি ছায়ার মতো লেগে থাকতেন। সম্রাটের আমোদ-প্রমোদ, হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিতেন এবং কোনো জটিল বিষয়ে মতামত দেয়ার সময় জাহান আরার মতামতকে যথেষ্ট মূল্য দেয়া হতো।

শাহজাদী জাহান আরার ব্যক্তিগত ধনদৌলতও ছিল প্রচুর। কারণ তিনি সম্রাটের কাছ থেকে মোটা ভাতা ও উপহার তো পেতেনই, ওমরাহ, আমলা ও অমাত্যরাও যাতে সম্রাটের সুনজরে থাকেন, তার জন্যে সব সময়ই জাহান আরাকে নানা রকম উপঢৌকন দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করতেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা যে সম্রাটের প্রীতিলাভে সক্ষম হয়েছিলেন, তার প্রধান কারণ ছিলো তাঁর ভগিনীর সহানুভূতি। দারা সব সময় এই ভগিনীর মন জুগিয়ে চলতেন এবং এমন কথাও বলতেন যে, তিনি যদি সম্রাট হতে পারেন তাহলে শাহজাদী জাহান আরাকে বিয়ে করার অনুমতি দেবেন।

অনেকে হয়তো এ কথা পড়ে ভাববেন যে 'বিয়ে করার অনুমতি' ব্যাপারটা কি! কিন্তু মোগল রাজবংশের কাহিনী যাঁরা জানেন তাঁদের কাছে শাহজাদীদের বিয়ের এই অনুমতি দানের তাৎপর্য সহজেই ধরা পড়বে। শাহজাদীদের বিয়ে শাহজাদাদের সঙ্গেই দিতে হতো এবং ভবিষ্যতে সেই শাহজাদাদের পক্ষে রাজ্যলোভী হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এ আশংকা যেনো কোনো দিনও বাস্তবে রূপ নিতে না পারে, সে কারণে মোগল শাহজাদীদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হতো না।

---

৮. ভ্যালেন্টিন ও কাট্টোও এই গুজবের কথা লিখেছেন। কাট্টো লিখেছেন : "জাহান আরা শুধু যে সুন্দরী ছিলেন তা নয়, বুদ্ধিতেও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। শাহজাহানের প্রতি তাঁর এতোটাই দুর্বলতা ছিল এবং সম্রাট শাহজাহানও কন্যার প্রতি এতো স্নেহোচ্ছ্বাস দেখাতেন যে, সে সব নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতো। তবে পুরো ব্যাপারটাই ছিল ওমরাহদের বিদ্বেষপ্রসূত অপপ্রচার ও ভিত্তিহীন গুজব।' – অনুবাদক।

বিভিন্ন দেশে প্রেমের ধরন

শাহজাদী জাহান আরার প্রণয় কাহিনী যা শোনা যায় তার মধ্যে দুটি কাহিনী আমি এখানে বর্ণনা করবো। কেউ যেন ভাববেন না যে অকারণে আমি রূপকথা রচনা করতে বসেছি। যা লিখছি তা সব ইতিহাসের ঘটনা। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, ভারতীয়দের আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি সম্বন্ধে আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি ও শুনেছি, তাই অতিরঞ্জিত না করে বর্ণনা করা।

প্রথমেই বলি, ইউরোপে প্রেম করা যতো সহজ, এশিয়ায় ততো সহজ নয়। ইউরোপের প্রেমিক-প্রেমিকরা অনেকটা নির্ভয়ে প্রণয়ের দুঃসাহিসক পথে অভিযান করতে পারে, কিন্তু এশিয়ায় পদে পদে বিপদের সম্ভাবনা।

ফ্রান্সে প্রেম করা হলো এক মজার ব্যাপার। ফরাসীরা হেসে-খেলে প্রেম উড়িয়ে দিতে পারে। হাসির মতোই প্রেম সেখানে ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু এ দেশে (এশিয়া ও ভারতে) প্রেম একটা ভয়াবহ ব্যাপার। প্রেম একবার করলে আর রেহাই নেই, তার শোচনীয় ফলাফল ভোগ করতেই হবে। এই জন্য এশিয়াটিক প্রেমের পরিণতি সাধারণত ট্রাজিক হয়।

শাহজাদী জাহান আরা দিনের বেশিরভাগ সময়ই হেরেমের ভেতর কাটাতেন। সে সময় পরিচারিকারা তাঁকে ঘিরে থাকতো। বাইরের কোনো ব্যক্তি সেখানে প্রবেশের অনুমতি পেতো না। ভাগ্যক্রমে একজন পেয়েছিলেন এবং তিনি খুব উচ্চবংশজাত কেউ নন।

পরিচারিকারা সব সময় জাহান আরার সেবায় নিয়োজিত থাকতো। তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে কিছু করার উপায় ছিল না। সুতরাং জাহান আরার প্রণয় কাহিনী পরিচারিকারা জেনে ফেলে আর তা সম্রাটের কাছে পৌছে যায়। তারপর একদিন হঠাৎ সম্রাট তাঁর কন্যার কক্ষে বেড়াতে আসেন। শাহজাদী জাহান আরার প্রেমিক বেচারা কোনো দিশা না পেয়ে স্নানঘরের গরম পানির টবের মধ্যে আত্মগোপন করেন। তা বুঝতে পেরেও সম্রাট এমন ভাব দেখান যেন তিনি কিছুই জানেন না। কন্যার সঙ্গে বসে বসে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলে চলেন। শেষমেশ কথার মোড় ঘুরিয়ে তিনি বলেন যে, শাহজাদীর গায়ের রং মলিন দেখাচ্ছে। এতে বেশ বোঝা যাচ্ছে তিনি শরীরের যত্ন নিচ্ছেন না। প্রসাধন করছেন না। এমন তো চলতে দেয়া যায় না।

এ কথা বলে সম্রাট গোসলখানা খুলে দিয়ে বাথটবের পানি ফোটাতে খোজাদের হুকুম দেন। খোজারা সম্রাটের আদেশ মতো পানি ফুটিয়ে চলে আর তার মধ্যে জাহান আরার হতভাগ্য প্রেমিকও সিদ্ধ হতে থাকে। সম্রাট শাহজাহান ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেন। তারপর খোজারা এসে যখন জানায় পানি গরম করা হয়েছে, তখন তিনি গম্ভীরভাবে কন্যার কক্ষ ত্যাগ করেন। এভাবে জাহান আরার প্রেমের সমাপ্তি ঘটে আর পানিতে সিদ্ধ হয়ে প্রেমিক বেচারার মৃত্যু হয়।

শাহজাদী জাহান আরা দ্বিতীয়বার প্রেমে পড়লে তার পরিণতিও মর্মান্তিক হয়। এবার তিনি এক উচ্চ বংশজাত সুদর্শন ইরানী যুবককে পছন্দ করে তাঁকে নিজের খানসামা নিয়োগ করেন। যুবকের নাম নজর খান। শায়েস্তা খান নজর খানকে স্নেহের চোখে দেখতেন। সে কারণে তিনি যুবকের সঙ্গে জাহান আরার বিয়ে দেয়ার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করেন। সম্রাট শায়েস্তা খানের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। তিনি বুঝতে পারেন তাঁর কন্যার সঙ্গে এই ইরানী যুবকের গোপন সম্পর্ক রয়েছে।

একদিন সম্রাট নজর খানকে দরবারে আমন্ত্রণ জানান। নজর খান দরবারে আসার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট আমির-ওমরাহদের সামনেই তাকে একটি পান দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। এই অপ্রত্যাশিত আপ্যায়নে নিজের ভাগ্য সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে নজর খান মহানন্দে সম্রাটের দেয়া সুগন্ধি পান চিবোতে থাকেন। উপস্থিত কেউ ভাবতেও পারেনি যে পানের মধ্যে বিষ আছে এবং সম্রাট তা নিজের হাতে নজর খানকে খেতে দিয়েছেন।

পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে নজর খান নিজের পাল্‌কিতে গিয়ে ওঠেন।[৯] পাল্‌কির মধ্যেই পানের ক্রিয়া শুরু হয়। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এভাবেই সম্রাটের কারসাজিতে জাহান আরার দ্বিতীয় প্রেমের সমাপ্তি ঘটে।

কনিষ্ঠা শাহজাদী রওশন আরার স্বভাব

রওশন আরা তাঁর বড় বোন জাহান আরার মতো সুন্দরী বা বুদ্ধিমতী ছিলেন না। তা না হলেও ভোগবিলাসে তিনি কম যেতেন না। রওশন আরা ছিলেন আওরঙ্গজেবের অনুরাগী এবং প্রকাশ্যেই তিনি দারা ও জাহান আরার বিরোধিতা করতেন। সে জন্য তিনি খুব বেশি ধনদৌলত সঞ্চয় করতে পারেননি এবং রাজকার্যেও তাঁর তেমন প্রভাব ছিলো না। তবে এ কথা সত্য যে, হেরেমে অবস্থান করার কারণে তিনি অনেক গোপন পরামর্শ ও ষড়যন্ত্রের খবর পেতেন এবং তার প্রত্যেকটি আগেভাগেই আওরঙ্গজেবকে জানিয়ে হুঁশিয়ার করে দিতেন।*

---

৯. বাংলা 'পাল্‌কি' শব্দটি সংস্কৃত পল্যাঙ্ক' শব্দ থেকে এসেছে। পতুর্গীজরা বলতো 'Palanchino' ইংরেজরা 'Palanquin'.

* সম্রাট শাহজাহানের পুত্র-কন্যার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে বার্নিয়ার বলেছেন, পুত্রদের বদ্‌মেজাজের জন্য শেষজীবনে শাহজাহান ভয়ে ভয়ে কাটিয়েছেন। পুত্ররা বিবাহিত ও বয়স্ক, কিন্তু তবু রক্তসম্পর্ক ছিন্ন করে সিংহাসন নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে বিরোধ দেখা দিয়েছিলো। এ কারণে রাজদরবারের পরিবেশও বিষাক্ত হয়ে উঠেছিলো। সম্রাট তাঁদের শাস্তি দিতে পারতেন, বন্দীও করে রাখতে পারতেন, কিন্তু সাহস করেননি। চার পুত্রকে

গৃহযুদ্ধোত্তর ঘটনা

পরবর্তী অধ্যায়–Remarkable Occurrences' যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর রাজদরবারের প্রায় পাঁচ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এর মধ্যে মোগল যুগের রাষ্ট্রীয় আদব-কায়দার অনেক উপকরণ ছড়িয়ে আছে, যদিও অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপাদান বিশেষ নেই। রাষ্ট্রীয় আচারেরও ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলে এই অধ্যায়ের সারানুবাদ করা হয়েছে। এই দুই অধ্যায়ের আয়তন মূল গ্রন্থের অর্ধেকের কিছু কম, তার মধ্যে যুদ্ধের বিবরণের অধ্যায়টি চার ভাগের একভাগ। বাকি অর্ধেক হলো চতুর্দশ লুইসের রাজত্বকালে ফ্রান্সের তাৎকালিন অর্থসচিব মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে লেখা বার্নিয়ারের একটি বিখ্যাত চিঠি। মঁশিয়ের ভেয়ারের কাছে আগ্রা এবং দিল্লীর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবরণ সম্পর্কিত চিঠি, ফরাসী কবি শাপলাঁর কাছে লেখা ভারতবর্ষের সমাজ-সংস্কার ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ সম্পর্কে লেখা চিঠি, আওরঙ্গজেবের কাশ্মির অভিযান ও কাশ্মির সম্পর্কে কয়েকটি চিঠি এবং বাংলাদেশের সম্পদ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বিবরণ। এর মধ্যে কালবার্ট, ভেয়ার ও শাপলাঁর কাছে লিখিত চিঠি তিনটি এবং বাংলাদেশের বিবরণটি বার্নিয়ারের ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান। এই চিঠি তিনটি ও বাংলাদেশের বিবরণটি সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হয়েছে। কাশ্মির অভিযানের কথা বাদ দেয়া হয়েছে।– অনুবাদক।

গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর আওরঙ্গজেব যখন মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন তখন দরবারের উজবেক তাতাররা আওরঙ্গজেবের কার্যকলাপ আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য

চারটি প্রদেশের সুবাদারি দিয়ে তিনি শান্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাতে উল্টো ফল হয়েছে। সুবাদারি পাবার পর পুত্রদের স্বেচ্ছাচারিতা আরও বেড়ে গেছে। স্বাধীন বাদশাদের মতো তাঁরা বেপরোয়া ব্যবহার করা শুরু করেছেন এবং সম্রাটকে রাজস্ব দেয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত গৃহবিবাদ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এই গৃহযুদ্ধের বিবরণ দিয়েছেন বার্নিয়ার। অনেক ইতিহাসের বইয়ে এই বিবরণ পাওয়া যাবে। এখানে তার পুনরাবৃত্তি করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়নি। বার্নিয়ার লিখেছেন : "এভাবে চার ভাইয়ের সাম্রাজ্য লাভের জন্য যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিলো, তার অবসান ঘটেছে। প্রায় পাঁচ-ছ' বছর ধরে যুদ্ধ চলেছিলো, অর্থাৎ ১৬৫৫ সাল থেকে ১৬৬০ কি ১৬৬১ সাল পর্যন্ত। যুদ্ধের শেষে আওরঙ্গজেব বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।" এই তথ্য জানিয়ে বার্নিয়ার গৃহযুদ্ধের অধ্যায়টি শেষ করেছেন।

করেন। তারা দেখেন, একে একে প্রত্যেক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে আওরঙ্গজেব মোগল সাম্রাজ্যের রাজসিংহাসন দখল করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা জানতেন যে সম্রাট শাহজাহান জীবিত আছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন।

উজবেক তাতাররা আওরঙ্গজেবের সঙ্গে অতীত বিশ্বাসঘাতকতার কথা ভোলেনি। সে জন্য তাদের মনে আতঙ্ক ও সঙ্কোচ ছিল। তবুও দুই উজবেক খান আওরঙ্গজেবের দরবারে রাষ্ট্রদূত পাঠান এবং সম্রাটকে যথারীতি সম্মান জানাতে বলে দেন।

যুদ্ধবিগ্রহের পর যদি স্বেচ্ছায় কেউ বন্ধুত্ব করতে চায় তাহলে তার মূল্য দেয়া উচিত, দূরদর্শী আওরঙ্গজেব তা জানতেন। তিনি এটাও জানতেন, উজবেক খানরা প্রতিশোধের ভয়ে অথবা কোনো স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর কাছে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছেন। তবুও তিনি তাঁদের ভদ্রতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে কুণ্ঠিত হননি। ঠিক এ সময় আমি রাজদরবারে উপস্থিত ছিলাম এবং এ দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। যা দেখেছি তার বিবরণ দিচ্ছি।[১]

উজবেক তাতার দূতদের কথা

তিন-তিনবার কপাল থেকে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে উজবেক তাতার রাষ্ট্রদূতরা সম্রাটকে সেলাম করেন। তারপর তারা আওরঙ্গজেবের এতো কাছে এগিয়ে যান যে সম্রাট স্বচ্ছন্দে তাদের হাত থেকে চিঠিগুলো নিজেই নিতে পারতেন, কিন্তু নেন না। একজন ওমরাহ এই চিঠি ও উপহারের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন।[২] তিনি নিজে চিঠি গ্রহণ করেন এবং খোলেন। তারপর সম্রাটের হাতে দেন। সম্রাট গম্ভীরভাবে সেই চিঠি পাঠ করেন এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রদূতকে শিরোপা উপহার দিতে আদেশ করেন। অর্থাৎ তাতার দূতদের পাগড়ি, জরির কারুকায করা মেরজাই এবং কোমরবন্ধনী উপহার দিতে বলেন। তারপর উজবেক খানরা যে উপঢৌকন পাঠিয়েছিলেন, দূতরা তা নিয়ে আসেন। তার মধ্যে ছিল কয়েক বাক্স উৎকৃষ্ট নীল রঙের নীলোপল বা বৈদুর্যমণি (Lapis

---

১. বার্নিয়ারের এই প্রত্যক্ষ বিবরণের মধ্যে মোগল দরবারে রাষ্ট্রীয় আদব-কায়দা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানার বিষয় আছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক দিয়ে এর মূল্য অস্বীকার করা যায় না। জানার বিষয়ের দিকে নজর রেখে এখানে তাই প্রত্যক্ষদর্শী বার্নিয়ারের এই বিবরণের সারানুবাদ করা হয়েছে।– অনুবাদক।

২. 'ওমরাহ' শব্দটি 'আমির' শব্দের বহুবচন, মোগল দরবারের কর্মচারীদের ক্ষেত্রে সংঘবদ্ধভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু সাধারণত লেখক ও বিদেশী পর্যটকরা 'আমির' ও 'ওমরাহ' একই অর্থে (একবচন) ব্যবহার করেন।

Lazuli)।[৩] কয়েকটি ভালো জাতের তেজী তাতার ঘোড়া, উটের পিঠে বোঝাই নানা রকমের ফল– আপেল আঙুর ইত্যাদি। বোখারা- সমরকান্দ থেকেই প্রধানত এসব ফল দিল্লীর দরবারে আমদানি করা হতো। এ ছাড়া তার মধ্যে কয়েক জোড়া শুকনো বোখারাও ছিল।[৪]

উজবেক খানদের উপঢৌকনের প্রাচুর্য দেখে আওরঙ্গজেব খুশি হন এবং উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রত্যেকটি জিনিসের প্রশংসা করেন। এমন ফল, এমন ঘোড়া, এমন উট নাকি আর কোথাও দেখা যায় না, তিনি এমন কথা বলেন! তারপর সমরকন্দের মাদ্রাসা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন করে তাদের বিদায় দেন।[৫]

অভ্যর্থনাদির অনুষ্ঠান সমাপ্তি ঘোষণার পর উজবেকের তাতার দূতরা বেশ খুশি হয়ে ফিরে যান। ভারতীয় রীতিতে মাথা হেঁট করে সালাম করার জন্য তারা বিরক্ত হননি। সালামের পদ্ধতিটা প্রকৃতপক্ষেই বিসদৃশ। তার মধ্যে কোথায় যেনো একটা গোলামির আভাস রয়েছে।

সম্রাট যে নিজ হাতে তাদের কাছ থেকে পত্র নেননি, তাতেও উজবেক খানের দূতরা তেমন ক্ষুব্ধ হননি। তাদের যদি মাটিতে মুখ ঠেকিয়ে সাষ্টাঙ্গে অভিরাদন করতে বলা হতো, অথবা তার চেয়েও লজ্জাকর কোনো উপায়ে,. আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহলেও তারা বিনা দ্বিধায় তা করতেন।

---

৩. 'Lapis-Lazuli' গাঢ় নীল বর্ণের মূল্যবান পাথর, নীলোপল বা বৈদূর্যমণি বলা হয়। এই পাথর গুঁড়ো করে ইরান, কাশ্মীর ও দিল্লীর লিপিকররা পাণ্ডুলিপি চিত্রণের জন্য নীল রং তৈরি করতেন। বৈদূর্যমণি চূর্ণের এই নীল রঙের ঔজ্জ্বলতার সঙ্গে রাসায়নিক পদ্ধতিতে তৈরি নীল রঙের কোনো তুলনা হয় না। এসব মণিরত্ন রাষ্ট্রদূতরা উপঢৌকন দিতেন বোধ হয় তাজমহলের জন্য। যদিও ১৬৪৮ সালে তাজমহল তৈরির কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিলো। (built by Titans, finished by Jewllers)।
১৮৬৯ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত একটি ফারসী পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাজমহল নির্মাণের বিবরণ আছে। তাতে বলা হয়েছে, নীলোপল শ্রীলঙ্কা থেকে আমদানি করা হয়েছিলো। কিন্তু এ কথাও প্রসঙ্গত বলা হয়েছে যে, তাজমহল নির্মাণে যে সব মূল্যবান মণিরত্ন ব্যবহার করা হয়েছে তার অধিকাংশই রাজা-মহারাজা আর নবাবরা স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন অথবা বিদেশের রাজারা উপঢৌকন পাঠিয়েছেন।

৪. বোখারার এক জাতের শুক্‌নো ফল। একেই আমরা 'আলুবোখারা' বলি।

৫. এককালে সমরকান্দ তৈমুর লংয়ের রাজধানী ছিল। 'সমরকন্দের মধ্যস্থলে ছিল রিজিস্থান নামে একটি স্কয়ার, তার মধ্যে তিনটি বিখ্যাত মাদ্রাসা অবস্থিত। এর দুটির নাম– 'উলুগ-বেগ' ও 'শের্-দর মাদ্রাসা।' 'শের্-দর্' মাদ্রাসা ১৬০১ সালে নির্মাণ করা হয় এবং তার সিংহদ্বারের মাথায় থাকা দুটি সিংহ থেকে এ নাম রাখা হয়। নীল, সবুজ, লাল ও সাদা এনামেল করা ইট দিয়ে মাদ্রাসাটি তৈরি এবং সমরকন্দের সেই তিনটি মাদ্রাসার মধ্যে শের্-দর্ই অন্যতম ও বৃহত্তম। এই মাদ্রাসার ৬৪টি ঘরে ১২৮ জন মৌলবী বাস করতেন। ১৬১৮ সালে তৈরি করা হয় 'উলুগ্-বেগ্' মাদ্রাসা। স্বর্ণাচ্ছাদিত এই মাদ্রাসায় ৫৬টি ঘর রয়েছে। আয়তনে সবচেয়ে ছোট হলেও 'উলুগ্-বেগ্' মাদ্রাসাই সবচেয়ে বিখ্যাত। গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রের চর্চার জন্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে উলুগ বেগ মাদ্রাসা সমগ্র প্রাচ্যে খ্যাতি অর্জন করে।' (Encyclopaedia Britannica, 9th 1886)। – অনুবাদক।

এ কথা ঠিক যে, দূতদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যে এভাবে অভিবাদন করতে অথবা ওমরাহ মারফত চিঠি গ্রহণ করতে বলা হয়নি। এই মর্যাদা মোগল দরবারে একমাত্র ইরানের রাষ্ট্রদূত পেয়ে থাকেন, তাও সব সময় নয়, কখনো কখনো।

উজবেক রাষ্ট্রদূতরা প্রায় চার মাস দিল্লীতে ছিলেন। দীর্ঘদিন থাকার কারণে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। তাদের সাঙ্গোপাঙ্গরা অনেকে রোগে ভুগে মারাও যায়। তারা এ দেশের অত্যধিক গরম সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছিলেন কি না, তা অবশ্য সঠিক বলা যায় না। এমনও হতে পারে, নিজেদের নোংরা জীবনযাত্রার জন্য অথবা যতোটা খাদ্য খাওয়া উচিত তা না খাওয়ার জন্য তাদের মৃত্যু হয়েছে।

এই উজবেক তাতারদের মতো সংকীর্ণমনা ও অপরচ্ছিন্ন নোংরা মানুষ আমি আর দেখিনি।

দূতাবাসের কর্মী হিসেবে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে এই রাষ্ট্রদূতরা যা হাতখরচ পেতেন, তা খরচ না করে কৃপণের মতো জমিয়ে রাখতেন এবং দীনহীনের মতো জঘন্যভাবে দিন কাটাতেন। তা সত্ত্বেও এ ধরনের অদ্ভুত জীবদের বিদায় দেয়া হয় মহাসমারোহে। সম্রাট প্রত্যেককে দুটি করে মূল্যবান শিরোপা এবং নগদ আট হাজার করে টাকা দেন। এ ছাড়া তিনি খানদের উপঢৌকনও পাঠান। এর মধ্যে ছিল সুন্দর সুন্দর শিরোপা, সোনা-রুপা ও জরির কাজ করা নানা ধরনের কাপড়, কয়েকটি কার্পেট এবং দুই খানের জন্য মণিমুক্তা খচিত দুটি কৃপাণ।

আমার এক উজবেক বন্ধু ছিলেন। তিনি আমাকে সম্রাটের চিকিৎসক বলে এই রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। আমিও তিনবার দূতাবাসে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করি। আমার ইচ্ছা ছিল রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকে তাদের দেশ সম্পর্কে জানার মতো কিছু শুনবো। কিন্তু দুঃখের কথা, রাষ্ট্রদূত হলেও তারা নিজ দেশ সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না। এমনকি তারা নিজ দেশের ভৌগোলিক সীমানাটুকু সম্পর্কেও অজ্ঞ। স্বদেশ সম্পর্কে এরকম দুঃখজনক অজ্ঞতা সচরাচর দেখা যায় না। তাতাররা যে এক সময় চীন জয় করেছিলো, সে সম্পর্কেও তারা জানেন না।[৬] মোটকথা, দূতদের সঙ্গে আলাপ করে আমি বিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারিনি।

---

৬. ১১০০ সালে উজবেগদের তাতার বাহিনী চীনে প্রথম সামরিক অভিযান পরিচালনা করে। বার্নিয়ার সম্ভবত সেই অভিযানের কথা বলেননি। তখন তাতাররা বিতাড়িত হয় এবং ১৬৪৪ সালে পুনরায় অভিযান করে চীন জয় করে। সুন্ চিং বা চুন্-চি চীনের সম্রাট হন। বার্নিয়ার এই চীন-বিজয়ের কথা বলেছেন। তখন যে মাঞ্চু-তাতার রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, ১৯১২ সাল পর্যন্ত তাঁদের বংশধররাই চীনে রাজত্ব করে।—অনুবাদক।

একদিন তাতার দূতদের সঙ্গে বসে খাবার খেতে খুব ইচ্ছা হয়েছিলো। লক্ষ্য করে দেখেছি, খাবার টেবিলে কাউকে বসতে দিতে তাদের তেমন আপত্তি নেই। নিমন্ত্রিত হয়ে একদিন খেতে বসি। কিন্তু কি খাবো? খাবার বলতে বিশেষ কিছু ছিল না– একমাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘোড়ার মাংস ছাড়া। তাহলেও খেতে যখন বসেছি তখন কিছু তো খেতেই হবে। না খেলে আমার ব্যবহারে হয়তো তারা ক্ষুণ্ন হবেন। তাদের কাছে যা পরম সুস্বাদু আমার কাছে তা যে অখাদ্য, তা প্রকাশ করার উপায় নেই।

খাবার সময় আমি আর একটি কথাও বলিনি। সে অবসরে তারা গোগ্রাসে পোলাও গিলতে থাকেন।[৭] চামচ দিয়ে খেতে তারা জানেন না। বেশ পেট ভরে খেয়েদেয়ে খোশমেজাজে দু'চার কথা আলাপ করতে থাকেন। বুঝতে পারি, এতোক্ষণে তাদের আলাপ করার মতো মেজাজ হয়েছে।

প্রথমেই তারা আমাকে বোঝাতে চান যে, উজবেকদের মতো বলিষ্ঠ জাতি আর দ্বিতীয়টি নেই। শুধু তাই নয়, তীরধনুকের ব্যবহারে তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারে না কেউ।

কথাটা বলা মাত্রই তীর-ধনুক আনার হুকুম দেয়া হয়।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে আকৃতির তীর-ধনুক ব্যবহার করা হয়, এগুলো তার চেয়ে অনেক বড়। ধনুকে তীর চড়িয়ে একজন বলেন, এই তীর দিয়ে আমরা যে কোনো ষাঁড় বা ঘোড়াকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারি।

তারপর আরম্ভ হয় উজবেক মেয়েদের বীরত্বের সব চমকপ্রদ কাহিনী। সে কাহিনী আর শেষ হয় না। তার মধ্যে একটি কাহিনী শুনে আমিও চমৎকৃত হই। উজবেকি ঢঙে তার বর্ণনা করবো কী?

---

৭. ফার্সী 'পিলাও' শব্দ থেকে 'পোলাও' শব্দটির উৎপত্তি, যা মুসলমান আমলের বিখ্যাত খাদ্য। ওভিংটন্ তাঁর 'A Voyage to suratt, in the year 1689' নামক গ্রন্থে (১৬৯৬ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত) 'পোলাও সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছেন : 'Palau, that is Rice boiled so artificially, that every grain lies singly without being added together, with spices intermixt and a boiled Fowl in the middle, is the most common Indian Dish; and a dumpoked Fowl, that is, boil with butter in any small Vessel and stuft with Raisons and almounds is another.' (৩৯৭ পৃষ্ঠা)। পোলাও বিলাসীরা এই বর্ণনা পড়ে খুশি হবেন। নানারকমের মশলাপাতি ও ঘি দিয়ে চাল এভাবে সিদ্ধ করে রান্না তার মধ্যখানে একটি সিদ্ধ মুরগি, এই হলো পোলাও, অর্থাৎ মুরগির পোলাও। অবশ্য ওভিংটন্ বললেও এই খাদ্য মোগল যুগের সাধারণের খাদ্য ছিল না। তিনি যে মহলে ঘোরাফেরা করতেন অর্থাৎ ওমরাহ-মহলে ও রাজদরবারে, সেখানে হয়তো 'Common dish' ছিল। 'Dumpoked' কথাটি ফার্সী 'দম্‌পুখ্‌ত' থেকে ইংরেজি করা হয়েছে। এর অর্থ 'Steam-boiled' বা বাষ্পে সিদ্ধ। আজকালকার দিনে দমপুখ্‌ত' বা ' বাষ্পে সিদ্ধ' মুরগির কথা নিশ্চয়ই ব্যাখা করে বোঝাবার দরকার নেই।– অনুবাদক।

কাহিনীটি এরকম :

আওরঙ্গজেব একবার উজবেকদের দেশ জয় করতে গিয়েছিলেন। তাঁর প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন অশ্বারোহী সৈন্য উজবেকদের একটি গ্রামে হানা দিয়ে লুটপাট চলায়। সে সময় এক উজবেক বৃদ্ধ রমণী এসে সৈন্যদের বলে, 'বাছারা! আমার কথা শোনো। এভাবে লুটপাট কোরো না। আমার মেয়েটি এখন বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়েছে তাই রক্ষা। তা না হলে মজাটা টের পেতে। যা হোক, আমার মেয়ের ঘরে ফেরার সময় হয়ে গেছে। সময় থাকতে জান নিয়ে কেটে পড়ো।'

বৃদ্ধার কথায় কেউ কান দেয় না, দেয়ার কথাও নয়। তারা নিজের কাজ হাসিল করে, ঘোড়ার পিঠে লুটের মাল বোঝাই করে নিয়ে চলতে থাকে। গ্রামের কিছু লোকজনও বন্দী করে নেয় দাসদাসী হিসেবে, তার মধ্যে ঐ বৃদ্ধাও একজন।

কিছুদূর যেতেই পথে বৃদ্ধার সঙ্গে তার মেয়ের দেখা হয়। সে বাড়ির দিকে আসছিলো। মেয়েকে দেখেই বৃদ্ধা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলে। মেয়েটি কিন্তু তখনো অনেক দূরে ছিল। তাকে স্পষ্ট দেখা বা চেনা যাচ্ছিলো না। দুর্বারগতিতে এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুর থেকে ওঠা ধুলোর ধূম্রজাল ভেদ করে ঘোড়সওয়ার উজবেক কন্যার মূর্তি দূর থেকে আবছা ভেসে ওঠে বৃদ্ধা মায়ের চোখে। ক্রমে সেই মূর্তি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হতে থাকে। একসময় দেখা যায় ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা তীরধনুকঅলা উজবেক কন্যার দৃপ্ত মূর্তি– নির্ভীক যোদ্ধার মতো তেজোদীপ্ত। দূর থেকে তখন বৃদ্ধার মেয়ে বলছে, কোনো প্রতিশোধ না নিয়ে সে শত্রুদের মুক্তি দিতে রাজি আছে, যদি লুটের সব মাল ও গ্রামের লোকজনদের ফিরিয়ে দিয়ে তারা নির্বিবাদে নিজেদের দেশে ফিরে যায়।

মোগল সৈন্যরা উজবেক যুবতীর কথায় কান দেয় না। কারণ সৈন্যরা বীরাঙ্গনার বীরত্বে বিশ্বাসী ছিল না। তারা চলে যাওয়ার জন্য ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়ায়। অমনি বিদ্যুৎবেগে তিন-চারটি তীর এসে সৈন্যদের গায়ে বিঁধে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু হয়।

মোগল সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত তীর বিচিত্র ভঙ্গিতে পাশ কাটিয়ে উজবেক কন্যা আবার তীর ছোড়ে এবং এক-একটি তীরে এক-একজন করে মারা যেতে থাকে। এভাবে মোগল সেনাদলের প্রায় অর্ধেক নির্মূল করে উজবেক কন্যা বাকিদের ওপর তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সবাইকে হত্যা করে।[৮]

---

৮. বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর ডাচ সংস্করণ (আর্মস্টার্ডাম, ১৬৭২ সাল) এই কাহিনীটির একটি চমৎকার খোদাই চিত্র আছে। ইংরেজি সংস্করণে ছবিটি নেই। – অনুবাদক।

তাতার রাষ্ট্রদূতরা যখন দিল্লীতে ছিলেন তখনই আওরঙ্গজেবের কঠিন অসুখ হয়। জ্বরের প্রাবল্যে তিনি প্রায়ই ভুল বকতে থাকেন এবং মাঝেমধ্যে তাঁর কথা বন্ধ হয়ে যায়।[৯]

চিকিৎসকরা হতাশ হন। শুধু তাই নয়, বাইরে রটে যায় সম্রাট মারা গেছেন। তাঁর অসুখের সংবাদটা অবশ্য নিজের কোনো গোপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য শাহজাদী রওশন আরা গোপন করে রেখেছিলেন। এই গোপনীয়তাই ছিলো গুজবের কারণ।

সম্রাট শাহজাহান

এ সময় শোনা যায় রাজা যশোবন্ত সিং বন্দী সম্রাট শাহজাহানকে কারামুক্ত করার জন্য সৈন্য নিয়ে যাত্রা করেছেন। মহবৎ খান, যিনি নির্বিবাদে আওরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন, তিনিও সম্রাট শাহজানকে মুক্ত ও পুনরাভিষিক্ত করার জন্য কাবুলের সুবাদারি থেকে পদত্যাগ করে, লাহোরের মধ্য দিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। বন্দী শাহজাহানের প্রহরী খোজা আতবর খানও সম্রাটের কারাগারের দ্বার খুলে দেয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।

এদিকে আওরঙ্গজেবের বড় ছেলে শাহজাদা সুলতান মুয়াজ্জেম পুর্ণোদ্যমে ওমরাহদের সঙ্গে সিংহাসন দখলের পরামর্শ করতে থাকেন। তিনি গভীর রাতে ছদ্মবেশে রাজা যশোবন্ত সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে তাঁর পক্ষে যোগ

---

৯. আওরঙ্গজেবের অসুখের তারিখ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। আওরঙ্গজেব অসুস্থ হন-১৬৬২ সালের মে-আগস্ট মাসে (Indian Antiquary, 1911) – অনুবাদক।

দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অন্যদিকে রওশন আরা কয়েকজন ওমরাহ ও আওরঙ্গজেবের সৎভাই ফিদাই খানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাত-আট বছর বয়সী আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের পক্ষে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

দুই দলেরই অভিপ্রায় ছিল বন্দীশালা থেকে শাহজানকে মুক্তি দেয়া। সত্য-মিথ্যা যাই হোক, প্রজাসাধারণকে তাঁরা এমনটিই বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু একমাত্র মুখরক্ষা করা ছাড়া এই অভিপ্রায়ের মধ্যে কোনো সদুদ্দেশ্য ছিল না। আমি তো তাঁদের ভেতর একেবারেই কোনো সদুদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, রাজদরবারে আমির-ওমরাহদের মধ্যে তখন এমন একজনও ছিলেন না যিনি সম্রাট শাহজাহানের মুক্তি ও পুনরাভিষেক মনেপ্রাণে কামনা করতেন। একমাত্র যশোবন্ত সিং ও মহবৎ খান প্রকাশ্যে সম্রাট শাহজাহানের কোনো বিরোধিতা করেননি। তা ছাড়া ওমরাহদের মধ্যে কেউ বৃদ্ধ সম্রাটের প্রতি আওরঙ্গজেবের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সামান্য প্রতিবাদ পর্যন্ত করেননি। তাদের প্রকৃতিই তা নয়। ন্যায়বিচার বা সততার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্কই নেই। যিনি যখন সিংহাসন দখল করেন, তারা তখন তাঁকে খোশামোদ করে নিজ আমিরত্ব বজায় রাখেন। ওমরাহরা খুব ভালো করেই জানেন যে, বৃদ্ধ শাহজাহানকে কারামুক্ত করার অর্থ হলো পিঞ্জরাবদ্ধ ক্রুদ্ধ সিংহকে মুক্ত করা। সবাই বৃদ্ধ সম্রাটের ক্ষিপ্ত প্রতিহিংসার ভয় করতেন, খোজা আতবর খানও। কারণ বন্দী শাহজাহানের প্রতি অকথ্য রূঢ় ব্যবহার সম্পর্কে খোজা খুবই উৎসাহী ছিলেন।

অসুস্থতার মধ্যে থেকেও আওরঙ্গজেব স্থিরচিত্তে রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং বন্দী পিতার সার্বিক প্রয়োজনের দিকে নজর রাখতেন। যদি আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে তবে বৃদ্ধ শাহজাহানকে যেনো মুক্তি দেয়া হয়, এই মর্মে তিনি পুত্র সুলতান মুয়াজ্জেমকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন। ওদিকে আবার বৃদ্ধ শাহজাহানের ওপর কড়া নজর রাখার জন্যে খোজা আতবর খানের কাছে প্রায়ই চিঠি লিখতেন।

সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিয়ে রটা গুজব বন্ধ করার জন্য তিনি অসুস্থ অবস্থায় একাধিকার দরবারে এসে ওমরাহদের দর্শন দিয়েছেন। একবার অসুস্থ অবস্থায় তিনি মূর্ছা যান এবং মূর্ছার ঘোর সম্পূর্ণ কেটে যাবার আগে তিনি জীবিত কি মৃত, তা স্বচক্ষে দেখে যাবার জন্যে যশোবন্ত সিংহ সহ কয়েকজন ওমারহকে ডেকে পাঠানো হয়। সেদিনের পর থেকেই তিনি ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠেন।

কিছুটা সুস্থ হয়েই সম্রাট আওরঙ্গজেব দারার কন্যার সঙ্গে তাঁর পুত্র সুলতান আকবরের বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু সম্রাটের সে চেষ্টা ব্যর্থ

হয়। শাহজাহান ও তাঁর কন্যা শাহজাদী জাহান আরার ওপর দারার কন্যার দায়িত্ব ছিল। তাঁরা কিছুতেই আওরঙ্গজেবের প্রস্তাবে সম্মত হন না। দারার কন্যাও ভীত হয়ে পড়েন। তিনি সিদ্ধান্ত নেন, যদি তাঁকে জোর করে আওরঙ্গজেব এই বিয়ে দেন, তাহলে আত্মহত্যা করবেন। এমনটি করা ছাড়া তাঁর উপায় থাকবে না। যিনি তাঁর পিতাকে হত্যা করেছেন, তাঁর পুত্রকে তিনি প্রাণ থাকতে বিয়ে করতে পারবেন না।

শাহজাহানের কাছে আওরঙ্গজেব কিছু মণিমুক্তো চান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ময়ূর সিংহাসনটিকে আরো সুন্দর করে সাজানো। কিন্তু শাহজাহান ক্রুদ্ধ হয়ে আওরঙ্গজেবের অনুরোধ প্রত্যাখান করেন। শুধু তাই নয়, তিনি এই বলে হুঁশিয়ার করে দেন, আওরঙ্গজেব যেনো তাঁর রাজকার্য নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। সিংহাসনের সৌন্দর্য নিয়ে তিনি মাথা না ঘামান। ধনদৌলত, মণিমুক্তো নিয়ে কোনো কথা শাহজাহান আর আওরঙ্গজেবের মুখে শুনতে চান না। মণিমুক্তোর প্রতি তাঁর আর কোনো মোহ নেই সত্যি, তবে ওসব নিয়ে যদি বেশি কাড়াকাড়ি করা হয়, তাহলে তিনি যে কোনো মুহূর্তে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে সব চূর্ণ করে দেবেন।

ডাচ দূতের কাহিনী

এবার হল্যান্ডের পালা। সম্রাট আওরঙ্গজেবকে অভিনন্দন জানাতে ডাচদেরও দেরি হয়নি। দেরি হবার কথাও নয়। তারাও ঠিক করে মোগল দরবারে একজন দূত পাঠাবে এবং সুরাটের বাণিজ্য কুঠির কর্মকর্তা মঁসিয়ে আড্রিকানকে[১০] দূত মনোনয়ন করে।

আড্রিকান ছিলেন বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। দরবারে দূত হয়ে গিয়ে তিনি তাঁর নিজের জন্য অনেক কাজ করে এসেছেন। আওরঙ্গজেব যদিও খুবই রাগী ও দুর্দমনীয় প্রকৃতির সম্রাট, গোঁড়া মুসলমান হিসেবেও সচেতন এবং খ্রিস্টধর্মীদের প্রতি সাধারণত বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, তবুও এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ শিষ্টতার পরিচয় দেন। তিনি দরবারে যেভাবে ডাচ রাষ্ট্রদূতকে গ্রহণ করেন তা থেকেই সম্রাটের এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। মঁসিয়ে আড্রিকান যখন ভারতীয় পদ্ধতিতে সালাম জানিয়ে দরবরাগৃহে প্রবেশ করেন, তখন আওরঙ্গজেব খুশি হয়ে তাঁকে সালামের পরিবর্তে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্যালুট জানাতে বলেন।

---

১০. ১৬৬২ থেকে ১৬৬৫ সাল পর্যন্ত ডার্ক ভ্যান্ আড্রিকেন সুরাটের ডাচ কুঠির ডিরেক্টর ছিলেন। তিনিই আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে ফরমান নিয়ে (দিল্লী ২৯ অক্টোবর, ১৬৬২ সাল) বাংলাদেশে ও উড়িষ্যায় বাণিজ্যের নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা করে নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে রাষ্ট্রদূত হয়ে গিয়ে তিনি এই ফরমানটি নিয়ে আসেন। – অনুবাদক।

সম্রাটের কথায় আড্রিকান ইউরোপীয় পদ্ধতিতে স্যালুট করেন। সম্রাট অবশ্য নিজের হাতে না নিয়ে ওমরাহ মারফরত তাঁর পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। এটা তিনি অসম্মান দেখানোর জন্য করেননি, এটাই হলো বাদশাহী রীতি। উজবেক রাষ্ট্রদূতদের কাছ থেকেও তিনি এভাবেই পরিচয়পত্র গ্রহণ করেছেন।

প্রাথমিক অনুষ্ঠানাদি শেষ হবার পর আওরঙ্গজেব ডাচ রাষ্ট্রদূতকে তাঁর উপঢৌকন দেখাতে আদেশ করেন। এটাও একটা রাজদরবারের রীতি। প্রথমে সম্রাট নিজে একটি শিরোপা উপহার দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ডাচ দূত যে সব উপহার দেন তার মধ্যে লাল ও সবুজ রঙের বড় বড় উৎকৃষ্ট আয়না, চীনা ও জাপানী কারুকাজ করা নানাবিধ সামগ্রী[১১]– তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান হলো একটি পালকি ও একটি তখ্‌ৎ-রওয়ান।[১২] শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে দুটোই সুন্দর।

বিদেশী রাষ্টদূতদের যতোদিন সম্ভব সম্রাট ধরে রাখতে চান। বোধ হয় তাঁর ধারণা, বিদেশী দূতরা দরবারে উপস্থিত থাকলে প্রজাদের কাছে তাঁর সম্মান ও প্রতিপত্তি বাড়বে। তিনি প্রমাণ করতে পারবেন, তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণেই বিদেশী সম্রাটরা তাঁর দরবারে প্রতিনিধি পাঠিয়েছেন। তা না হলে আর এমন কোনো কারণ নেই যার জন্য তিনি বিদেশী রাষ্ট্রদূতদের এতোদিন ধরে রাজধানীতে আটকে রাখবেন। তাই বলা যায়, লোক দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য।

আমির-ওমরাহদের সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রদূতরা নানাবেশে রাজদরবারে শোভাবর্ধন করবেন, এটাই হলো সম্রাটের ইচ্ছে। মঁসিয়ে আড্রিকানকে সে জন্য তিনি সহজে ছাড়েননি। আড্রিকানের সেক্রেটারি মারা যান, অন্য কয়েকজন দূতাবাসের কর্মচারীরও মৃত্যু হয়। তখন আওরঙ্গজেব ডাচ রাষ্ট্রদূত আড্রিকানকে রাজধানী ত্যাগের অনুমতি দেন। বিদায়ের সময় তিনি তাঁকে আরেকটি শিরোপা উপহার দেন এবং বাটাভিয়ার[১৩] গভর্নরের জন্য একটি আলাদা শিরোপা দেন, যেটি খুবই মূল্যবান। তার সঙ্গে একটি মণিমুক্তাখচিত ভোজালিও দেন। স্বতন্ত্র একটি বিনয়পত্রে অভিনন্দন জানাতেও ভোলেন না।

---

১১. মোগল যুগের ভারতীয় চিত্রশিল্পীর আঁকা রাজদরবারের ছবির মধ্যে বহু সংখ্যক জাপানী ও চীনা ফুলদানি দেখতে পাওয়া যায়। তা থেকে বোঝা যায়, অনেকে মোগল দরবারে চীনা ও জাপানী দ্রব্যাদি উপহার দিতেন। – অনুবাদক।

১২. "তখ্‌ৎ-রওয়ান" শব্দটির অর্থ 'চলন্ত সিংহাসন'। 'তখ্‌ৎ অর্থ সিংহাসন এবং 'রওয়ান' অর্থ রওনা হওয়া বা চলমান। – অনুবাদক।

Takhta or Takht-rawan: A Plank or platform on which public performers, singers and dancers, are carried on men's heads in festival and religious processions, — Wilson's Glossary.

১৩. বাটাভিয়ার গভর্নর 'ইস্ট ইন্ডিজের ডাচ বাণিজ্যকুঠিগুলোর প্রধান কর্মকর্তা অর্থাৎ ডাচ ইস্ট ইন্ডিজের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। – অনুবাদক।

ডাচ রাষ্ট্রদূতের আসল উদ্দেশ্য ছিল মোগল সম্রাটের নেকনজরে আসা এবং হল্যান্ড যে একটা উন্নত দেশ, ডাচরা যে একটি বিরাট ব্যবসায়ী জাতি, এই উচ্চধারণা তাঁর মনে জাগিয়ে তোলা। আদ্রিকান জানতেন, যদি কোনো রকমে তিনি মোগল সম্রাটকে অভিভূত করতে পারেন, তাহলে সমগ্র ভারতে তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ করে নিতে পারবেন। এরই মধ্যে তাঁরা যে সব জায়গায় বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেখানকার সুবাদারদের উৎপীড়ন ও বাধাবিপত্তি থেকেও তাঁরা মুক্তি পাবেন।

শেষপর্যন্ত ঠিক এই মর্মের একটি ফরমান তিনি সম্রাটের কাছ থেকে জারি করিয়ে নেন। সম্রাটকে তিনি বোঝাতে সক্ষম হন যে, তাঁদের দেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক লেনদেন থাকলে ভারতেরই ঐশ্বর্য বাড়বে। কিন্তু ভারত থেকে কি পরিমাণ ঐশ্বর্য তাঁরা ব্যবসায়ের নামে লুঠ করতে পারবেন, সে কথা আর জানানোর দরকার মনে করেননি।

আওরঙ্গজেবের চরিত্রের অন্য দিক

ঠিক এ সময় একদিন এক বিখ্যাত ওমরাহ চোখে-মুখে আতঙ্ক ফুটিয়ে সম্রাটকে বলেন, জাহাপনা! আপনি যেভাবে দিনরাতের সারাটা সময় রাজকার্য নিয়ে সময় কাটাচ্ছেন, তাতে আপনার স্বাস্থ্যহানি হবার সম্ভাবনা রয়েছে। এমনকি এতে আপনার মানসিক সজীবতাও নষ্ট হতে পারে।

মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব

শুভাকাঙ্ক্ষী ওমরাহের কথাগুলো সম্রাটের কাছে গ্রহণযোগ্য তো মনে হয়ইনি, বরং তা তোষামোদী ধাঁচের মনে হয়েছে। তাই তিনি ধীরে ধীরে অন্য এক ওমরাহের দিকে এগিয়ে গিয়ে যা বলেন তা থেকে সম্রাটের চরিত্রের আভাস পাওয়া যায়। সম্রাটের সেই নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাটি আমি ওমরাহের এক

চিকিৎসকের পুত্রের কাছ থেকে শুনেছি। পুত্রটি আমার বন্ধু। সম্রাট আওরঙ্গজেব বলেছেন:

> আপনারা সকলেই সুধীজন, বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। আপনারা জানেন সঙ্কটের সময় সম্রাটের কর্তব্য কি। জাতির বা দেশের সঙ্কটকালে সম্রাটের একমাত্র কর্তব্য হলো তাঁর নিজের জীবন বিপন্ন করে, প্রয়োজন হলে নিজে তলোয়ার হাতে নিয়ে প্রজাদের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়া। সম্রাটের এই কর্তব্য সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই মতভেদ নেই। কিন্তু তবু আমার এই শুভাকাঙ্ক্ষী ওমরাহটি আমাকে বোঝাতে চাইছেন যে, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার নাকি খুব একটা মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই! তার জন্য একটি বিনিদ্র রাত্রিও যাপন করা আমার উচিত নয়, একদিনের জন্যও আমোদ-প্রমোদ বর্জন করা ঠিক নয়। তাঁর মতে, আমার উচিত সবসময় নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখা এবং আমার ভোগবিলাস সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। হয়তো তিনি চান যে কেনো একজন উজীরের ওপর রাজ্যের পুরো দায়িত্ব তুলে দিয়ে আমি নিস্কৃতি পাই। তিনি জানেন না বোধ হয়, সম্রাটের ছেলে হয়ে যখন জন্মেছি এবং সিংহাসনে বসেছি, তখন আল্লাহ আমাকে নিজের জন্য বাঁচার ও চিন্তা করার সুযোগ দেননি– তিনি আমার প্রজাদের সুখ ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। যেখানে প্রজাদের সুখ নেই, সেখানে আমারও সুখ নেই। প্রজাদের সুখই আমার সুখ। প্রজাদের সুখ ও শান্তিই আমার সর্বক্ষণের ভাবনা। একমাত্র ন্যায়বিচার, রাজকীয় কর্তৃত্ব ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাময়িকভাবে এ চিন্তা বিসর্জন দেয়া যায়, তা ছাড়া অন্য কোনো সময় নয়।
>
> নিষ্ক্রিয়তা বা অন্যের ওপর নিজের দায়িত্ব চাপানোর ফলাফল যে কি রকম ভয়াবহ হতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শদাতার বোধ হয় কোনো ধারণা নেই। এ জন্যই তো মহাকবি সাদী বলেছেন : 'রাজা হয়ে জন্মো না, রাজা হয়ো না! যদি রাজা হও, তাহলে প্রতিজ্ঞা করো যে তোমার রাজ্য তুমি নিজেই শাসন করবে।'
>
> আমার ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুটিকে বলুন, তিনি যদি সত্যি সত্যিই আমার প্রিয়পাত্র হতে চান, তাহলে এরকম সদুপদেশ দেয়ার বা অকারণে আমার মোসাহেবি করার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তবিষ্যতে আর যেন কোনো দিন তিনি এ ধরনের অযাচিত উপদেশ দিতে না আসেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের জন্য মানুষের সহজ প্রবৃত্তি এমনিতেই যথেষ্ট সজাগ, তাকে জাগাবার জন্য কোনো উপদেশের প্রয়োজন হয় না। ঘরে আমাদের স্ত্রীরাই সে কাজ অনেকটা করতে পারেন। তার জন্য রাষ্ট্রীয় পরামর্শদাতার দরকার নেই।

খোজার বিচিত্র প্রেম কাহিনী

এ সময় আরো একটি মজার ঘটনা ঘটে। সম্রাটের বেগম মহলে সেই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো সাড়া পড়ে যায়। খোজারা কখনো প্রেমে পড়তে পারে না বলে আমার মনে যে বদ্ধমূল ধারণা ছিল, তাও বদলে যায়। ঘটনাটি বেশ মজার এবং সত্য।

দিদার খান নামে সম্রাটের হারেমে এক খোজা ছিল। আমোদ-ফুর্তি করার জন্য সে একটি আলাদা বাড়ি বানিয়েছিলো এবং মাঝেমধ্যে সেখানেই সে রাত কাটাতো। এই দিদার খান হঠাৎ এক হিন্দু কেরানীর[১৪] সুন্দরী বোনের প্রেমে পড়ে। কিছুদিন পর সেই গোপন সম্পর্কের কথা নিয়ে হেরেমের ভেতর ও বাইরে কানাঘুষা শুরু হয়। কিন্তু কারো মনে ব্যাপারটা ভয় ধরাতে পারে না। সবাই ভাবে, এক খোজা কি আর এমন ঘটতে পারে। কোনো মেয়ের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে খোজা আবার প্রেমে পড়বে কি! আর যদি কোনোভাবে প্রেমে পড়েই যায়, তাহলেও এমন কিছু তাদের মধ্যে ঘটতে পারে না যা নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। কিন্তু পরবর্তী সময় খোজার প্রেম কবির প্রেমকেও ছাড়িয়ে যায়। প্রেমের জল অনেক দূর গড়ায়।

দিদার খান ও কেরানীর বোনের সম্পর্ক গভীর থেকে গভীরতর হতে থাকে। প্রতিবেশীরা হিন্দু কেরানীকে সাবধান করে দেয়। অনেকে কটু কথায় অপমান করতেও ছাড়ে না। কেরানী ভদ্রলোক তাদের কথায় বিচলিত ও অপমানিত হয়ে একদিন তার বোন ও খোজাকে ডেকে পরিষ্কার বলে দেন, তাদের নিয়ে যে সব কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে তা তার জন্য খুবই অপমানকর। ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত।

সত্য প্রমাণ হতে খুব বেশি দিন লাগে না। একদিন দেখা যায় এক ঘরে একই শয্যায় সেই বোনটি খোজাসহ শুয়ে আছে। হিন্দু ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে দিদার খান ও তার বোনকে হত্যা করেন। এ ঘটনায় হারেম ও বেগম মহলে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। হারেমের অন্য খোজারা সিদ্ধান্ত নেয় কেরানীকে তারা হত্যা করবে! কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেব সেই ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারেন এবং ভীষণ ক্রুদ্ধ হন। তিনি ষড়যন্ত্রকারী খোজাদের সাজা দেন। অবশ্য এর বিনিময়ে তিনি সেই হিন্দু কেরানীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিতে বাধ্য করেন। খোজা দিদার খানের অপূর্ব প্রেম কাহিনীর এভাবে সমাপ্তি ঘটে।

---

১৪. বার্নিয়ারের পাণ্ডুলিপিতে "Un Ecrivain Gentil" কথাটি আছে। অর্থ হলো হিন্দু লেখক, লিপিকর বা কেরানী। এই সময় রাজস্ব আদায়, হিসাবপত্র রাখা, রাজদরবারের পত্রনবীশের কাজ করা প্রায় হিন্দুদের একচেটিয়া ছিল। হিন্দু চৌধুরী, হিসাবনবীশ ও পত্রনবীশরা সকলেই ফার্সী ভাষায় দক্ষ ছিলেন। অধ্যাপক ব্লকম্যান "A Chapter from Muhammadan History" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন : 'The Hindus from the 16th century tooks so jealously to persian education, that, before another century had elapsed, they had fully come up to the Muhammadans in point of literary acquirements."

শাহজাদীর প্রেম

খোজার প্রেম শেষ হতে না হতেই শাহজাদীর প্রেম আরম্ভ হয়। ঠিক যে সময় দিদার খানের প্রেমের ব্যাপার ঘটে, সে সময় রওশন আরা বেগম হেরেমে দুই ভদ্রলোককে প্রবেশের অধিকার দিয়েছেন বলে গুজব রটে। সম্রাট আওরঙ্গজেব পুরো কাহিনী শুনে ক্রুদ্ধ হন। তবুও শুধু সন্দেহের বশে তিনি তাঁর বোনের সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করেননি। সম্রাট শাহজাহান যেভাবে তাঁর কন্যার প্রেমিকাকে গরম পানির টবে দগ্ধ করে হত্যা করেছিলেন, আওরঙ্গজেব তা করেননি। ঘটনাটি আমি এক বৃদ্ধার মুখ থেকে শুনেছিলাম, তাই এখানে বর্ণনা করেছি।

বৃদ্ধার হেরেমে অবাধ যাতায়াত ছিল। দুই যুবকের সঙ্গে রওশন আরার আলাপ-পরিচয় হয়েছিলো এবং তার মধ্যে একজনের সঙ্গে আলাপ বোধ হয় প্রেমালাপে রূপ নিয়েছিলো। রওশন আরা তাকে হেরেমের কোথাও লুকিয়ে রেখেছিলেন বলে শোনা যায়।

একদিন রওশন আরা তাঁর পরিচারিকাদের হেরেম থেকে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য সেই যুবকের ওপর ভার দেন। রাতের অন্ধকারে যুবকটি যখন পরিচারিকাদের নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলো তখন প্রহরীর চোখে পড়ার জন্যই হোক বা আতঙ্কেই হোক, পরিচারিকারা পালিয়ে যায়। বিশাল উদ্যানের মধ্যে গভীর রাতে যুবকটি একাকী দিশেহারার মতো ঘুরে ঘুরে পরিচারিকাদের খুঁজতে থাকে। এমন সময় কোনো প্রহরী তাকে বন্দী করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যায়।

সম্রাট আওরঙ্গজেব হঠাৎ উত্তেজিত না হয়ে তাকে প্রশ্ন করে চলেন। প্রশ্নের উত্তর থেকে তিনি শুধু এটুকু জানতে পারেন যে, রাতে প্রাচীর টপকে সে হারেমে প্রবেশ করেছিলো।

যুবকটির উত্তর থেকে সম্রাট তার অপরাধের কোনো সঠিক প্রমাণ পান না। সুতরাং কোনো কঠোর সাজা না দিয়ে তিনি আদেশ দেন, যেভাবে যুবকটি উদ্যানে প্রবেশ করেছিলো, ঠিক সেভাবে যেনো প্রাচীর টপকে বেরিয়ে যায়।

বাঁশের চেয়ে চিরকালই কঞ্চি দড়। সম্রাটের আদেশে ও বিচারে খোজাদের মন ভরে না। যুবকটি যখন প্রাচীরের ওপর ওঠে তখন খোজারা তাকে উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে নিচে থাকা পরিখার ভেতর ফেলে দেয়। তারপর তার কি হয়েছে না হয়েছে, তা জানা যায়নি।

দ্বিতীয় প্রেমিকের বিচারও প্রায় একই পদ্ধতিতে করা হয়। একদিন তাকেও গভীর রাতে বাগানের মধ্যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে দেখা যায়। খোজারা তাকে চ্যাংদোলা করে সম্রাটের কাছে নিয়ে যায়। সম্রাট তাকেও প্রশ্ন করে জানতে পারেন যে সে সামনের ফটক দিয়ে প্রাসাদের ভেতর প্রবেশ করেছে।

সম্রাট আদেশ দেন তাকে সোজা ফটক দিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে যেতে। এমন রায় শুনে নিশ্চয়ই অন্যেরা অবাক হয়ে গিয়েছিলো। অপরাধীকে সোজা ফটক দিয়ে বেরিয়ে যেতে বলা আশ্চর্য ব্যাপার নয় কি?

আওরঙ্গজেব খোজাদের কঠিন সাজা দেবেন স্থির করেন। কারণ তাদের ঢিলেমির জন্য যদি ফটক দিয়ে বাইরের লোক হেরেমে প্রবেশ করতে পারে, তাহলে বেশিদিন আর হেরেমের সম্মান রক্ষার করা সম্ভব হবে না। শুধু সম্মান রক্ষা করার জন্য নয়, সম্রাটের আত্মরক্ষা ও নিরাপত্তার জন্যও খোজাদের এই উদাসীন পাহারা দেয়া চলবে না। তাই প্রেমিকের উত্তর শুনে সম্রাট তাকে সাজা না দিয়ে খোজাদের কঠোর সাজা দেন।

আরো পাঁচ দূতের কথা

এ ঘটনার কয়েক মাস পর পাঁচজন রাষ্ট্রদূত দিল্লীতে এসে পৌছেন– প্রায় একই সময়। প্রথম দূত আসেন মক্কার প্রশাসকের কাছ থেকে। তিনি যা উপঢৌকন নিয়ে আসেন তার মধ্যে বলার মতো হলো, কয়েকটি আরবীয় ঘোড়া। একটি খেজুর পাতার ব্রাশও তিনি সঙ্গে এনেছিলেন। এই ব্রাশ দিয়ে মক্কার পবিত্র কাবা শরীফের প্রাঙ্গণ ঝাড়া হয়, সে জন্যই এই উপহার প্রেরণ।

দ্বিতীয় দূত আসেন ইয়েমেন থেকে আর তৃতীয় দূত বসরা থেকে। দুজনেই সম্রাটের জন্য আরবীয় ঘোড়া উপহার এনেছিলেন।

আরও দুজন রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন ইথিওপিয়া থেকে। প্রথম তিনজন দূতকে বিশেষ কোনো মর্যাদা দেয়া হয়নি। কারণ তারা এমন বেশে এসেছিলেন যে, তাদের রাজার দূর বলেই মনে হয় না। তাদের হাবভাব দেখে যে কেউ মনে করবে যে উপঢৌকন দিয়ে কিছু টাকাপয়সা আদায় করার জন্যই যেন তারা ভারতসম্রাটের কাছে এসেছেন। শুধু তাই নয়, তারা অনেক আরবীয় ঘোড়া এনেছিলেন নিজেরা ব্যবহার করবেন বলে। তার জন্য তাদের কোনো শুল্ক দিতে হয়নি। সেই সব ঘোড়া এবং নানা ধরনের জিনিস যা তারা এনেছিলেন, তা বেচে এখানকার অনেক মূল্যবান জিনিস কিনে বিনা শুল্কে দেশে পাঠিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের ব্যবসা করা, দৌত্যগিরি নয়। সে জন্যই দূতেরা সম্রাটের কাছ থেকে রাষ্ট্রদূতের যোগ্য মর্যাদা পাননি– পাওয়ার যোগ্যতাও তাদের ছিল না।

ইথিওপিয়ার সম্রাটের পাঠানো দূত ঠিক এ ধরনের ছিলেন না। মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার সম্পর্কে জানার জন্য বিশেষ উদ্‌গ্রীব ছিলেন এই সম্রাট। সে জন্যই তিনি দূত হিসেবে যাঁদের পাঠিয়েছিলেন তাঁরা শ্রদ্ধেয় ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। দুজনকে তিনি রাজপ্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এবং দুজনেই খুব উপযুক্ত ব্যক্তি। তাঁদের মধ্যে একজন মুসলমান

ব্যবসায়ী। এঁকে আমি চিনতাম, কারণ মক্কায় এঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। তাঁকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো, কিছু হাব্‌সী ক্রীতদাস বিক্রি করে সেই টাকায় এ দেশের মূল্যবান জিনিস কেনার ব্যবস্থা করা। তখন হাব্‌সী ক্রীতদাসদের এভাবে পণ্যের মতো বিক্রি করা হতো। এ জন্য বাজার ছিল। ইথিওপিয়ার মহান খ্রিস্টান সম্রাটের এই দাস ব্যবসাই ছিল অন্যতম ব্যবসা!

ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় দূত হলেন একজন আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান ব্যবসায়ী। তাঁর জন্ম আলেপ্পোতে এবং হাব্‌সীদের দেশে 'মুরাদ' বলে পরিচিত। এঁর সঙ্গেও আমার মক্কাতেই পরিচয় হয়েছিল। মক্কাতে আমরা দুজন একটি ঘরে কিছুদিন একসঙ্গে বাস করেছি। মুরাদই আমাকে হাব্‌সী দেশে যেতে নিষেধ করেছিলেন। প্রত্যেক বছর মুরাদের প্রধান কাজ ছিল ইংরেজ ও ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের কাছে মনোরম উপহার নিয়ে যাওয়া এবং তার বিনিময়ে কিছু ভালো জিনিস প্রত্যুপহার আনা। ক্রীতদাস বিক্রি করার জন্যও তিনি প্রতি বছর মক্কাতে আসেন।*

দূতাবাসের খরচ চালাবার জন্য ইথিওপিয়ার সম্রাট টাকা ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে বত্রিশজন ক্রীতদাস দেন। তবে নগদ টাকাকড়ি বিশেষ দেননি। মক্কার বাজারে ক্রীতদাসদের বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে হবে। বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে তাতে দূতাবাসের খরচ স্বচ্ছন্দে কুলিয়ে যাবে। এক-আধজন নয়, বত্রিশজন ক্রীতদাস। তাও আবার বুড়ো-হাবড়া নয়, নওজোয়ান যুবক-যুবতী।

মক্কায় তখন ক্রীতদাসদের বাজারদরও ভালো, প্রায় পাঁচ-ছয় পাউন্ড করে এক-একজনের দাম। এ ছাড়াও সম্রাট বাছা-বাছা আরও পঁচিশ জন ক্রীতদাস মোগল বাদশাহকে উপঢৌকন পাঠান। সবাই বয়সে তরুণ, খোজা করবার মতো। খ্রিস্টান সম্রাটের উপযুক্ত উপঢৌকন বটে! কিন্তু ইথিওপিয়ার এই খ্রিস্টানদের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

রাষ্ট্রদূতরা আরও উপহার সঙ্গে নেন। পনেরোটি তেজী ঘোড়া, ছোট ছোট একজাতীয় খচ্চর– সুন্দর ডোরাকাটা, বাঘের চেয়ে সুন্দর, এমন কি জেব্রার চেয়েও। একজোড়া হাতির দাঁত– প্রত্যেকটি দাঁড় এতো বড় যে, একজন জোয়ান লোক মাটি থেকে তুলতে পারবে না। তা ছাড়া, একজোড়া ষাঁড়ের শিং, এতো বড় যে দিল্লীতে পৌঁছানোর পর আমি তার মুখের হাঁ মেপে দেখেছিলাম, প্রায় এক ফুট।

ইথিওপিয়ার রাজধানী থেকে এসব দাস-দাসী, ঘোড়া, খচ্চর, দাঁত, শিং নিয়ে রাষ্ট্রদূতরা রওনা হন। লোকালয়হীন নির্জন মাঠঘাটের ওপর দিয়ে তাঁরা

---

* দাস-ব্যবসা (Slave-trade) তখন কিরকম ব্যাপকভাবে চলতো, বার্নিয়ারের এই কাহিনী থেকে তা অনুমান করা যায়। – অনুবাদক।

চলতে থাকেন। এক-আধ দিনের পথ নয়– প্রায় ছ'মাসের পথ। দু মাস এভাবে পথ চলে তাঁরা একটা বন্দরে পৌঁছেন, ব্যাবেলম্যান্ডেলের কাছে, মক্কার বিপরীত তীরে। ক্যারাভানের রাস্তা দিয়ে তাঁরা যাননি, তাহলে চল্লিশ দিনে পৌঁছানো যেতো। বিশেষ কারণে অন্য হাঁটাপথে গিয়েছিলেন।

বন্দরে পৌঁছে দূতেরা সমুদ্র পার হয়ে মক্কা যাবার জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন। কবে জাহাজ বন্দরে ভিড়বে আর কবে তাঁরা সাগরপারে মক্কায় পৌঁছবেন তার ঠিক নেই। বন্দরে বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। খাদ্যদ্রব্যের ভীষণ অভাবের জন্য কয়েকজন ক্রীতদাস অনাহারে মারা যায়, তাদের আর মক্কা পৌঁছানো হয় না।

যা হোক, এক সময় জাহাজও বন্দরে ভিড়ে এবং তাঁরা মক্কায় পৌঁছান। মক্কায় পৌঁছে তারা দেখতে পান আমদানির প্রাচুর্যের কারণে ক্রীতদাসের বাজার পড়ে গেছে। তাই স্বল্প দামেই দাস-দাসীদের বিক্রি করতে হয়। উপায় নেই, টাকার দরকার।

দাস-দাসী বিক্রির নগদ মূল্য হাতে পেয়েই রাষ্ট্রদূতরা সমুদ্রপথে সুরাট যাত্রা করেন এবং পঁচিশ দিন পর ভারতের সুরাটে এসে পৌঁছান। বাদশাহকে উপহার দেয়ার জন্য যে সব দাস-দাসী ও ঘোড়া ছিল, তার মধ্যে কিছু ঠিক মতো খেতে না পেয়ে মরে যায়। খচ্চরগুলোও সব বাঁচে না, তবে সম্রাটের জন্য তাদের সুন্দর চামড়া ছাড়িয়ে রাখা হয়। মৃত ক্রীতদাস বা ঘোড়ার চামড়া আর ছাড়ানো হয়নি। সমুদ্রেরই তাদের ফেলে দেয়া হয়।

সুরাটে যখন রাষ্ট্রদূতরা পৌঁছেন তখন বিদ্রোহী মারাঠা বীর শিবাজী লুটপাট চালিয়ে চারদিকে ত্রাসের সঞ্চার করেছেন। আগুন জ্বালিয়ে ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছেন। নবাগত দূতদের দূতাবাসও আগুনে পুড়ে যায়। কয়েকটি চিঠিপত্র ছাড়া বিশেষ কিছু বাঁচানো সম্ভব হয় না। ক্রীতদাসদের শিবাজী রেহাই দেন, কারণ তারা তখন অনাহারে ও রোগে ধুঁকছে। তাদের হাস্‌বী পোশাক-পরিচ্ছদও তিনি লুট করেননি। খচ্চরের চামড়া বা ষাঁড়ের শিংও নেননি। কারণ তার মধ্যে কোনোটাই তেমন লোভনীয় বস্তু ছিল না।

রাষ্ট্রদূতরা যখন রাজধানীতে পৌঁছেন তখন তাঁদের দুঃখ-দুর্দশার কথা খুব ফলাও করে বলে বেড়ান। তাঁদের ভাগ্য ভালো যে তাঁরা অনেক জিনিসপত্রসহ শিবাজীর হাত থেকে ছাড়া পেয়ে রাজধানী পৌঁছেছেন। শিবাজী সুরাট লুণ্ঠন করেন ১৬৬৪ সালের জানুয়ারি মাসে।

রাষ্ট্রদূতদের মধ্যে একজন ছিলেন আর্মেনিয়ান বণিক মুরাদ, আমার পুরনো বন্ধু। সুরাটের ডাচ কুঠির প্রধান কর্তা মঁসিয়ে আড্রিকান মুরাদকে একটি চিঠি দিয়েছিলেন আমাকে দেয়ার জন্য। দিল্লী পৌঁছে সেই চিঠিটি নিয়ে মুরাদ আমার কাছে আসেন। পাঁচ-ছয় বছর পর অপ্রত্যাশিত ভাবে মুরাদের সঙ্গে

দেখা হওয়ায় আমি খুশি হয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করি আর বলি, আমার যতোটুকু সাধ্য আমি তাঁদের জন্য করবো। শুনে তিনি খুশি হন, কিন্তু আমার ভাবনা বেড়ে যায়। রাজদরবারের ওমরাহদের অনেকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও সম্রাটের সামনে এই রাষ্ট্রদূত উপস্থিত করার ব্যাপারে আমি বেশ দ্বিধায় পড়ে যাই। তাঁদের শোচনীয় দুরবস্থাই বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় শূন্যহাতে তাঁরা রাজধানীতে এসেছেন। উপহারের মধ্যে এখন শুধু খচ্চরের চামড়া আর ষাঁড়ের শিং ছাড়া তাঁদের কাছে কিছু নেই। তা নিয়ে সম্রাটের সামনে কেমন করে হাজির হবেন, ভেবেই পাই না। তার ওপর তাঁদের চেহারা ও পোশাক প্রায় পথের ভিখারির মতো হয়েছে। পথেঘাটে তাঁরা বেদুইনের মতো ঘুরে বেড়াতেন। পালকি চড়ার সামর্থ্য ছিল না। নড়বড়ে গরুর গাড়িতে বসা অবস্থায় প্রায়ই তাঁদের দিল্লীর পথে দেখা যেতো। পেছনে হেঁটে চলতো অবশিষ্ট সাত-আটজন অর্ধনগ্ন ক্রীতদাস। রাষ্ট্রদূতরা যখন পথে বের হতেন, সে এক মজার দৃশ্য হতো রাজধানীর পথে। একটি ঘোড়াও তাঁদের ছিল না। এক পাদরি সাহেবের একটি ঘোড়ায় তাঁরা চড়ে বেড়াতেন। আমার ঘোড়াটিও প্রায়ই চেয়ে নিয়ে যেতেন এবং সেটিকে প্রায় আধমরা করে ফেলেছিলেন। কি করবো, কিছু বলার উপায় নেই।

আমি মহা মুশকিলে পড়ি। তাঁদের নিয়ে যে কি করবো, ভেবে পাই না। লোকজনের ধারণা তাঁরা ভিখারি, কারো কোনো কৌতূহল নেই তাঁদের সম্বন্ধে, শ্রদ্ধা তো নেই-ই। এ অবস্থায় কি করে তাঁদের রাজদরবারে নিয়ে যাবো?

একদিন নির্জনে বসে দানেশমন্দ খানের সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে আলাপ করি। দূতদের কথা ছেড়ে দিয়ে, ইথিওপিয়ার সম্রাটের ধনসম্পদ আর ঐশ্বর্য সম্পর্কে তাঁকে অনেক কথা বলি। কিছুটা অতিরঞ্জিত করেই বলি, তাতেও যদি এঁদের প্রতি আগ্রহ হয়। অবশেষে আমার পন্থাই ঠিক বলে প্রমাণিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁদের দর্শন দিতে সম্মত হন।

রাজদরবারে উপস্থিত হলে তাঁদের শিরোপা, কোমরবন্ধ ও পাগড়ি উপহার দেয়া হয়। প্রত্যেকটির কারুকার্য অপূর্ব সুন্দর। সম্রাট তাঁদের অতিথির মতো দেখাশুনা করার আদেশ দেন আর সে সঙ্গে দেন নগদ ছয় হাজার টাকা। টাকাগুলো কিন্তু দুই রাষ্ট্রদূত সমান ভাবে ভাগ করে নেননি। মুসলমান যিনি, তিনি নেন চার হাজার টাকা আর আর্মেনিয়ান খ্রিস্টান ভদ্রলোক নেন দু'হাজার টাকা।

রাষ্ট্রদূতের কাছে ইথিওপিয়ার সম্রাটের জন্যও আওরঙ্গজেব উপহার দেন, মূল্যবান শিরোপা, দুটি বড় বড় রুপার শিঙা, দুটি কাড়ানাকাড়া এবং ত্রিশ হাজার সোনা ও রুপার মুদ্রা।

মুদ্রাই বিশেষ মূল্যবান উপহার বলে ইথিওপিয়ার সম্রাটের কাছে গণ্য হবে। তার কারণ, তখনও ইথিওপিয়ায় কোনো টাকাশাল ছিল না। কিন্তু

মুদ্রাগুলো শেষপর্যন্ত ইথিওপিয়ায় পৌছবে কি না, তা নিয়ে সম্রাটের মনে সন্দেহ হয়। সম্রাট ভাবেন, রাষ্ট্রদূতেরা হয়তো জিনিসপত্র কিনে এখানেই মুদ্রাগুলো খরচ করে ফেলবেন।

সম্রাটের সন্দেহই সত্য বলে প্রমাণিত হয়। সেই নগদ মুদ্রা দিয়ে রাষ্ট্রদূতরা নানা রকম জিনিসপত্র কিনে বাক্স বোঝাই করেন। মশলাপাতি, ভালো ভালো কাপড়, রাজারানী ও তাঁদের একমাত্র বৈধ সন্তানের কোট-পাতলুনের জন্য দামী রেশমী রঙিন কাপড়, কোর্তা বানাবার মতো বিলেতি লাল-সবুজ কাপড় এবং হারেমের বাঁদী ও তাদের ছেলেমেয়েদের জন্য কাপড় কিনেন তাঁরা। সমস্ত পণ্যদ্রব্যই তাঁরা অন্য রাষ্ট্রদূতদের মতো বিনা শুল্কে ইথিওপিয়ায় রপ্তানি করার অনুমতি পান।

মুরাদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও তাঁর জন্য এতো পরিশ্রম করাকে এখন আমি পণ্ডশ্রম মনে করি এবং অনুতপ্ত হই। তার প্রথম কারণ হলো, মুরাদ কথা দিয়েছিলেন তাঁর ছেলেটিকে আমার কাছে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রি করবেন। কিন্তু পরে তিনি সে কথা রাখেননি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি পঞ্চাশ টাকার জায়গায় ছেলেটির জন্য তিনশো টাকা চেয়ে বসেন। একবার আমার মনে হয় যে তিনশো টাকাতেই ছেলেটিকে কিনে নেবো আর অন্যদের দেখাবো যে পিতা তার নিজের সন্তানকে এই দামে বিক্রি করেছেন।

ছেলেটি বেশ হৃষ্টপুষ্ট, রং কুচকুচে কালো, নাক চ্যাপ্টা, ঠোঁট পুরু– অর্থাৎ যেমন ইথিওপিয়ানদের চেহারা হয় ঠিক তেমন। মুরাদ আমার পরিচিত বন্ধু হয়েও কথার খেলাপ করাতে ক্ষুব্ধ হই।

এ ছাড়া আমি শুনতে পাই, আমার আর্মেনিয়ান বন্ধু এবং তাঁর মুসলমান সঙ্গী আওরঙ্গজেবকে কথা দিয়েছেন, ইথিওপিয়ার পুরাতন মসজিদটি সংস্কার করার জন্য তাঁরা তাঁদের সম্রাটকে অনুরোধ করবেন। পর্তুগীজরা মসজিদটি ভেঙে দিয়েছিলো এবং তারপর থেকে আর সংস্কার করা হয়নি। সম্রাট আওরঙ্গজেব মসজিদটি সংস্কার করার জন্য ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতের কাছে দু হাজার টাকা দেন। মসজিদটি একজন মুসলমান দরবেশের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মাণ করা হয়েছিলো। তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্যে ইথিওপিয়ায় গিয়েছিলেন। সুতরাং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে মসজিদটির সম্মান অনেক বেশি। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ জন্যই ওটার পুনর্গঠনের জন্য এতো উদ্‌গ্রীব ছিলেন এবং টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন।

তৃতীয় ঘটনা হলো : মুরাদ সম্রাট আওরঙ্গজেবকে পবিত্র কোরআন শরীফ ও অন্যান্য ইসলামী ধর্মগ্রন্থ পাঠাবেন বলে কথা দিয়েছেন।

একজন খ্রিস্টান রাষ্ট্রদূত, খ্রিস্টান সম্রাটের প্রতিনিধি রূপে অন্য দেশে এসে যে এই রকম জঘন্য কাজকর্ম করতে পারেন, তা কল্পনাও করা যায় না।

এই ঘটনাবলী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, খ্রিস্টধর্মের কি চরম অবনতি হয়েছিলো ইথিওপিয়ায়। আমি অবশ্য তা জানতাম এবং মক্কায় থাকার সময় এ সম্পর্কে অনেক খবর পেয়েছি।

ইথিওপিয়ায় ইসলাম ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল এবং রাজা-প্রজা সবাই তার পক্ষপাতী ছিল। খ্রিস্টানদের সংখ্যা বরাবরই খুব নগণ্য ছিল এবং যারা নিজদিগকে খ্রিস্টান বলে পরিচয় দিতো তারা আসলে ভেতরে ভেতরে ছিল ইসলামধর্মী। পর্তুগীজরা গায়ের জোরে খ্রিস্টধর্মকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে সফল হতে পারেনি। ইথিওপিয়া থেকে পর্তুগীজ বিতাড়ন ও পাদ্‌রিদের পলায়ন থেকেই তা বোঝা যায়।

দিল্লী থাকার সময় দানেশমন্দ খান প্রায়ই নানা বিষয়ে আলাপ করার জন্য রাষ্ট্রদূতদের তাঁর বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁদের দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে অনেক কথা তিনি জিজ্ঞেস করতেন। তা ছাড়া নীলনদের উৎস সম্পর্কে জানার কৌতূহলই ছিল দানেশমন্দ খানের সবচেয়ে বেশি। মুরাদ এবং তাঁর এক মোগল সঙ্গী নীলনদের উৎস পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। রাষ্ট্রদূত দুজন এমন অতিরঞ্জিত করে তাঁদের সম্রাট ও সৈন্যবাহিনী সম্বন্ধে বড় বড় কথা বলেন যে, খান সাহেবের তা বিশ্বাস হয় না। তাঁদের মোগল সঙ্গীটিও আসল সত্যটি ফাঁস করে দেন। রাষ্ট্রদূতরা বিদায় নেয়ার পর তিনি খান সাহেবকে বলেন যে, রাষ্ট্রদূতদের কথা অধিকাংশই মিথ্যা। তিনি নিজের চোখে যা দেখেছেন তাতে মনে হয় ইথিওপিয়ার শাসন ব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী খুবই নিম্নমানের।

মোগল সঙ্গীটি ইথিওপিয়ার ভেতরের খবর যা বলেন তা বিশেষ মূল্যবান। আমি আমার রোজনামচায় তা লিখে রেখেছি। আপাতত মুরাদ নিজের মুখে যা বলেছেন তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আমি পাঠকদের কাছে নিবেদন করছি।

হাবসী দেশের কথা

মুরাদ বলেন : ইথিওপিয়ায় এমন কোনো পুরুষ নেই যার একাধিক স্ত্রী নেই। বহু বিয়ে প্রথার প্রাধান্য তাঁদের সমাজে এখনও অক্ষুণ্ন রয়েছে। মুরাদের নিজের দুজন স্ত্রী আছে। এ দুজন তাঁর বিবাহিত স্ত্রী ছাড়াও অতিরিক্ত। তাঁর বিবাহিত স্ত্রী আলেপ্পোতে থাকেন।

ইথিওপিয়ার নারীরা ভারতীয় নারীদের মতো পর্দানশিন নয়। সকলের সামনেই তারা স্বাধীনভাবে চলাফেলা করে। সাধারণ স্ত্রীলোক– তা সে বিবাহিতই হোক বা কুমারী, ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন নাগরিক– পুরুষদের সঙ্গে তারা যততত্র মেলামেশা করে। কোনো ঈর্ষা, বিদ্বেষ বা হিংসা বলে কিছু

নেই তাদের সমাজে। একজনের স্ত্রী বা বাগ্‌দত্তা অন্যের সঙ্গে স্বচ্ছন্দে বিহার করতে পারে। এতে কোনো বাধা নেই, খুনোখুনি নেই। অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারটা ইথিওপিয়ার সমাজে পানির মতো তরল। স্ত্রীলোক হলেই জলস্রোতের মতো নিচের দিকে গড়িয়ে যাবে– এটা যেন স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। পুরুষদেরও স্বেচ্ছাচারী হওয়া স্বাভাবিক। কোনো অভিজাত পরিবারের বিবাহিতা স্ত্রী কোনো বীরপুরুষের প্রেমে পড়ে স্বচ্ছন্দে তার সঙ্গে লীলাখেলা করতে পারে, তাতে পৌরুষ বা আভিজাত্য, কোনোটাতেই বাধে না– এই হলো ইথিওপিয়ার সমাজ।

আমি যদি ইথিওপিয়ায় যেতাম তাহলে নাকি বিয়ে করতে বাধ্য হতাম। কয়েক বছর আগে একজন পাদ্‌রি সাহেবকে এভাবে জোর করে একটি ইথিওপিয়ান মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয়। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যে মেয়েটির সঙ্গে পাদরির বিয়ে দেয়া হয়, তাকে তিনি পুত্রবধূ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

এবার ইথিওপিওয়ার বিয়ে ও সন্তানাদি সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী বলছি :

একবার কোনো এক আশি বছর বয়স্ক বৃদ্ধ সম্রাটের কাছে তার চব্বিশটি জোয়ান ছেলে নিয়ে উপস্থিত হয়। সম্ভবত তার উদ্দেশ্য ছিল ছেলেদের সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা। সম্রাট ছেলেদের দেখে জিজ্ঞেস করেন, বৃদ্ধের এই কয়টি পুত্র ছাড়া আর কোনো পুত্র আছে কি না। বৃদ্ধ বলে, তার আর পুত্র নেই, মাত্র এই চব্বিশটিই পুত্র। তবে কয়েকটি কন্যাসন্তান আছে।

সম্রাট রেগে গিয়ে বলেন, 'দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে– বুড়ো হবড়া ষাঁড়ের বাচ্চা কোথাকার! মাত্র চব্বিশটি পুত্রের পিতা হয়ে তুমি আমার সামনে এসে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহস করেছো দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। দূর হও, বেরিয়ে যাও আমার সামনে থেকে। আমার রাজত্বে কি মেয়েদের অভাব পড়েছে বলতে চাও, গাধা কোথাকার? তোমার মতো একজন আশি বছরের বৃদ্ধ মাত্র দুই ডজন পুত্রের পিতৃত্বের বড়াই করছো কোন সাহসে? তোমার লজ্জা করে না?'

ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখুন! অর্থাৎ আশি বছরের বৃদ্ধের কম করেও গোটা ষাটেক ছেলেমেয়ে থাকলে হয়তো সম্রাট খুশি হতেন, কিংবা তারও বেশি। সম্রাটের ক্রুদ্ধ হবারই কথা। কারণ তাঁর নিজের আশিটি ছেলেমেয়ে। হারেম ও বেগম মহলে তাদের ভেড়ার পালের মতো ছোটাছুটি করে বেড়াতে দেখা যায়। কে কার গর্ভজাত, তা বলার উপায় নেই। তবে সবাই সম্রাটের ঔরসজাত। তবু রাজবাড়ির মধ্যে অন্যান্য দাস-দাসী ও বাঁদির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে যাতে একাকার হয়ে তারা মিশে না যায় এবং দেখলে রাজকুমার কি রাজকুমারী বলে চেনা যায়, তার জন্য সম্রাট নিজে প্রত্যেককে একটি করে রাজদণ্ডের মতো কাঠের টুকরো তৈরি করে দিয়েছেন হাতে নিয়ে বেড়াবার

জন্য। সেই কাঠের টুকরো হাতে করে রাজার ছেলেমেয়েদের হেরেমে ঘুরে বেড়াতে হয়। সব সময়, তা না হলে সমস্যা বাধার সম্ভাবনা থাকে।

এরকম যাঁর পিতৃত্বের বহর এবং যিনি সর্বশক্তিমান সম্রাট, তিনি গরিব বৃদ্ধের মাত্র দুই-তিন ডজন সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় পেয়ে যে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবেন, তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে?

সম্রাট আওরঙ্গজেব ইথিওপিয়ার রাজদূতদের বার দুই ডেকে পাঠিয়েছিলেন। খান সাহেবের মতো তিনিও ভেবেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে ইথিওপিয়া সম্পর্কে কিছু জেনে নেবেন। তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল ইথিওপিয়ায় ইসলাম ধর্মের অবস্থা কি পর্যায়ে রয়েছে তা জানা। সম্রাট খচ্চরের চামড়াগুলো দেখার জন্যও আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। এই চামড়াগুলো আমাকে উপহার দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে কথা তাঁরা রাখেননি। যা হোক, আমি তাঁদেরকে সম্রাটকে খচ্চরের চামড়া ও ষাঁড়ের শিং দেখাবার জন্য পরামর্শ দেই।

সুলতান আকবরের শিক্ষাব্যবস্থা

ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূতরা যখন দিল্লীতে অবস্থান করেছিলেন তখনই সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর তৃতীয় পুত্র সুলতান আকবরের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য মৌলবীদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। সুলতান আকবরের শিক্ষার জন্য সম্রাট বিশেষ অধীর হয়ে পড়েছিলেন। কারণ তাঁকেই তিনি হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ সম্রাট করবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবেই শাহজাদারা যখন সম্রাট হন তখন রাজ্যশাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। যে সম্রাট হবে তাকে অবশ্যই সম্রাটের মতো শিক্ষা পেতে হবে। এটা খুবই দরকার। তবেই তিনি সম্রাট বা রাজা হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। তার বিদ্যা, তার জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি, ন্যায়-অন্যায়বোধ, কূটবুদ্ধি, দূরদর্শিতা ঠিক সম্রাটের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া চাই। তা না হলে রাজমুকুট মাথায় পরার এবং রাজসিংহাসনে বসার কোনো অধিকার তার নেই।

সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রায়ই বলতেন, এশিয়ার সাম্রাজ্যের এতো দুর্গতি ও অবনতির অন্যতম কারণ হলো, এখানকার শাহজাদাদের অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। বাল্যকাল থেকে তাদের পরিচারিকা ও খোজাদের হেফাজতে রাখা হয়। রাশিয়া, জর্জিয়া, আফ্রিকা, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের এই সব ক্রীতদাস-দাসীদের কুসংসর্গে থেকে এশিয়ার শাহজাদারা আশৈশব মানুষ হয়। তার ফলে তাদের কোনো সুশিক্ষা হয় না, কোনো শিষ্টতা, ভদ্রতা বা সদাচার তারা শেখে না। বরং তারা জ্যেষ্ঠ, প্রবীণ ও শ্রদ্ধেয়দের প্রতি ঔদ্ধত আচরণ করতে এবং আশ্রিতদের প্রতি অত্যাচার-পীড়ন করতে শেখে।

সম্রাট আকবর

এ শিক্ষা পেয়ে এই রকম দুর্বিনীত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে যখন তারা বড় হয়, রাজসিংহাসনে সম্রাট হয়ে বসে, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করা ছাড়া আর কি তারা করতে পারে? রাজকর্তব্য সম্বন্ধে কোনো জ্ঞানই তাদের থাকে না। আর কি করে থাকবে? বাঁদি বা খোজারা কি সেই শিক্ষা দিতে পারে? রাজদরবারে যখন তারা হাজির হয় তখন তাদের দেখলে মনে হয় যেনো এক ভিন্ন জগতের জীব। বাইরের জগৎ সম্বন্ধে একেবারে অনভিজ্ঞ। হবেই তো। হেরেমের বাঁদি, দাসদাসী আর খোজাদের সান্নিধ্য ছেড়ে হঠাৎ রাজদরবারে আমলা-অমাত্য, আমির-ওম্‌রাহদের মধ্যে এসে সিংহাসনে উপবেশন করলে, এ ছাড়া আর কি মনে হবে? অন্ধকার এক নরক থেকে যেনো হঠাৎ এক আলোর রাজ্যে এসে উপস্থিত হয় শাহজাদারা। চারদিকে দেখেশুনে ঠিক অবোধ বালকের মতো ব্যবহার করতে থাকে। ঠিক বালকের মতো যা শোনে তাই বিশ্বাস করে, যা দেখে তাতেই ঘাবড়ে যায়। বিদ্যা-বুদ্ধি, বিবেচনাশক্তি কিছুই সম্বল থাকে না, থাকে শুধু অর্থহীন গোঁ আর রাজকীয় দম্ভ। সুতরাং সৎবুদ্ধি ও সুপরামর্শ তাদের কর্ণগোচর হয় না এবং একবার স্থূল মস্তিষ্কে যা বিঁধে যায় তা নিয়ে চরম দৌরাত্ম্য করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না।

সিংহাসনে বসার পর শাহজাদা যখন উপলব্ধি করতে পারে সে একজন সম্রাট, তখন যে একটা গাম্ভীর্যের ছদ্মবেশ ধারণ করার চেষ্টা করে, তা সত্য।

দেখলে মনে হয় সে যেনো কতো গম্ভীর, কতো দূরদর্শী, কতো চিন্তাশীল, প্রকৃত সম্রাট হবার উপযুক্ত। কিন্তু গাম্ভীর্যের মুখোশটা বুদ্ধিমানের চোখে খসে পড়ে, ভেতরের আসল স্থূলবুদ্ধির স্বরূপটা বেরিয়ে পড়ে। এই হলো এশিয়ার সম্রাটদের অবস্থা। যারা এশিয়ার রাজা-রাজাড়াদের ইতিহাস জানেন, তাদের স্বচক্ষে যারা দেখেছেন, তারা এ কথা যে বর্ণে বর্ণে সত্য, তা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।

এশিয়ার সম্রাটদের পশুর চেয়েও নির্মম ও নিষ্ঠুর আচরণ করতে দেখা গেছে। কোনো বিচার নেই, বিবেচনা নেই, নিছক নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তারা পাশবিক উত্তেজনা ও আনন্দ বোধ করেছেন। মদ্যপানে, উচ্ছৃঙ্খলতায় ও বিলাসিতায় তাঁরা ভেসে গেছেন। নারী-সংসর্গে তারা নিজেদের স্বাস্থ্য, বুদ্ধি, সমাজচেতনা সব জলাঞ্জলি দিয়েছেন। শিকারের আনন্দে প্রাত্যহিক রাজকার্যে অবহেলা করেছেন। শিকারের সময় শিকারি কুকুরের পালের দিকে তাঁদের যতোটা নজর থাকে, তার শতাংশের একাংশও শিকার-সহযাত্রী গরিব প্রজাদের দিকে থাকে না। তারা হয়তো অনাহারে, অনাশ্রয়ে, তীব্র শীতে ও দুর্যোগে পথের মধ্যেই মরে যায়। রাজা তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। তিনি তার ঘোড়া, হাতি আর কুকুরের পাল নিয়েই শিকারে মত্ত থাকেন।

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ সম্রাট এশিয়ার মাটিতে খুব কমই জন্মেছেন। নিজেরা বুদ্ধিহীন অশিক্ষিত বলে, সাধারণত রাজ্যশাসনের ভার তারা উজীর বা খোজাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। তারা শুধু ষড়যন্ত্র আর বেইমানি করেছেন, এ ওর গলা কেটেছেন, খুন করেছেন। এ অবস্থায় রাজার রাজ্যে শৃঙ্খলা বা শান্তি বজায় থাকে কেমন করে?

সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর পুত্রের শিক্ষা প্রসঙ্গে এ ধরনের মতামত প্রায়ই ব্যক্ত করতেন এবং তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সত্যিকার অর্থেই সচেতন ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর তৃতীয় পুত্র ভবিষ্যৎ সম্রাট হবেন বলে তাঁর শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন।*

---

* ইতিহাসের পাঠ্যবইতে সাধারণত সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্র যেভাবে চিত্রিত করা হয়ে থাকে, তার সঙ্গে বার্নিয়ার অঙ্কিত চরিত্র-চিত্রণের কোনো মিল দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন সময় রাজকার্যের মধ্যে দিয়ে আওরঙ্গজেব-চরিত্রের যে চিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তার সঙ্গেও যেনো কোনো সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়।

রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অনেক সময় সম্রাটকে বাধ্য হয়েই অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে হয়, যা দিয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত চরিত্র বিচার করা উচিত নয়। মধ্যযুগের সম্রাটদের ক্ষেত্রে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। নিজে সম্রাট হয়েও সম্রাটদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহার সম্পর্কে আওরঙ্গজেব যেভাবে সমালোচনা করেছেন, সত্যই তার তুলনা হয় না। সম্রাটের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর কঠোর মন্তব্যও সাধারণত দুর্লভ। এ থেকে বোঝা যায়, বাইরের সম্রাট

ইরানের দূত

অবশেষে সংবাদ আসে ইরানের রাষ্ট্রদূত ভারতের সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। মোগল দরবারে থাকা ইরানী ওমরাহরা এ সংবাদ শোনামাত্রই রটিয়ে দেন যে, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্য ইরানের রাষ্ট্রদূত ভারতে এসেছেন। বুদ্ধিমান লোকেরা অবশ্য তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেনি। কারণ ইরানীদের এমন একটা হামবড়াই ভাব আছে যে, নিজেদের জাতের কোনো ব্যাপার নিয়ে তিলকে তাল করতে তারা খুবই পারদর্শী।

প্রচার করা হয় যে, ইরানের রাষ্ট্রদূতকে রাজদরবারে নিয়ে আসার আগে যেন তাকে ভারতীয় রীতিতে সালাম করতে শিক্ষা দেয়া হয়। তা না হলে তাকে দিয়ে হঠাৎ সালাম করানো যাবে না। ইরানীরা এমনিতে খুব ঔদ্ধত-স্বভাব, তার ওপর তিনি রাজপ্রতিনিধি। সুতরাং হঠাৎ ঘাড় হেঁট করে সালাম করতে হয়তো তিনি রাজি নাও হতে পারেন। তবে এসব কথা গালগল্প ছাড়া আর কিছু নয়। আওরঙ্গজেবের মতো সম্রাটের এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর অবসর ছিল না।

ইরানের রাষ্ট্রদূত যখন রাজধানীতে প্রবেশ করেন তখন তাঁকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা জানানো হয়। বাজারের ভেতর দিয়ে তাঁর যাবার পথ সুসজ্জিত করা হয় এবং কয়েক মাইল জুড়ে পথের দুই পাশে অশ্বারোহী সৈন্যরা সারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওম্‌রাহরা অনেকে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে শোভাযাত্রায় যোগ দেন। দুর্গদ্বারে রাষ্ট্রদূত যখন পৌঁছেন তখন তোপধ্বনি করে তাকে অভিনন্দন জানানো হয়। আওরঙ্গজেব তাকে সাদর সম্ভাষণ জানান। ইরানী রীতিতে সালাম জানানো সত্ত্বেও তিনি বিরক্ত হন না এবং সোজাসুজি রাষ্ট্রদূতের হাত থেকেই তার পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন।

একজন খোজা চিঠিটি খুলে দেয়ার পর আওরঙ্গজেব মনোযোগ দিয়ে পড়েন। রাজপ্রতিনিধিকে যথারীতি কোর্তা, পাগড়ি, সোনা-রূপার কাজ করা শিরোপা উপঢৌকন দিতে আদেশ দেয়া হয়। তারপর যথাসময়ে ইরানের দূতকে তাঁর উপহারাদি দেখাতে অনুমতি দেয়া হয়।

ইরানের রাষ্ট্রদূত যে উপহার দেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল পঁচিশটি সুন্দর ঘোড়া, বিশটি উট– যেগুলো দেখতে ছোট হাতির মতো, চমৎকার গোলাপ পানি, পাঁচ-ছয়টি গালিচা ইত্যাদি।

আওরঙ্গজেব উপহার দেখে খুশি হন। প্রত্যেকটি জিনিস তিনি নিজে যত্ন করে দেখেন এবং ইরানের শাহানশাহের উদারতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাজদূতকে তিনি ওম্‌রাহদের পাশে বসার অনুমতি দেন এবং তার ক্লান্তির কথা

আওরঙ্গজেব ও ভেতরের মানুষ আওরঙ্গজেবের মধ্যে বরাবরই একটা পার্থক্য ছিল, যা তাঁর অন্ত রঙ্গ দু'চারজন ছাড়া আর কারো চোখে পড়েনি।– অনুবাদক।

বারবার উল্লেখ করে, প্রতিদিন তার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করে তাকে বিদায় দেন।

আওরঙ্গজেবের খরচে রাষ্ট্রদূত প্রায় চার-পাঁচ মাস দিল্লীতে অবস্থান করেন। এ সময় তিনি মহা আনন্দে ওম্‌রহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করে চলেন। যখন তাকে ফিরে যাবার অনুমতি দেয়া হয় তখন সম্রাট আওরঙ্গজেব আবার তাকে ডেকে নানা রকমের উপহার দেন।

ইরানের রাষ্ট্রদূতকে আওরঙ্গজেব যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইরানী ওম্‌রাহরা প্রচার বলে বেড়ায় যে, ইরানের শাহানশাহ দূত মারফত যে চিঠি পাঠিয়েছেন তাতে তিনি ভারতসম্রাটকে ভ্রাতৃহত্যা এবং বৃদ্ধ পিতা শাহজাহানকে বন্দী করে রাখার জন্য সমালোচনা করেছেন। ইরানের শাহানশাহ নাকি তাঁর 'আলমগীর' অর্থাৎ 'বিশ্ববিজয়ী' উপাধীর জন্যও উপহাস করেছেন।

ওম্‌রাহরা চিঠির বাক্য পর্যন্ত মুখে মুখে বলে বেড়াতে থাকেন। তাতে নাকি লেখা ছিল :

'আপনি যখন আলমগীর, তখন আল্লাহর নামে আপনাকে এই তলোয়ার ও ঘোড়াগুলো পাঠালাম। সম্মুখ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।'

কিন্তু এসব কথা এতো অতিরঞ্জিত যে, একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কথায় রং চড়ানোর বদ আভ্যাস ইরানীদের আছে এ কথা আগেই বলেছি। খোশমেজাজী গালগল্প করতে তারা পারদর্শী। এ সম্বন্ধে, অর্থাৎ ইরানের সম্রাটের পত্রাদি সম্বন্ধে আমি যা শুনেছি তা বলছি। তিনি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কোনো ভাষা চিঠির মধ্যে প্রকাশ করেননি। ওটা ইরানী ওমরাহদের অপপ্রচার ছাড়া কিছু নয়। আমার ধারণা, ভারতের মতো বিরাট দেশের বিরুদ্ধে ইরানের শাহানশাহ অকারণে যুদ্ধ করতে চাইবেন না। তিনি তাঁর নিজের রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। শাহ আব্বাসের[১৫] মতো সম্রাটও ইরানে সহজলভ্য নয়। তাঁর মতো দূরদর্শিতা, বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি খুব কম

---

১৫. শাহ আব্বাস ১৫৮৮ সালে ইরানের শাহানশাহ হন। ১৫৮৮ সাল থেকে ১৬২৯ সাল পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তিনিই ইস্পাহানে ইরানের রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং ইরানকে বিরাট সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। তাঁর সংগঠনশক্তি, কূটনৈতিক বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার কথা জনপ্রবাদে পরিণত হয়েছে। তাঁর নাম 'শাহ্ আব্বাস' থেকেই নাকি ভারতবর্ষে 'শাবাস' কথাটি লোকসমাজে প্রচলিত হয়েছে। কেউ কোনো প্রশংসনীয় কাজ করলে তাকে 'শাবাস' বলে অভিনন্দন জানানো হয়। ওভিংটন (Ovington) তাঁর 'Voyage to suratt in the year 1689- নামক গ্রন্থে (London 1696) লিখেছেন : 'ইরানের শাহানশাহ্ শাহ্ আব্বাসের নাম তাঁর মহৎ কীর্তি ও খ্যাতির সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, আজও কোনো উল্লেখযোগ্য কীর্তিকে আমরা ঐ নামে সম্বর্ধনা জানিয়ে থাকি। ভারতীয়দের প্রশংসাসূচক কথাই হলো 'শাবাস'। – অনুবাদক।

সম্রাটেরই রয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করাই যদি ইরানের শাহানশাহের উদ্দেশ্য হবে, সম্রাট শাহজাহান বা ইসলাম ধর্মের প্রতি যদি তাঁর এতোই দরদ থাকবে, তাহলে যখন দীর্ঘকালব্যাপী মোগল সাম্রাজ্যে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও গৃহযুদ্ধ চলছিলো, তখন তিনি দর্শকের মতো দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখছিলেন কেনো? ভারত জয় করাই যদি তাঁর উদ্দেশ্য হবে, তাহলে তখন তো স্বচ্ছন্দেই তিনি তা করতে পারতেন। শাহজাহান, দারা, সুলতান সুজা কারো কাকুতি-মিনতিতে তিনি কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি, এমন কি কাবুলের শাসনকর্তার কথাতেও নয়। তা যদি করতেন তাহলে সামান্য সেনাবাহিনী নিয়ে, অল্প খরচে তিনি অতি সহজে বিনা বাধায় ভারতের অধীশ্বর হতে পারতেন, অন্তত কাবুল থেকে সিন্ধুনদের তীরে পর্যন্ত বিরাট অঞ্চলের তো নিশ্চয়ই। তখন তাঁর আদেশেই ভারতবর্ষের শাসকরা উঠতেন-বসতেন এবং আত্মকলহ বা দ্বন্দ্ব, সবই তিনি মিটিয়ে দিতে পারতেন।

ইরানশাহের পত্রের মধ্যে হয়তো কোনো আপত্তিকর ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছিলো, রাষ্ট্রদূতের কথাবার্তায় আওরঙ্গজেব হয়তো খুশি হননি। কারণ রাষ্ট্রদূত দিল্লী ছেড়ে যাবার দু-তিন দিন পর তিনি অভিযোগ করেন ইরানের শাহানশাহকে তিনি যে ঘোড়াগুলো উপহার দিয়েছিলেন, সেগুলো রাষ্ট্রদূতের আদেশে নাকি ফাঁসী দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ হুকুম দেন, যে কোনো উপায়ে ভারত-সীমান্তে রাষ্ট্রদূতকে বন্দী করে তার কাছ থেকে ভারতীয় ক্রীতদাস কেড়ে নিয়ে আসতে। ভারতের ক্রীদাসের বাজার খুব সস্তা ছিল বলে ইরানী দূত একদল ক্রীতদাস কিনে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ভারতে প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের জন্য তখন বাজারে প্রচুর ক্রীতদাস পাওয়া যেতো এবং দামও সস্তা ছিল।

শুধু ইরানী রাষ্ট্রদূত যে ক্রীতদাস নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন তা নয়, তাঁর অনুচরবর্গও নাকি অনেক শিশুসন্তান কিনে নিয়ে পালাচ্ছিলেন।

ইরানের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সম্রাট আওরঙ্গজেব অত্যন্ত ভদ্র ও শিষ্ট আচরণ করেছিলেন। শাহ আব্বাসের রাজত্বকালে তাঁর প্রতিনিধির সঙ্গে সম্রাট শাহজাহান যে রকম ঔদ্ধত্য আচরণ করেছিলেন, আওরঙ্গজেব সে রকম করেননি।

সম্রাট শাহজাহানের ঔদ্ধত্য আচরণ সম্পর্কে ইরানীরা প্রায়ই নানা রকমের গল্প বলে থাকেন। তার মধ্যে দু-একটি গল্প আমি এখানে বলছিঃ

সম্রাট শাজহাজান যখন দেখতে পান কিছুতেই ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ভারতীয় কায়দায় সালাম করতে বাধ্য করা যাচ্ছে না, এবং আত্মমর্যাদাবোধ তার এতো প্রখর যে তাকে মাথা নোয়ানো মুশকিল, তখন তিনি এক অভিনব বুদ্ধি উদ্ভাবন করেন। আমখাসের দিকে দরবারে প্রবেশের জন্য যে পথ আছে,

তিনি সেটা বন্ধ করে দিতে হুকুম দেন। শুধু সামান্য একটু ফাঁক থাকবে এক জায়গায় এবং সেই ফাঁকটুকু এমন নিচু হবে যে, তার ভেতর দিয়ে ঢুকতে গেলেই রাষ্ট্রদূতকে বাধ্য হয়ে সালাম করার ভঙ্গিতে মাথা হেঁট করতে হবে। অভ্যর্থনা জানাবার জন্য সম্রাট শাহজাহান সামনেই দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং তাতে গর্বোদ্ধত ইরানী রাষ্ট্রদূতের ভারতীয় পদ্ধতিতে সালাম না করার অহঙ্কারও চূর্ণ হবে।

শাহজাহান ভেবেছিলেন, তিনি তখন রাষ্ট্রদূতকে বলবেন যে, অতোটা মাথা হেঁট করে সালাম করাটাও ভারতীয় রীতি নয়। কিন্তু গর্বিত ও বুদ্ধিমান ইরানী দূত আগে থেকে সম্রাটের অভিসন্ধি বুঝতে পেরে প্রবেশপথের কাছে এসে, সম্রাটের দিকে পেছন ফিরে নিচু হয়ে প্রবেশ করেন। শাহজাহান ইরানী শঠতার কাছে হার মেনে ক্রুদ্ধ হয়ে বলেন : 'হায় আল্লা! আপনি কি মনে করছেন এখানে আপনার মতো গর্দভের আস্তাবল আছে যে ঐভাবে ঢুকলেন?'

ইরানের দূত উত্তর দেন: 'অবশ্য ঠিকই বলেছেন, আমি গর্দভই বটে। আমার চেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইরানের রাজদরবারে আরও আছেন। কিন্তু যিনি যেমন সম্রাট তাঁর কাছে তেমন দূত পাঠানো উচিত বলে আমাকেই তিনি আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।'

আর একবার আহারের নিমন্ত্রণ করে একত্রে খাবার খেতে বসে সম্রাট শাহজাহান ইরানের দূতকে অপমান করেছিলেন। ইরানের দূত খুব বেশি হাড় চিবুচ্ছেন দেখে শাহজাহান বলেন , 'কুকুরগুলোর জন্য কিছু রাখুন।'

ইরানের দূত তার উত্তরে পোলাওয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'ঐ তো রেখেছি।'

সম্রাট শাহজাহান পোলাও খেতে খুব ভালোবাসতেন এবং তখন খাচ্ছিলেনও। সুতরাং রাষ্ট্রদূতের উত্তরে তিনি অপ্রস্তুত হন।

শাহজাহান তখন নতুন রাজধানী দিল্লী তৈরি করছেন। তিনি ইরানের দূতকে জিজ্ঞেস করেন : 'ইস্পাহান ভালো, না দিল্লী?' উত্তরে ইরানের দূত 'বিল্লা বিল্লা' (বি-ইল্লাহি) বলে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন: 'ইস্পাহানকে দিল্লীর ধুলোর সঙ্গে তুলনা করা যায় না।'

শাহজাহান উত্তর শুনে খুব খুশি হন। তিনি ভাবেন রাষ্ট্রদূত বোধ হয় তাঁর রাজধানীর প্রশংসাই করলেন। দিল্লীর ধুলোর সঙ্গেও ইস্পানের তুলনা হয় না, শাহজাহান এই অর্থ বুঝেছিলেন। কিন্তু অর্থ তা নয়। অর্থ হলো, দিল্লীতে এতো ধুলো যে, তার সঙ্গে ইস্পাহান নগরীর তুলনা করতে যাওয়াটাই বোকামী!

শাহজাহান নাকি অন্য একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন– রাষ্ট্রীয় শক্তি হিসেবে মোগল সাম্রাজ্য বড়ো, না ইরান? উত্তরের ইরানের দূত বলেন– মোগল সাম্রাজ্য পূর্ণচন্দ্রের মতো, আর ইরান হলো দ্বিতীয়ার চাঁদ।

কথাটা শুনে প্রথমে সম্রাট শাহজাহান খুব খুশি হন। মোগল সাম্রাজ্য পূর্ণিমার চাঁদের মতো বলতে তিনি তাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র মনে করেন। কিন্তু পরে তাঁর কাছে অর্থ পরিষ্কার হয়। পূর্ণিমার চাঁদের সঙ্গে তুলনা করার অর্থ হলো, রাষ্ট্র হিসাবে মোগল সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধির দিন শেষ হয়েছে, এবারে কৃষ্ণপক্ষে তার ক্রমিক ক্ষয় শুরু হবে। কিন্তু ইরান হলো দ্বিতীয়ার চাঁদ– অর্থাৎ তার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি হবে। ইরানের দূত যা বলতে চেয়েছেন তা হলো: মোগল সাম্রাজ্য বৃদ্ধ– ইরান যুবক।

ইরানীদের চতুরতার এই হলো কয়েকটি নমুনা। কিন্তু চতুর হলেই যে বুদ্ধিমান হতে হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। আমার মতে, যিনি রাজপ্রতিনিধি হবেন তার একটা নিজস্ব চারিত্রিক গাম্ভীর্য থাকা উচিত। হালকা রঙ্গ-তামাসা বা হেঁয়ালির অবতারণা করা তার শোভা পায় না। ইরানের দূত শাহজাহানের মতো প্রতাপশালী সম্রাটকে ওই ভাবে পদে পদে চালাকির জোরে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ করে খুব বুদ্ধির পরিচয় দেননি। শেষপর্যন্ত শাহজাহান এতোটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে, ইরানের দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলেই তিনি কটুবাক্যে তাকে সম্বোধন করতেন। শুধু তাই নয়, তিনি এতো ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, ইরানের দূতকে সরু কোনো অলিগলির মধ্যে পথচলার সময় পাগলা হাতি লেলিয়ে দিয়ে হত্যা করতে বলেছিলেন। একদিন হাতি লেলিয়ে দেয়াও হয়েছিলো। পালকি চড়ে ইরানের দূত রাজধানীর এক সুরু গলির ভেতর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, সে সময় তাকে লক্ষ্য করে পাগলা হাতি ছেড়ে দেয়া হয়। অন্য কোনো স্বল্প তৎপর ব্যক্তি হলে নিশ্চয় মারা যেতেন। ইরানের দূত পালকি থেকে তৎক্ষণাৎ লাফ দিয়ে পড়ে এতো তাড়াতাড়ি হাতির শুঁড় লক্ষ্য করে তীর ছুড়তে থাকেন যে, ভয় পেয়ে হাতি পালিয়ে যায়।

আওরঙ্গজেবের শিক্ষক মোল্লা শাহের কাহিনী

ইরানের দূত বিদায় নেয়ার পর আওরঙ্গজেব তাঁর বাল্যকালের শিক্ষক মোল্লা শাহকে সম্বর্ধনা জানান।[১৬]

এ নিয়ে একটি সুন্দর কাহিনী আছে। কাহিনীটি এখানে লেখার লোভ সামলাতে পারছি না।

এই বৃদ্ধ লোকটিকে শাহজাহান কিছু সম্পত্তি দান করেছিলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে তিনি কাবুলের কাছে কোনো স্থানে অবসর জীবন কাটাচ্ছিলেন। সেখান

---

১৬. মোল্লা শাহ বাদাকশানের বাসিন্দা। তিনি দারা শিকোর দীক্ষাগুরু ছিলেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। আওরঙ্গজেবকেও তিনি শিক্ষা দিয়েছেন।– অনুবাদক।

থেকেই তিনি মোগল সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধের খবর পান। জানতে পারেন তাঁর প্রাক্তন ছাত্র আওরঙ্গজেব হিন্দুস্থানের সম্রাট হয়েছেন।

খবর পেয়ে মোল্লা সাহেব তাড়িতাড়ি দিল্লী চলে আসেন। তার আশা ছিল, হয়তো শিষ্য তাকে ওমরাহের মর্যাদা দিয়ে সম্মানীত করবেন। এ জন্য দরবারের সকলকেই তিনি অনুরোধ করেছিলেন। রওশন আরা বেগম পর্যন্ত তার দাবি সমর্থন করেছিলেন।

তিন মাস দিল্লীতে থাকার পর আওরঙ্গজেব জানতে পারেন যে তাঁর শিক্ষক মোল্লা শাহ কোনো কাজের জন্য তাঁর কাছে এসেছেন এবং তার কিছু বক্তব্য আছে। কিন্তু প্রতিদিন তাকে দরবারে উপস্থিত থাকতে দেখে আওরঙ্গজেব শেষে মোল্লা শাহকে নির্জনে সাক্ষাৎ করার জন্যে বলেন। তিনি জানান, সে সময় হাকিম-উল-মুলক দানেশমন্দ খান এবং আর তিন-চারজন আমির ছাড়া আর কেউ উপস্থিত থাকবেন না।

সাক্ষাৎকালে আওরঙ্গজেব যা বলেছেন তার সঠিক বিবরণ আমি যতোটুকু সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা লিখে জানাচ্ছি। আওরঙ্গজেব বলেন:

> ...তারপর মোল্লাজী! কি মনে করে আপনি এতোদূর এসেছেন? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্য কি? আপনি কি চান আমি আপনাকে ওমরাহের পদমর্যাদা দিয়ে আমার গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করি? সত্যি বলছি, আমি আপনাকে শ্রেষ্ঠ রাজকীয় সম্মানে ভূষিত করতেও কুণ্ঠিত হতাম না, যদি বুঝতাম বাল্যকালে আপনি আমাকে এমন শিক্ষা দিয়েছেন যা আজ আমার জীবনে মূল্যবান সম্পদ হয়ে কাজে লাগছে। হে শিক্ষক! বলতে পারেন, আপনার কাছ থেকে আমি কি শিক্ষা পেয়েছি? আপনি আমাকে শিখিয়েছেন 'ফিরিঙ্গিস্থান' (ইউরোপ?– অনুবাদক) সামান্য একটি দ্বীপ ভিন্ন কিছু নয়। সেই দ্বীপের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা হলেন পর্তুগালের রাজা, তারপর হল্যান্ডের এবং শেষে ইংল্যান্ডের রাজা। ফিরিঙ্গিস্থানের অন্য রাজাদের সম্বন্ধে (যেমন ফ্রান্স) আপনি বলেছেন, তাঁরা আমাদের ভারতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা-বাদশাদের মতো এবং ভারতের শক্তি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে অন্য কোনো দেশের তুলনা হয় না। ভারতের সম্রাটরাও তাঁদের তুলনায় এতো বড় যে, তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান– এঁদের সমতুল্য কোনো সম্রাট ফিরিঙ্গিস্থানে নেই।
>
> হে ভূগোলবিদ! হে ইতিহাসবিশারদ! আপনি কি আমাকে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশ, প্রত্যেক জাতি সম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিয়েছেন? আপনি কি আমাকে তাদের আর্থ-সামর্থ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্মকর্ম, যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে কোনো কথা বলেছেন? আপনি কি আমাকে রাষ্ট্রের উন্নতি ও অবনতি হয় কেন, কেন দেশে দেশে, যুগে যুগে সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিদ্রোহ বা বিপ্লব হয়, তার কারণগুলো জানিয়েছেন? আপনি আমাকে কিছুই বলেননি, কিছুই শিক্ষা দেননি। এসব কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। আপনি তো আমার পূর্বপুরুষ, যাঁরা এই বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তাঁদের নাম পর্যন্ত বলেননি! আমি কিছুই জানতাম না

তাঁদের সম্বন্ধে। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর ভাষাও কিছু-কিছু প্রত্যেক সম্রাটের জানা থাকা কর্তব্য। আপনি আমাকে আরবি লিখতে ও পড়তে শিখিয়েছেন, আর কোনো ভাষা শেখাবার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন একটি ভাষা আপনি আমাকে শিখিয়েছেন, যা সামান্য আয়ত্ত করতেও যে-কোনো বুদ্ধিমান লোকের কম করেও দশ-বারো বছর লেগে যায়। এভাবে শুধু একটা গম্ভীর ভাষা শিখিয়ে আপনি আমার মূল্যবান কৈশোর ও যৌবনকাল নষ্ট করে দিয়েছেন। আরবি লিখতে-পড়তে শিখেছি, আরবি ব্যাকরণ শিখেছি, জীবনে আর কিছু শিখিনি আপনার কাছে।

এ ভাষায় সম্রাট আওরঙ্গজেব তাঁর শিক্ষককে সম্বোধন করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে সম্রাট এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি আরোও অনেক কথা বলেছেন। যেমন:

আপনি কি জানেন না, বাল্যকালই হলো জীবনের শ্রেষ্ঠ কাল। শিক্ষা দেয়ার সুবর্ণ সুযোগ ছিল তখন আপনার। আপনি আমাকে আরবির মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শিখিয়েছেন, আইনশাস্ত্র, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিয়েছেন। নিজের মাতৃভাষায় যে কোনো বিষয় কি আরও সহজে আরও অনেক ভালোভাবে শেখানো যায় না? আপনি আমার পিতা শাহজাহানকে বলেছিলেন যে আমাকে দর্শনশাস্ত্র শিক্ষা দিচ্ছেন। কিন্তু আমি তো জানি, কি শিখিয়েছেন আপনি? কতোগুলো দুর্জ্ঞেয় সূত্র তার চেয়েও কঠিন আরবি ভাষায় আপনি আমার মগজে জোর করে ঢুকিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। কি মূল্য আছে তার বাস্তব জীবনে?

মোল্লাজী চুপ করে কথাগুলো শুনছিলেন। আওরঙ্গজেব উত্তেজিত না হয়ে, অত্যন্ত ধীর, শান্ত ও সংযতভাবে কথাগুলো বলেছেন:

আপনি আমাকে রাজকর্তব্য শিক্ষা দেননি। শাহজাদা যে একদিন সিংহাসনে বসতে পারে, এ কথা আপনার খেয়াল হয়নি। ভারতের রাজা-বাদশাদের এটা একটা চরম দুর্ভাগ্য। তাঁরা কোনোদিনই সত্যিকার শিক্ষকের কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পান না।

আপনি আমাকে যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দেননি। যা হোক, আমার ভাগ্য ভালো যে আপনার মতো বিজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়াও আমি আরোও কয়েকজনের কাছে শিক্ষা নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তা না হলে আমার পরিণাম যে কি হতো, তা ভাবতেও ভয় হয়। অতএব, হে সুধীপ্রধান! আপনি অনুগ্রহ করে নিজ বাড়িতে ফিরে যান।*

---

* সম্রাট আওরঙ্গজেবের চরিত্রের এই সরলতা, দৃঢ়তা ও স্পষ্টবাদিতা বাস্তবিকই দুর্লভ। সাধারণ ইতিহাসের বই থেকে তাঁর চরিত্রের এই দিকটার কথা কিছুই জানা যায় না।– অনুবাদক।

ইরানের রাষ্ট্রদূত ও মোল্লাজীকে নিয়ে যখন এসব ঘটনা চলছে তখন জ্যোতিষীদের নিয়ে হঠাৎ একটা ঝামেলা বেধে যায়। আমার কাছে ঘটনাটা বেশ উপভোগ্য মনে হয়েছে।

এশিয়ার অধিকাংশ মানুষই অলৌকিক সঙ্কেত ও নির্দেশ সম্বন্ধে এতো বেশি আস্থাবান যে, পৃথিবীর কোনো ঘটনা যে উর্ধ্বলোকের ইশারা ছাড়া ঘটতে পারে, এ তারা কল্পনাই করতে পারে না। তাই পদে পদে তারা জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হয়। জ্যোতিষীর পরামর্শ ছাড়া জীবনে এক পাও চলতে চায় না। যুদ্ধক্ষেত্রে দুই পক্ষের সেনাবাহিনী হয়তো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত, কিন্তু যতোক্ষণ না 'সাহেৎ' অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ 'শুভমুহূর্ত' বিজ্ঞাপিত হয়, ততোক্ষণ সেনাধ্যক্ষরা যুদ্ধ আরম্ভ করার হুকুম দেন না। শুধু যুদ্ধবিগ্রহ নয়, জীবনের কোনো কাজই জ্যোতিষীর পরামর্শ ও অনুমতি ছাড়া করা হয় না। সেনাপতি নিয়োগ করতে হবে, জ্যোতিষীর পরামর্শ চাই; বিয়ে করতে বা করাতে হবে, তাও জ্যোতিষীর অনুমতি চাই; কোনো স্থানে যাত্রা করতে হবে, জ্যোতিষী যাত্রার শুভক্ষণ বলে দেবেন। সব সময় এবং সব জায়গায় জ্যোতিষী বাবুরা হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা ও বন্ধু। জ্যোতিষীরা প্রাত্যহিক জীবনের অতি তুচ্ছ ঘটনাও নিয়ন্ত্রণ করেন। কেউ হয়তো একটি ক্রীতদাস কিনবেন, তাও জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করা চাই। কেউ হয়তো বছর শেষে নতুন পোশাক পরবেন, তাও পরা উচিত কি না, জ্যোতিষী বলে দেবেন!

এ ধরনের অর্থহীন কুসংস্কার, কথায় কথায়, পদে পদে জ্যোতিষীর শরণাপন্ন হওয়া– এ আমি আর কোথাও দেখিনি। মনে হয় এ দেশের মানুষজন জন্ম থেকে জীবনটাকে যেন জ্যোতিষীর কাছে বন্ধক দিয়ে রেখেছে! জ্যোতিষীর এই বিপুল প্রতিপত্তির ফলে অনেক সময় যথেষ্ট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। দেশের ও সমাজের, ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজকর্ম, নীতি ও পরিকল্পনার সঙ্গে জ্যোতিষীদের সর্বাগ্রে পরিচয় হয়। যা হয়তো জনকল্যাণের স্বার্থে বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর স্বার্থে গোপন রাখা প্রয়োজন, তাও জ্যোতিষীরা আগেভাগেই জানতে পারেন। জানার ফলে স্বভাবতই অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, ঘটতে বাধ্য।

এবার ঘটনাটি বলি। চমৎকার ঘটনা।

প্রধান রাজজ্যোতিষী যিনি তিনি হঠাৎ একদিন পুকুরের পানিতে পড়ে যান এবং এমন পড়া পড়েন যে আর ওঠা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ পানিতে ডুবে রাজজ্যোতিষী মারা যান।

সংবাদটি বাইরে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে হইচই পড়ে যায়। দরবারেও যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। জ্যোতিষীরা রীতিমতো ভীত ও বিব্রত

বোধ করতে থাকেন। অন্য কোনো কারণে নয়, তাঁদের জ্যোতিষী পেশার কথা চিন্তা করে। রাজজ্যোতিষী যিনি পানিতে ডুবে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেন, তিনি সম্রাট ও তাঁর আমির-ওম্‌রাহদেরই ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন। সুতরাং প্রজারা তাকে খুব জবদরস্ত জ্যোতিষী মনে করতো। তারা ভাবে, যিনি সম্রাট ও আমির-ওম্‌রাহদের জীবনের প্রত্যেকটি ছোটবড় ঘটনা সম্বন্ধে এতেদিন ভবিষ্যদ্বাণী করে এসেছেন, ভবিষ্যতের প্রত্যেকটি ঘটনা যিনি দিব্যচক্ষে দেখতে পেতেন, তিনি কেনো নিজে তাঁর মর্মান্তিক ভবিষ্যৎটি দেখতে পাননি? রাজজ্যোতিষী কেনো বুঝতে পারেননি যে পানিতে নামলেই তিনি পড়ে যাবেন এবং পড়ে গেলে মরে যাবেন? সকলের ভাগ্যবিধাতা ও ভবিষ্যৎ বলে বেড়ান যিনি, তিনি নিজের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি কেনো?

এ প্রশ্ন সকলের মনেই উঁকি দিতে থাকে, কেউ তার কোনো সন্তোষজনক জবাব পান না। অনেকের মনে ফিরিঙ্গিস্থানের 'বিজ্ঞান' ও ভারতীয় 'জ্যোতিষ' সম্বন্ধে নানা রকমের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে থাকে।

স্বভাবতই এ ধরনের কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনা শুনে জ্যোতিষীরা খুব ক্ষুব্ধ হতেন। তাদের পেশা নিয়ে এমন সব বিরূপ মন্তব্য তাদের পছন্দ হতো না।

জ্যোতিষী সম্বন্ধে নানা রকমের ঠাট্টা-বিদ্রূপ যখন পুরোদমে আরম্ভ হয়, তখন তারা রীতিমতো বিচলিত হয়ে পড়েন। জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে নানা কাহিনীও রটতে থাকে। তার মধ্যে একটি কাহিনী খুব বেশি প্রচার হয়েছিলো সে সময়। কাহিনীটি ইরানের শাহানশাহ শাহ আব্বাস সম্পর্কে। কাহিনীটি এরকম :

শাহ আব্বাস একবার তাঁর হেরেম মহলের মধ্যে একটি ছোট সুন্দর বাগিচা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্রাটের ইচ্ছা বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য প্রধান মালী উদ্‌যোগী হয় এবং কয়েকটি ফলের গাছ রোপণ করার দিনও ঠিক করে। সংবাদ শুনে রাজজ্যোতিষী শাহানশাহকে জানান, শুভদিনে যদি গাছ রোপণ না করা হয় তাহলে সেই গাছে ফল ধরার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।

শাহ আব্বাস রাজজ্যোতিষীর কথার যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। জ্যোতিষী তাঁর পুঁথিপত্র নিয়ে দিন স্থির করতে বসেন। পুঁথি দেখে তিনি গম্ভীরভাবে বলেন যে, আর এক ঘণ্টার মধ্যে যদি গাছগুলো রোপণ করা না হয়, তাহলে গ্রহণ ক্ষেত্রের যোগাযোগের শুভ মুহূর্তটি পেরিয়ে যাবে। তাই গাছে ফল ফলবে না।

রাজজ্যোতিষী এমন মতামত দেয়ার সময় প্রধান মালী উপস্থিত ছিল না। সুতরাং অন্য লোকজন ডেকে তাড়াতাড়ি গাছ রোপণের ব্যবস্থা করা হয়। মাটিতে গর্ত খোঁড়া হয়, শাহানশাহ নিজের হাতে চারাগাছগুলো রোপণ করেন। সব কাজ এভাবে শেষ হয়ে যাবার পর প্রধান মালী ফিরে এসে দেখে তার

করণীয় কর্ম কে যেনো শেষ করে রেখেছে। গাছগুলো সব উল্টোপাল্টা করে রোপণ করা হয়েছে। আমের জায়গায় জাম, খেজুরের জায়গায় ডালিম, আতার জায়গায় নোনা, নোনার জায়গায় আপেল লাগানো হয়েছে।

এরকম কাজ কে করেছে এবং কেনো করেছে তার খোঁজ নেয়ার মতো ধৈর্য হয় না প্রধান মালীর। সে বিরক্ত হয়ে গাছগুলো উপড়ে ফেলে। তারপর চারাগাছগুলো সারারাত মাটিতে ফেলে রাখা হয় সকালে রোপণ করার জন্য।

খবরটি রাজজ্যোতিষীর কানে পৌঁছতে দেরি হয় না। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে এ খবর শাহানশাহের কানে পৌঁছে দেন। শাহানশাহ প্রধান মালীকে ডেকে পাঠান। প্রধান মালী হাজির হলে তিনি বলেন: 'আমার নিজের হাতে লাগানো গাছ কে তোমাকে উপড়ে ফেলতে বলেছে? শুভ মুহূর্ত দেখে গাছ লাগানো হয়েছে, আর তুমি সেই গাছ কাউকে জিজ্ঞেস না করে উপড়ে ফেললে কেনো? এখন আর গাছের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।'

প্রধান মালী কিছুক্ষণ শাহানশাহের মুখের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থেকে বলে : "হায় আল্লা! এই কি শুভ মুহূর্ত? দ্বিপ্রহরে বৃক্ষ রোপণ করলে সন্ধ্যার সময় তা উপড়ে ফেলাই ভালো!'

শাহানশাহ প্রধান মালীর কথা শুনে হেসে ফেলেন এবং রাজজ্যোতিষীর দিকে ফিরে চলে যান।

ভারতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি

আমি আরো দুটি ঘটনার কথা লিখবো যা থেকে ভারতের সামাজিক প্রথা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা হবে। ঘটনা দুটি সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ঘটেছিলো। এ দুটি বিবৃত করা প্রয়োজন, কারণ ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে মোগল যুগেও ভারতবর্ষে যে কি রকম বর্বর প্রথা চালু ছিল, তা এই ঘটনা থেকে বোঝা যাবে।

ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো পবিত্রতা রক্ষা করা হতো না, নিরাপত্তাও ছিল না। সম্পত্তি সব হলো সম্রাটের। রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির যাবতীয় সম্পত্তির মালিক সম্রাট।* সম্রাটের অধীনে যারা কাজ করেন তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো অধিকারই স্বীকৃত হয় না। তাদের মৃত্যুর পর সম্পত্তির মালিক হন সম্রাট নিজে।

---

* বার্নিয়ারের এই উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনায় বার্নিয়ারের এই মন্তব্য প্রত্যেক অনুসন্ধানী ও চিন্তাশীল ব্যক্তির চিন্তার খোরাক জোগাবে। 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' সম্বন্ধেও বার্নিয়ারের এই বিবরণের ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। ভারতবর্ষে মোগল যুগেও ক্রীতদাসপ্রথা কি রকম প্রচলিত ছিল, সে সম্বন্ধেও বার্নিয়ার প্রচুর মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং তার ভ্রমণ কাহিনীতে সে সব বর্ণনা করেছেন।– অনুবাদক।

এবার ঘটনা দুটিতে আসি:

নায়েক খান নামে মোগল দরবারে একজন প্রবীণ আমির ছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর দরবারের নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে তিনি যথেষ্ট ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করেছিলেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যে সম্রাটের করতলগত হবে, তা তিনি জানতেন। এই বর্বর প্রথার জন্য কিভাবে ওম্‌রাহদের মৃত্যুর পর তাদের বিধবা পত্নীরা দুর্দশার চরম সীমায় উপস্থিত হন এবং সামান্য ভাতার জন্য সম্রাটের দ্বারস্থ হতে বাধ্য হন, তাও তিনি জানতেন। তিনি জানতেন, কিভাবে মৃত ওম্‌রাহদের পুত্ররা সামান্য জীবিকার জন্য অন্যান্য ওম্‌রাহের ব্যক্তিগত সেনাদলে নাম লেখাতে রাজি হয়।

নায়েক খান যখন অনুভব করতে পারেন তার জীবনকাল শেষ হয়ে এসেছে, তখন তিনি আত্মীয়স্বজন ও কর্মচারীদের ডেকে তার সঞ্চিত অর্থ বিলিয়ে দেন এবং সিন্দুকের মধ্যে মোহর ও টাকার বদলে লোহা, হাড়ের টুকরো, পুরনো ছেঁড়া জুতা, ছেঁড়া কাপড় ভরে রাখেন। এভাবে সিন্দুক ভর্তি করে, শীলমোহর দিয়ে তিনি সবাইকে জানিয়ে দেন, সিন্দুকে যেনো কেউ হাত না দেয়। কারণ তাঁর মৃত্যুর পর এই সিন্দুকে যা কিছু আছে তা সম্রাট শাহজাহানের প্রাপ্য।

নায়েক খানের মৃত্যুর পর কথানুযায়ী সেই সিন্দুক সম্রাট শাহজাহানের কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্রাট তখন রাজদরবারে আমলা-অমাত্য পরিবেষ্টিত হয়ে বসে ছিলেন। এমন সময় আমির নায়েক খানের সিন্দুক সেখানে বহন করে আনা হলে সম্রাট সকলের সামনে সিন্দুক খোলার অনুমতি দেন। তারপর সিন্দুকের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত দ্রব্যাদি দেখে সম্রাটের কি অবস্থা হয় তা সহজেই অনুমান করা যায়। ভীষণ রেগে গিয়ে সম্রাট শাহজাহান তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে দরবার ছেড়ে চলে যান। এই হলো প্রথম ঘটনা।

দ্বিতীয় ঘটনাটি একটি স্ত্রীলোকের উপস্থিত বুদ্ধির পরিচায়ক। একজন বিখ্যাত বেনিয়ানের মৃত্যুর পর ঘটনাটি ঘটে।* বেনিয়ান ভদ্রলোক দীর্ঘদিন সম্রাটের অধীন নিযুক্ত ছিলেন এবং মহাজনী কারবার করে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র পিতার সঞ্চিত অর্থের ভাগ চায়, কিন্তু বেনিয়ানের বিধবা পত্নী তা দিতে রাজি হয় না। কারণ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটি ছিল খুবই বেহিসেবি। কাঁচা পয়সা হাতে পেলে দুদিনেই যে সে উড়িয়ে দেবে, তা সে জানতো।

টাকা না পেয়ে পুত্র মায়ের ওপর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য পিতার সঞ্চিত অর্থের কথা সম্রাটকে জানিয়ে দেয়। সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দু লাখ টাকা।

---

* বার্নিয়ারের আমলে হিন্দু ব্যবসায়ীদের 'বেনিয়ান' বলা হতো। পরে ব্রিটিশ আমলে বাংলাদেশের বাঙালি ব্যবসায়ী ও দালালদেরও 'বেনিয়ান' বলা হতে থাকে।—অনুবাদক।

সংবাদ পেয়ে সম্রাট বেনিয়ানের বিধবা পত্নীকে ডেকে পাঠান। ওম্‌রাহদের সামনে তাঁকে বলেন যে অবিলম্বে সে যেন এক লাখ টাকা তাঁকে পাঠিয়ে দেয় আর পঞ্চাশ হাজার টাকা তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রকে দেয়।

এ কথা বলে সম্রাট বিধবা স্ত্রীলোকটিকে হলঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন।

স্ত্রীলোকটি কিন্তু সম্রাটের এই রূঢ় ব্যবহারে বিচলিত হয় না। প্রহরীরা যখন তাকে হলঘর থেকে বের করে দেয়ার জন্য এগিয়ে আসে তখন সে বলে, অনুমতি দিলে আমি সম্রাটকে আরও দু-একটি কথা জানাতে চাই।

শাহজাহান বলেন, 'বলতে দাও, সে কি বলতে চায় শুনি।'

স্ত্রীলোকটি বলে, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। আমার কনিষ্ঠ পুত্র টাকা দাবি করেছে পুত্র হিসেবে। তার অধিকার আছে, সে চাইতে পারে। আপনিও দেখছি টাকা চাইছেন। জানি না আপনার সঙ্গে আমার মৃত স্বামীর কোন্ সম্পর্ক ছিল। অনুগ্রহ করে যদি বলেন আপনার সঙ্গে আমার স্বামীর আত্মীয়তার সম্পর্ক কি, তাহলে আমি আনন্দিত হবো।'

সরল স্ত্রীলোকের এই সহজ প্রশ্ন শুনে সম্রাট শাহজাহান অভিভূত হন আর সামান্য একজন সুদখোর বেনিয়ানের সঙ্গে আত্মীয়তার প্রশ্নে হেসে উঠে বলেন, 'বুঝেছি তুমি কি বলতে চাইছো। তোমার প্রশ্নের জবাবে বলছি, তোমার টাকা চাই না। এ টাকা তুমিই ভোগ করো।'

১৬৬০ সালে মোগল সাম্রাজ্যের ঘরোয়া যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হবার পর থেকে ১৬৬৬ সালে আমার সে দেশ থেকে বিদায় নেয়ার সময় পর্যন্ত অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে বিবৃত করার ইচ্ছা নেই। করতে পারলে অবশ্যই ভালোই হতো। আপাতত কয়েক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। যাঁদের সান্নিধ্যে আমি এসেছি এবং ব্যক্তিগতভাবে যাঁদের সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার আমার রয়েছে। যাঁদের কথা বলবো তাঁরা প্রত্যেকেই ঐতিহাসিক চরিত্র রূপে স্বনামখ্যাত।

সম্রাট শাহজাহানের চরিত্র

প্রথমে শাহজাহানের কথা বলি। যদিও আওরঙ্গজেব তাঁর পিতাকে আগ্রার দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং অত্যন্ত কড়া পাহারার মধ্যে তাঁকে রাখতেন, তাহলেও বৃদ্ধ পিতাকে তিনি যথেষ্ট উদারতা ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। শাজহানকে তিনি তাঁর ইচ্ছে মতো থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর কন্যা শাহজাদী জাহান আরা, জেনানা ও নতর্কীদেরও তাঁর সঙ্গে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। ব্যক্তিগত বিলাস ও সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য বৃদ্ধ শাহজাহান যখন যা চেয়েছেন, তখন তা-ই তাঁকে মঞ্জুর করা হয়েছে। যখন তাঁর ধর্মকর্ম করার ঝোঁক হয়, তখন মৌলবীদেরও তাঁর কাছে কোরান পাঠের

জন্য নিয়মিত যাবার অনুমতি দেয়া হয়। তা ছাড়া নানা ধরনের জীবজন্তু– যেমন ভালো ভালো ঘোড়া, বাজপাখি, হরিণ বা যখন যা তিনি চাইতেন, তখনই তাঁকে তা পাঠিয়ে দেয়া হতো।

সম্রাট শাহজাহান ও সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহল

শাহজাহান জীবজন্তু ও পাখির লড়াই দেখতে ভালোবাসতেন। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, আওরঙ্গজেব সব সময় তাঁর পিতার প্রতি যথেষ্ট উদার আচরণ করেছেন। কোনোদিন পিতার প্রতি খারাপ ব্যবহার করেননি বা অশ্রদ্ধা দেখাননি। তিনি প্রায়ই তাঁর পিতাকে বিভিন্ন ধরনের উপহার পাঠাতেন। গুরুতর ব্যাপারে পিতার সঙ্গে পরামর্শও করতেন এবং অত্যন্ত ভদ্র ও নম্র ভাষায় চিঠি লিখতেন। এই আচরণের জন্যই শাজহানের ক্রুদ্ধ ও ঔদ্ধত্য স্বভাব শেষপর্যন্ত শান্ত ও নম্র হয়েছিলো। এমন কি, আওরঙ্গজেবের প্রতি বিরূপ মনোভাব তাঁর আর ছিলোও না।

রাজনৈতিক ব্যাপারে শাহজাহান আওরঙ্গজেবকে চিঠি লিখতেন, দারার কন্যাকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন এবং যে মূলবান মণিরত্ন একদিন শাহজাহান চূর্ণ করে ফেলবেন বলেছিলেন, তাও আওরঙ্গজেবকে উপহার দিয়ে খুশি হয়েছিলেন। বিদ্রোহী পুত্রকে মন থেকে ক্ষমা করে আশীর্বাদও করেছিলেন।

এ পর্যন্ত যা লিখেছি তাতে মনে হতে পারে যে আওরঙ্গজেব বোধ হয় সব সময় তাঁর পিতাকে খুশি করার চেষ্টা করতেন এবং কখনো কঠোর ব্যবহার করতেন না। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পিতাকে খুশি করার জন্য তিনি অকারণে কখনো মাথা নত করেননি। শাহজাহানকে লেখা এমন একটি চিঠির কথা আমি জানি যার মধ্যে আওরঙ্গজেবের তাঁর পিতার কোনো উক্তির প্রতিবাদ করে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় জবাব দিয়েছিলেন। এই চিঠির কিছুটা অংশ আমি স্বচক্ষে দেখেছি। এখানে তা উদ্ধৃত করছি:

> আপনার ইচ্ছা যে আমি সনাতন প্রথা আঁকড়ে ধরে থাকি এবং আমার অধীন যে কোনো কর্মচারীর মৃত্যুর পর তার যাবতীয় ধনসম্পত্তি নিজে গ্রাস করে বসি। যখন কোনো আমির বা কোনো ধনী ব্যবসায়ী মারা যান, এমন কি তাঁদের মৃত্যুর আগেই, আমরা তাঁর ধনসম্পত্তি সব গ্রাস করি, তাঁদের অধীন কর্মচারী ও ভৃত্যদের পদচ্যুত করে দূর করে দিই। সামান্য এক টুকরো সোনাদানাও আমরা রেখে আসি না। এভাবে অপরের সঞ্চিত ধনরত্ন আত্মসাৎ করায় হয়তো একটা অস্বাভাবিক আনন্দ থাকতে পারে, কিন্তু এর মতো নিষ্ঠুর ও অন্যায় আচরণ আর হতে পারে না। আমির নায়েক খান অথবা হিন্দু বেনিয়ানের সেই বিধবা পত্নী আপনার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন এবং এই অন্যায় প্রথার যে সমুচিত জবাব দিয়েছিলেন, তা অবাঞ্ছনীয় বা অপ্রীতিকর হলেও সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত নয় কি? সুতরাং আপনার অভিযোগ ও আদেশ আমি মান্য করতে পারলাম না এবং আপনি আমার ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন তাও আমি স্বীকার করে নিতে রাজি নই।
>
> আজ আমি সিংহাসনে বসেছি বলে আপনি ভুলেও মনে করবেন না যে আমি অহংকারে অন্ধ হয়ে গেছি। প্রায় চল্লিশ বছরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই খুব ভালোভাবে জানেন যে, রাজমুকুট মাথায় ধারণ করার দায়িত্ব, অশান্তি ও ঝামেলা কতোখানি।...,
>
> আপনার ইচ্ছা, রাজ্যের শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য আমি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে বরং রাজ্যের সীমানা বৃদ্ধির জন্য যুদ্ধবিগ্রহের পরিকল্পনা করি। অবশ্য এ কথা আমি স্বীকার করি যে প্রত্যেক শক্তিশালী সম্রাটের উচিত যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করে রাজ্যের সীমানা বাড়ানো। আমার যদি সে ইচ্ছা না থাকে তাহলে বুঝতে হবে যে আমি তৈমুরের বংশধর নই। সব স্বীকার করলেও আপনি আমাকে নিষ্ক্রিয় বলতে পারেন না। আমার সেনাবাহিনী যে কোনো যুদ্ধই করেনি এবং রাজ্যেও জয় করেনি, এমন অভিযোগও করা যায় না। দাক্ষিণাত্য ও বাংলাদেশে আমার সৈন্যরা এদিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আপনাকে এ কথাও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, শুধু রাজ্য জয় করাই শ্রেষ্ঠ শাসকদের কর্তব্য নয়। পৃথিবীর বহু দেশ ও জাতি অসভ্য বর্বরদের পদানত হয়েছে

এবং অনেক দিগ্বিজয়ী দোর্দণ্ডপ্রতাপ সম্রাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য পথের ধুলায় গুঁড়িয়ে গেছে। সুতরাং সাম্রাজ্য জয় করাই সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য নয়। প্রজাদের মঙ্গলের জন্য, রাজ্যের সমৃদ্ধির জন্য, ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজ্য পরিচালনা করাই প্রত্যেক সম্রাটের অন্যতম কর্তব্য।*

মগ ও পর্তুগীজ বোম্বেটেদের কথা

বাংলাদেশের সুবাদার হয়ে এসে শায়েস্তা খান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব নেন। কাজটি হলো, বাংলাদেশকে মগ ও পর্তুগীজ জলসদ্যুদের অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করা। এ কাজের দায়িত্ব তাঁর পূর্বগামী শাসনকর্তা বিখ্যাত মীর জুমলা কেনো গ্রহণ করেননি, তা তিনিই জানেন। শায়েস্তা খান যে কি বিরাট দায়িত্ব স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন তা বুঝতে হলে তখনকার বাংলাদেশের অবস্থা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার।

বাংলার সীমান্তে আরাকান রাজ্যে বা মগদের দেশে পর্তুগীজ ও অন্যান্য ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলো। গোয়া, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), কোচিন, মালাক্কা প্রভৃতি দেশ থেকে পালিয়ে এসে তারা এখানে আশ্রয় নিতো। এমন কোনো অপকর্ম ছিল না যা তারা করতো না। তারা নামেই শুধু খ্রিস্টান ছিল, কিন্তু তাদের মতো জঘন্য পিশাচ প্রাকৃতির লোক সচরাচর দেখা যেতো না। খুন, জখম, ধর্ষণ, লুটতরাজ ইত্যাদি ব্যাপারে তাদের সমকক্ষ কেউ ছিল না।

আরাকানের রাজা মোগলদের ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত থাকতেন এবং যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা করে এই ফিরিঙ্গি দস্যুদের তিনি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

এই পর্তুগীজ দস্যুরা মগদের প্রশ্রয় ও উস্কানি পেয়ে রীতিমতো যথেচ্ছাচার করতে আরম্ভ করে। বাংলার উপকূল অঞ্চলে জলপথে তারা লুটতরাজ ও অত্যাচার করে বেড়াতে থাকে। এ সময় গঙ্গার অসংখ্য শাখানদী দিয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়ে নিম্নবঙ্গের অধিকাংশ অঞ্চলে তারা লুটতরাজ করে বেড়ায়।

এই দস্যুরা হাট-বাজারের দিন গ্রামের মধ্যে ঢুকে ক্রীতদাস করার জন্য গ্রামের লোকদের বন্দী করে নিয়ে যায়। উৎসব-পার্বণের দিনও তারা গ্রামাঞ্চলে

---

* এর পর বার্নিয়ার মীর জুমলার বাংলা ও আসাম অভিযানের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মীর জুলমার পর শায়েস্তা খান আওরঙ্গজেবের দুই পুত্র সুলতান মাহমুদ ও সুলতান মাজুম, কাবুলের শাসনকর্তা মহবৎ খান, যশোবন্ত সিং, শিবাজী প্রমুখের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও চরিত্র সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছেন। এই অংশের অনুবাদ এখানে করা হলো না, কারণ নিছক ঘটনার বিবরণ ছাড়া এর মধ্যে বিশেষ কিছু নেই।
শায়েস্তা খান প্রসঙ্গে মগ ও পর্তুগীজদের অত্যাচার সম্বন্ধে যে মূল্যবান বিবরণ বার্নিয়ার দিয়েছেন, তার সারানুবাদ করা হলো।– অনুবাদক

হানা দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে থাকে। নিম্নবঙ্গের কতোশত গ্রাম যে তারা এভাবে লুণ্ঠন করেছে এবং অত্যাচার করে জনশূন্য করেছে, তার হিসেব নেই। এই ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারে নিম্নবঙ্গের অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়েছে।[১৭]

আওরঙ্গজেবের মহত্ত্ব

আমার ইতিহাস এখানেই শেষ হলো। পাঠকরা নিশ্চয় আওরঙ্গজেবের সিংহাসন দখলের নিষ্ঠুর পদ্ধতি অনুমোদন করবেন না। আমিও করি না। না করাই স্বাভাবিক। যে কৌশলে আওরঙ্গজেব তাঁর পিতার সিংহাসন দখল করেছিলেন, তা নিশ্চয় নিষ্ঠুর ও অন্যায় কৌশল। কিন্তু যেমন ইউরোপের রাজাদের আমরা বিচার করে থাকি, সেভাবে বোধ হয় আওরঙ্গজেবকে বিচার করা উচিত হবে না। ইউরোপে রাজার মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন উত্তরাধিকারসূত্রে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অধিকার সেখানে বিধিবদ্ধ। ভারতীয় রাজ্যগুলোতে সে রকম কোনো আইন বা বিধান নেই। তাই রাজার মৃত্যুর পর রাজকুমাররা এবং মুসলিম বাদশাহর মৃত্যুর পর শাহজাদারা সিংহাসন নিয়ে কলহ করেন, যুদ্ধবিগ্রহও করেন। কারণ তাঁরা জানেন যে, যিনি এভাবে সিংহাসন দখল করতে পারবেন তিনিই ভাগ্যবান, বাকি সকলকেই সেই ভাগ্যবানের অধীনে হতভাগ্যের মতো জীবন কাটাতে হবে। তা সত্ত্বেও যাঁরা সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিন্দাবাদ করবেন, কম করে হলেও তাঁদের এটুকু স্বীকার করা উচিত যে, সব ভুলভ্রান্তি নিয়েও আওরঙ্গজেবের মতো একজন প্রতিভাবান, শক্তিশালী, বিচক্ষণ ও মহান সম্রাট ভারতবর্ষে খুব কমই জন্মেছেন।

---

১৭. ১৭৮০ সালে প্রকাশিত রেনেলের মানচিত্র 'Map of the Sunderbun and Baliagon Passages'-এ মধ্যে দেখা যায়, নিম্নবঙ্গের একটি অঞ্চলকে 'Country depopulated by the Muggs' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বার্নিয়ারের এই বিবরণের সঙ্গে রেনেলের মানচিত্রের এই উল্লেখ আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। পরবর্তীকালে অবশ্য গঙ্গার ধারা পরিবর্তনের জন্যও প্রাচীন ভাগীরথীর তীরবর্তী অনেক জনপদ ধ্বংস হয়ে গেছে।– অনুবাদক।

ভারতবর্ষের কথা

[বার্নিয়ারের সময় চতুর্দশ লুই ফ্রান্সের সম্রাট ছিলেন এবং মঁশিয়ে কলবার্ট ছিলেন ফ্রান্সের অর্থসচিব। স্বদেশে ফিরে গিয়ে বার্নিয়ার ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা, সম্পদ, আচার-ব্যবহার, সেনাবাহিনী, সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে একটি দীর্ঘ চিঠি লেখেন। বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর অন্যান্য অংশের মধ্যে এই চিঠিটির ঐতিহাসিক মূল্য সবচেয়ে বেশি বললেও অত্যুক্তি হয় না। মোগল যুগের ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার এ জাতীয় নিখুঁত চিত্র ও বিশ্লেষণ সমসাময়িক অন্য কোনো সাহিত্যে প্রকৃতই দুর্লভ।—অনুবাদক।

মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লেখা বার্নিয়ারের চিঠি

এশিয়ার কোনো সম্মানীত ব্যক্তির কাছে শূন্য হাতে যাওয়া রীতি নয়। মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের পোশাক স্পর্শ করার প্রথম সুযোগ ও সৌভাগ্য যখন আমার হয় তখন তাঁর সম্মানের খাতিরে আমাকে নগদ আটটি টাকা প্রণামী দিতে হয়েছিলো। তা ছাড়া একটি ছোরার খাপ, একটি কাঁটা এবং উৎকৃষ্ট চামড়ায় বাঁধানো একটি ছুরি ফজল খানকে দিতে হয়েছিলো। ফজল খান একজন মন্ত্রী এবং সাধারণ মন্ত্রী নন, ক্ষমতাধর মন্ত্রী। পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে আমার বেতন কতো হওয়া উচিত তাও তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। মোটকথা, তিনি অনেক বড় দায়িত্ব পালন করতেন। সে জন্য তাঁকেও প্রথম সাক্ষাতের সময় ভেট দিতে হয়েছে। যদিও এ ধরনের কোনো রীতি আমি আমার দেশ ফ্রান্সে চালু করতেই চাই না, তবু ভারত থেকে ফিরে আসার পর এতো তাড়াতাড়ি আমি সেখানকার রীতি-নীতি ভুলেও যেতে পারছি না। তাই আপনাকে চিঠিতে সব কথা লিখে জানাচ্ছি।

সম্রাটের সামনে উপস্থিত হতে আমি সত্যি সত্যিই সঙ্কোচ বোধ করছি এবং সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাদের দেশের সম্রাটের সঙ্গে ভারতসম্রাট আওরঙ্গজেবের নানা দিক দিয়ে পার্থক্য রয়েছে। দুজনের সামনে গেলে দু'রকমের মনোভাব হয়। আর আপনার সামনেইবা আমি কি করে শূন্যহাতে উপস্থিত হই? ফজল খানের চেয়ে আপনাকে যে আমি কতো বেশি শ্রদ্ধা করি, তা তো আপনি জানেন। তাই এ ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আপনাদের জানানো বিশেষ দরকার মনে করি।

আমি দীর্ঘ বারো বছর ভারতে কাটিয়েছি। সেই সময় বুঝেছি আমার দেশ ফ্রান্সের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য কোথায় ও কতোখানি। ভারতে থাকার সময় আমি আপনার মতো মন্ত্রীর দক্ষতা সম্পর্কেও নিশ্চিত হয়েছি। সে কথা এখানে আলোচনা করার আপাতত কোনো প্রয়োজন নেই। তার চেয়ে ভারত সম্পর্কে আমি যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, এই চিঠিতে সে সম্পর্কে কিছু লিখে যেতে চাই।

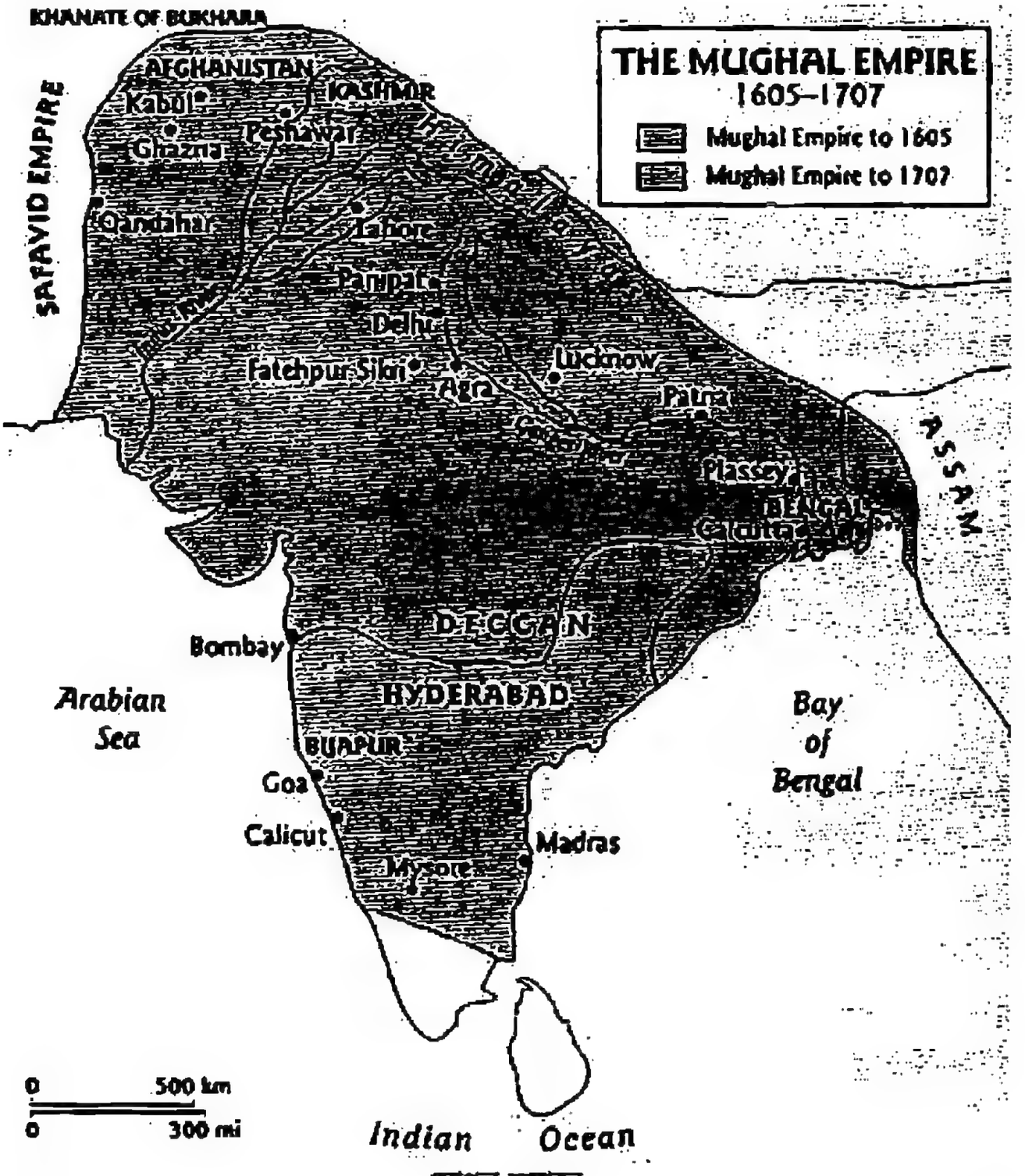

মোগল সম্রাজ্য

এশিয়ার মানচিত্রের দিকে তাকালে মোগল সম্রাটের রাজত্বের বিশালতা সহজেই আন্দাজ করা যায়। এই বিশাল রাজ্যই 'ভারত' নামে পরিচিত। এই বিশাল রাজ্য আমি মেপে দেখিনি, দেখা সম্ভবও নয়। তবে আমার ভ্রমণ থেকে যে ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় যে, গোলকুন্ডার সীমানা থেকে গজ্‌নি বা কান্দাহারের কাছাকাছি পর্যন্ত, অর্থাৎ ইরানের প্রথম শহর পর্যন্ত, তিন মাসের

ভ্রমণপথ এবং দূরত্ব প্রায় পাঁচশো ফরাসী লীগ বা প্যারিস থেকে লিঁয় যতোটা দূর, তার প্রায় পাঁচগুণ বেশি দূর। অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার হলো, এতো বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকাংশই উর্বরা। তার মধ্যে বাংলাদেশ তুলনাহীন। এরকম উর্বর দেশ পৃথিবীতে খুব কমই আছে। বাংলাদেশের সম্পদ ও ঐশ্বর্য অতুলনীয়। মিসরের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছা করে, কিন্তু বাংলাদেশের উর্বরতা মিসরের তুলনায় অনেক বেশি। মিসরে যে পরিমাণ শস্যাদি উৎপন্ন হয়, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় বাংলাদেশে। যেমন–ধান, গম, যব, সরিষা ইত্যাদি। এ ছাড়া আরও নানা রকমের ফসল ও পণ্যাদি যা বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, মিসরে তা হয় না– যেমন তুলো, রেশম, নীল ইত্যাদি।

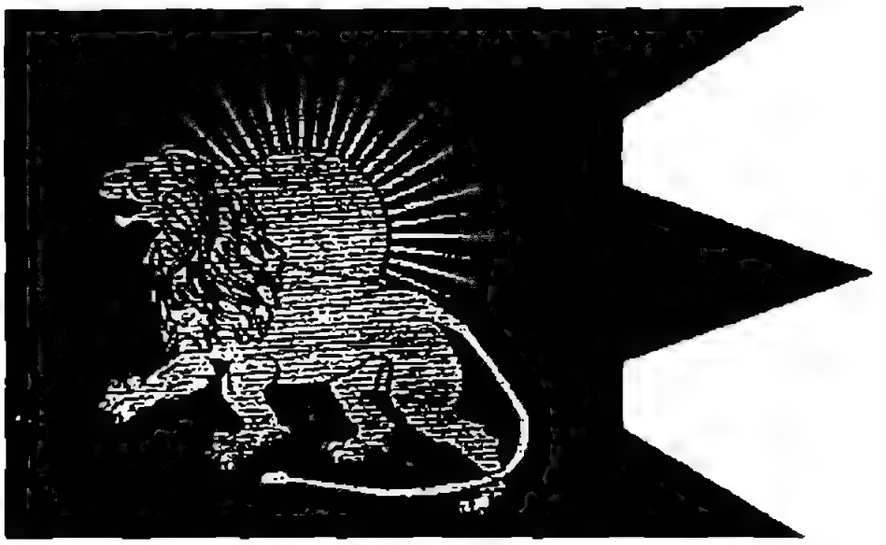

মোগল সাম্রাজ্যের পতাকা

ভারতের বহু প্রদেশে লোকসংখ্যা খুব বেশি এবং চাষাবাদও বেশ ভালোভাবে করা হয়। শিল্পী ও কারিগররা সাধারণত আয়েসী প্রকৃতির। তবে প্রয়োজনের তাগিদে তারা মেহনত করতে বাধ্য হয় এবং নানা ধরনের কার্পেট, ব্রকেড, সোনা-রুপার কাজ করা দামী কাপড় ও সূক্ষ্ম জিনিসপত্র তৈরি করে বিক্রি করে। তারা তাদের দ্রব্যসামগ্রী বিদেশে রফতানিও করে।

ভারত প্রসঙ্গে একটি ব্যাপার লক্ষণীয় বলে মনে হয়– সোনা-রুপা পৃথিবীর অন্যান্য জায়গা ঘুরে এসে ভারতে পৌঁছায় এবং ভারতের গুপ্ত গহ্বরে উধাও হয়ে যায়। আমেরিকা থেকে যে সোনা বেরিয়ে এসে ইউরোপের নানা রাষ্ট্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে, তারই একটা অংশ নানা পথ ঘুরে শেষে তুরস্কে এসে জমা হয়– তুরস্কের পণ্যের বিনিময়ে। আরোও একটা অংশ স্মির্না ঘুরে ইরানে যায়, সেখানকার রেশমের বিনিময়ে। তুরস্ক কফি চালান দিতে পারে না, কারণ ইয়েমেনের কাছ থেকে সে নিজেই কফি আমদানি করে। ভারতীয় পণ্য তুরস্ক, ইয়েমেন ও ইরান সহ প্রতিটি দেশেরই দরকার। সুতরাং এ সব দেশ থেকে বেশ খানিকটা সোনা ভারত অভিমুখে যাত্রা করার জন্য লোহিত সাগরের বন্দরে, পারস্য সাগরের শীর্ষে থাকা বসরায় এবং বন্দর আব্বাসিতে গিয়ে জমা হয়। প্রত্যেক বছর যথাসময়ে নানা রকম পণ্য নিয়ে এই তিনটি বন্দরে

ভারতের জাহাজ এসে ভিড় করে এবং সে সব সোনা বোঝাই করে নিয়ে আবার ভারতে ফিরে যায়।

এ কথাও মনে রাখা দরকার, ভারতীয় জাহাজ, তা সে যারই হোক, ভারতের নিজের বা ডাচ, ইংরেজ ও পর্তুগীজদের– প্রত্যেক বছর যখন পণ্য বোঝাই করে নিয়ে ভারত থেকে বার্মা (মিয়ানমার), তেনাসেরিম, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, আচেম, মালদ্বীপ প্রভৃতি দেশে যায়, তখন সেই সব দেশ থেকে ফেরার সময় সোনা বোঝাই করে নিয়ে আসে। মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসির সোনার মতো এই সব সোনারও একই পরিণতি হয়।

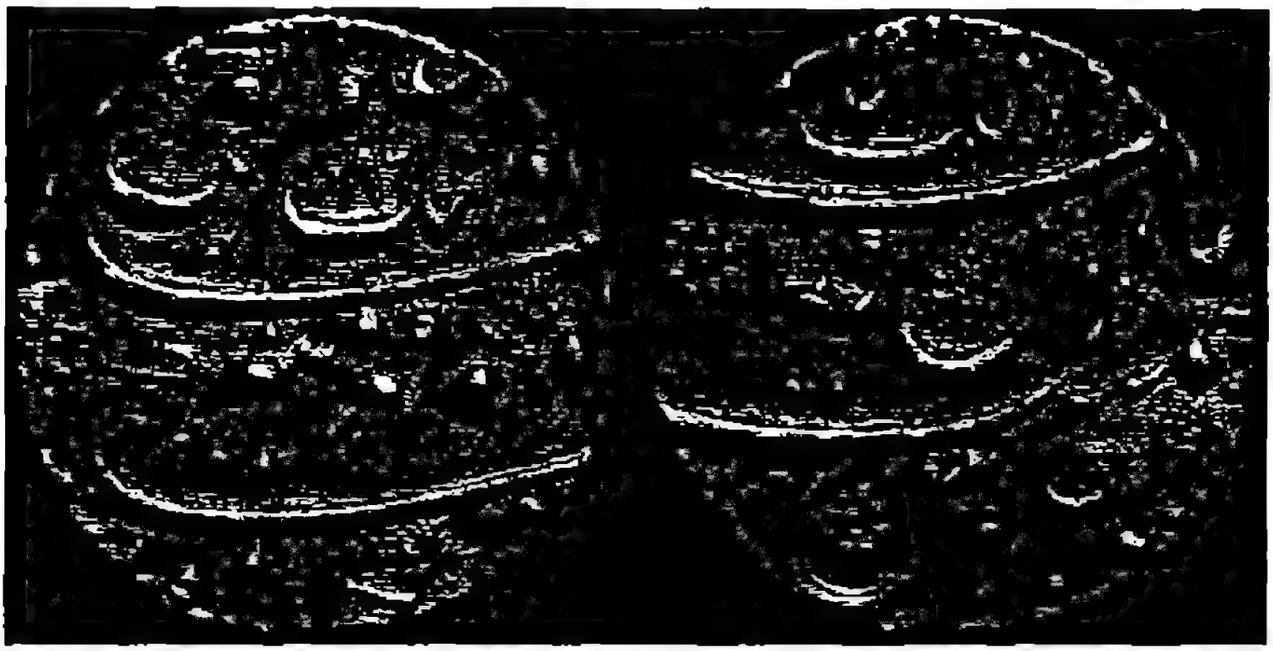

আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রা

ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপানীদের সঙ্গে ব্যবসা করে যে সোনা পেতো তা শেষপর্যন্ত ভারতে এসে জমা হতো। যা কিছু পর্তুগাল বা ফ্রান্স থেকে আসতো, তাও আর ফিরে যেতো না। তার বদলে ভারতের পণ্যদ্রব্য চালান যেতো। সারা দুনিয়ার সোনা-রুপার একটা মোটা অংশ বাণিজ্যের সুবাদে ভারতে এসে জমা হতো এবং একবার জমা হলে আর কোথাও ফিরে যেতো না, একেবারে মজুতদারের গুহায় আত্মগোপন করে থাকতো।

আমি যতোদূর জানি, ভারতের প্রয়োজন তামা, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি ইত্যাদি। এসব জিনিস ডাচ ব্যবসায়ীরা জাপান, মালাক্কা, শ্রীলঙ্কা ও ইউরোপ থেকে সরাবরাহ করে। বানাত এক ধরনের পশমি কাপড়।-অনবাদক।) আমদানি হয় ফ্রান্স থেকে। ভালো ভালো বিদেশী ঘোড়ারও খুব প্রয়োজন ভারতের। বছরে প্রায় পঁচিশ হাজার ঘোড়া শুধু উজবেকিস্তান থেকে আমদানি করা হয়। কান্দাহার, ইরান, মক্কা, বসরা ও বন্দর আব্বাসি থেকে সমুদ্রপথে আরবীয় ও হাব্‌সী ঘোড়াও অনেক আমদানি করা হয়। সমরকন্দ, বলখ্, বোখারা, ইরান থেকে টাট্‌কা ফলও প্রচুর পরিমাণে আসে। দিল্লীতে আপেল, নাসপাতি, আঙুর খুব বেশি দামে সারা শীতকাল ধরে বিক্রি হয়। শুকনো ফল–

যেমন বাদাম, পেস্তা ইত্যাদির চাহিদা খুব বেশি। এসব ফল বাইরে থেকে ভারতে আমাদানি হয়ে থাকে।

মালদ্বীপ থেকে সামুদ্রিক কড়ি প্রচুর আমদানি হয়, এবং এই কড়ি দিয়ে বাজারে কেনাবেচা চলে। বাংলাদেশে কড়ির চলন বেশি। অম্বরীও মালদ্বীপ থেকে আসে (যা তামাকের সঙ্গে মেশানো হয়)। গন্ডারের শিং, হাতির দাঁত ও ক্রীতদাস আমদানি হয় প্রধানত ইথিওপিয়া থেকে। মৃগনাভি ও পোর্সিলিন আসে চীন থেকে, মুক্তা আসে বাহরাইন থেকে (পারস্য সাগরের দ্বীপ বাহরাইন) এবং টিউটিকোরিন (মাদ্রাজের তিন্নেভেলি জেলার বন্দর) ও সিংহল (শ্রীলঙ্কা) সহ অন্যান্য স্থান থেকে নানা ধরনের জিনিস আমদানি করা হয়।

কিন্তু এতো রকমের পণ্যদ্রব্যের আমাদানি হলেও ভারতের প্রয়োজন হয় সোনা-রুপা চালান দেয়ার। কারণ ভারত অভিমুখে যাত্রা করার জন্য বণিকরা সোনা দিয়ে দাম না শোধ করে পণ্যের বিনিময়ে পণ্য দিতেই অভ্যস্ত। ভারতের এই বাণিজ্যিক বিশেষত্ব বাস্তবিকই উল্লেখযোগ্য। ভারতের বণিকরা পণ্যের পসরা নিয়ে জাহাজে করে দেশে-বিদেশে যায় এবং সেই জাহাজে তাল-তাল সোনা বোঝাই করে ভারতে ফিরে আসে। পণ্যের বদলে পণ্য দিয়ে তারা বাণিজ্যের ঋণ পরিশোধ করে। সাধারণত সোনা দিতে চায় না। তাই সব দেশের সোনা ভারতে এসে জমা হয়।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলা দরকার। ভারতের মোগল সম্রাট দেশের সমস্ত সম্পদের একমাত্র মালিক। দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মালিকানা দেশীয় প্রথা বা বিধিসম্মত নয়। আমির-ওমরাহ অথবা মনসবদার, যারা সম্রাটের অধীনে নিযুক্ত, তাদের যাবতীয় সম্পত্তি ও সম্পদের উত্তরাধিকারী হলেন সম্রাট নিজে। ভারতের প্রতি বিঘা জমির মালিক সম্রাট, চাষী বা জমিদার নয়! বসতবাড়ি, উদ্যান, দীঘি ইত্যাদির কয়েকটি ব্যক্তিগত সম্পত্তি মাঝেমধ্যে সম্রাট নিজের খেয়াল ও ইচ্ছা অনুযায়ী কোনো কোনো প্রিয়জনকে ভোগ করার জন্য দান করেন। এ ছাড়া 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি' বলে ভারতের রাষ্ট্রীয় বিধানে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই।

মোটকথা, ভারতে প্রচুর পরিমাণে সোনা-রুপা জমা আছে, যদিও সোনার খনি নেই। ভারতের সম্রাটই সমস্ত সম্পদ ও সম্পত্তির মালিক। উপঢৌকন তিনি অনেক পান এবং ধনদৌলত তাঁর অফুরন্ত। কিন্তু তাহলেও ভারত সম্পর্কে আরও কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে যা আমি আপনাকে জানানো প্রয়োজন বোধ করছি।

ভারতীয় রাজাদের কথা

প্রথমতঃ ভারত একটি বিশাল সাম্রাজ্যের মতো– এ কথা আগে বলেছি। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অনেকটা অংশ মরুভূমি, না হয় অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চল। এই

সব অঞ্চলে জমিজমার আবাদ তেমন ভালো হয় না এবং লোকজনের বসবাসও তেমন নেই। ভালো আবাদী জমি আছে, তারও বেশ খানিকটা অংশ লোকাভাবে পতিত থাকে, চাষ হয় না। আবাদ করে যারা ফসল ফলায় সেই চাষীদের অবস্থা ভারতে খুবই শোচনীয়। সুবাদার ও অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তারা মানুষের মতো ব্যবহার পায় না। উচ্চপর্যায়ের কর্তারা সকলেই তাদের ওপর নির্মম অত্যাচার করে এবং এই অত্যাচারের জ্বালায় অনেক সময় চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। সাধারণত নগরের দিকে তারা পালাবার চেষ্টা করে এবং সেখানে গিয়ে বোঝা বয়, ভিস্তির বা ঘোড়ার সহিসের কাজ করে। মধ্যে মধ্যে কোনো রাজার (বার্নিয়ার বোধ হয় এখানে দেশীয় হিন্দু সামন্ত রাজাদের কথা বলতে চেয়েছেন) রাজ্যে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কারণ তাদের ধারণা, সম্রাটের রাজত্ব ছেড়ে কোনো দেশীয় রাজার রাজ্যে গেলে অনেক বেশি সুখস্বচ্ছন্দে থাকা যাবে। দেশীয় রাজারা নাকি প্রজাদের উপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার করেন না।

দ্বিতীয়তঃ মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে একাধিক জাতির বসবাস রয়েছে এবং সমস্ত জাতির সর্বময় কর্তা হলেন মোগল সম্রাট। এই সব জাতির অনেকেরই নিজেদের প্রধান, নায়ক বা রাজা আছে। প্রধান ও রাজারা মোগল সম্রাটকে 'কর' দেন নামমাত্র। তাও আবার সকলে দেন না। কাউকে দিতে হয়– কাউকে দিতে হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'পেশ্ কস্' বা কর দেয়াটা অতি নগণ্য ব্যাপার। সম্রাটের কাছে বশ্যতা স্বীকারের সঙ্গে এর বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই। আবার এমনও দু'-চারজন রাজা আছেন যারা কর দেন না, বরং উল্টো সাহায্য সহযোগিতা আদায় করেন। তাদের কথাও বলবো।

যেমন ইরানের সীমান্তে যে সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য আছে তারা কাউকেই কিছু দেয় না। ইরানের শাহানশাহকেও না– মোগল সম্রাটকেও না। বেলুচি ও আফগানরা তো সম্রাটকে কিছুই দেয় না এবং নিজেদের সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে মনে করে।

মোগল সম্রাট যখন কান্দাহার অবরোধ করার জন্য সিন্ধু থেকে কাবুল অভিযান করেছিলেন তখন এই সব বেলুচি ও আফগানদের ঔদ্ধত্য ও গর্বিত আচরণ থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা গেছে। পাহাড় থেকে ঝরনাধারা সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তারা সেনাবাহিনীর অভিযান একরকম স্তব্ধ করে দিয়েছিলো এবং শেষে পুরস্কার আদায় করে তবে ছেড়েছে।

পাঠানরাও খুব দুর্ধর্ষ। একসময় তারাও ভারতে রাজত্ব করেছে, বিশেষ করে বাংলাদেশে তাদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মোগলরা ভারতে অভিযান করার আগে পাঠানরা ভারতের অনেক জায়গায় শক্ত ঘাঁটি তৈরি করে বসে ছিল। প্রধানত তাদের শাসনকেন্দ্র ছিল দিল্লী এবং আশপাশের প্রতিবেশী রাজারা

(হিন্দু রাজা) পাঠানদের করও দিতেন। ভারত মোগলদের অধিকারে আসার পরেও পাঠানরা সহজে আত্মসমর্পণ করেনি। তারা বিভিন্ন স্থানে রীতিমতো শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করেছিল এবং দীর্ঘদিন ধরে মোগলদের নানাভাবে নাজেহাল করে তাদের অভিযান প্রতিরোধ করেছিলো। মোগল আমলে তাই পাঠানরা তাদের সেই স্বাধীন রাজ্য পরিচালনার কথা সহজে ভুলে যেতে পারেনি। জাত হিসাবেও তাই তারা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ ও স্বাধীনতাপ্রিয়। এমন কি পাঠান ভিস্তি ও অন্যান্য দাসানুদাসরা আচার-ব্যবহারে রীতিমতো ঔদ্ধত্য।*

পাঠানরা প্রায় কথায় কথায় বলে যে, একদিন তারা আবার দিল্লীর সিংহাসন দখল করবে। ভারতের প্রত্যেক লোককে, সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক, তারা মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। তারা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে মোগলদের। কারণ মোগলরাই তাদের দিল্লীর সিংহাসনচ্যুত করে দেশ থেকে দূরে পাহাড়ের কোলে তাড়িয়ে দিয়েছিলো। এই সব পাহাড় অঞ্চলে পাঠানরা এখনও স্বাধীনভাবে বসবাস করে, তাদের নিজেদের প্রধান ও অন্যান্য সুলতানদের অধীনে। কারো কোনো হুকুম তারা মানতে চায় না, কারো বশ্যতা স্বীকার করতে চায় না। অবশ্য স্বাধীন রাজ্য হিসাবে তারা যে খুব ক্ষমতাশালী, তাও নয়।

বিজাপুরের রাজাও মোগল সম্রাটকে কোনো কর দেন না এবং তাঁর সঙ্গে সম্রাটের সংঘর্ষ প্রায় লেগেই থাকতো। তিনি তাঁর সৈন্যবলের জন্য যতোটা না শক্তিশালী, তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী অন্যান্য কারণে। আগ্রা ও দিল্লী থেকে তাঁর রাজ্য অনেক দূরে। মোগল সম্রাটের শাসনকেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর রাজ্যের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই। বিজাপুর রাজধানী অন্য কারণেও অনেকটা নিরাপদ বলা চলে। পানির ব্যবস্থা খুব খারাপ এবং সৈন্যদের কুচকাওয়াজের উপযোগী বিশেষ খোলা জায়গাও নেই। অনেকটা দুর্গের মতো রাজার রাজধানী। এ কারণে অন্যান্য রাজারাও যুদ্ধবিগ্রেহের সময় বিজাপুর রাজার সঙ্গে যোগ দেন, শুধু ঐ রাজধানীর নিরাপত্তার জন্যে। সুরাট বন্দর লুটতরাজ করার পর ছত্রপতি শিবাজীও তাই করেছিলেন।

রাজপুতদের শৌর্যবীর্য

গোলকুন্ডার রাজাও খুব শক্তিশালী। এরা বিজাপুররাজের মিত্র। বিজাপুরের রাজাকে তিনি গোপনে অর্থ ও সৈন্যসামন্ত দিয়ে সাহায্য করেন। এ রকম

---

* দিল্লীর পাঠান সুলতানরা ১১৯২ সাল থেকে ১৫৫৪ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। প্রায় সাড়ে তিনশো বছর রাজত্বকালের মধ্যে ছয়টি রাজবংশ ও চল্লিশজন সুলতান রাজত্ব করেন। কখনো তাঁদের রাজ্যের সীমানা বাংলাদেশের প্রান্ত থেকে কাবুল কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কখনও বা তাঁরা কয়েকটি জেলার অধীশ্বর ছিলেন মাত্র।– অনুবাদক।

আরও শত শত রাজ-রাজড়া ও জমিদার আছেন যাঁরা সম্রাটকে কোনো রকম কর দেন না এবং প্রায় স্বাধীনভাবে তাঁদের নিজস্ব রাজ্য ও এলাকায় প্রভুত্ব করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই বেশ শক্তিশালী, নিজেদের সৈন্যসামন্তও তাঁদের আছে এবং স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তিও তাঁদের যথেষ্ট। আগ্রা ও দিল্লী থেকে কেউ কাছে, কেউ দূরে থাকেন। এঁদের মধ্যে পনেরো-ষোলজন রাজার ধন ঐশ্বর্য ও সামরিক শক্তি খুব বেশি, বিশেষ করে চিতোরের রানা, রাজা জয়সিং ও রাজা যশোবন্ত সিংয়ের। এই তিনজন রাজা যদি একবার হাত মিলিয়ে একত্রে কোনো অভিযান করার সংকল্প করেন তাহলে মোগল সম্রাটের সিংহাসন তাঁরা টলিয়ে দিতে পারেন। এরকম দুর্ধর্ষ তাঁদের শক্তি। প্রত্যেক রাজা ইচ্ছা করলে প্রায় বিশ হাজার ঘোড়সওয়ার রাজপুত সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে মোতায়েন করতে পারেন এবং সারা ভারতে কোথাও তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মোগল আমলে রাজপুত সৈনিক

রাজপুত ঘোড়সওয়ারদের শৌর্যবীর্যের কথা ভারতের কারো অজানা নেই। এই রাজপুত সৈন্যদের কথা পরে আরোও বিশাদভাবে বলবো।

রাজপুতরা পুরুষানুক্রমে যোদ্ধার জীবন যাপন করে। রাজার কাছ থেকে জমিজমা, জায়গীর পায় এবং বংশানুক্রমে রাজার অধীনে সৈনিকের কাজের বিনিময়ে সেই জায়গীর ভোগ করে।

যুদ্ধ ও বীরত্ব তাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। এরকম কষ্টসহিষ্ণু ও নির্ভীক জাতি ভারতে খুব অল্পই দেখা যায়। সৈন্য বা যোদ্ধা হিসেবে তাদের সমকক্ষ বিশেষ কেউ নেই। তৃতীয়ত—মোগল সম্রাট মুসলমান হলেও 'সুন্নী'

সম্প্রদায়ভুক্ত। তুর্কীদের মতো তাঁরা বিশ্বাস করেন যে হযরত ওসমান (রা.) হলেন হযরত মোহাম্মদের (সা.) উত্তরাধিকারী।

সম্রাটের পার্ষদ ও সভাসদরা, আমির ও ওমরাহরা হলেন অধিকাংশই 'সিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা হযরত আলির (রা.) উত্তরাধিকারে বিশ্বাসী, ইরানীদের মতো। তা ছাড়া মোগল সম্রাট ভারতে অনেকটা বিদেশীদের মতো বলা চলে। তাঁরা তৈমুরের বংশধর এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে তাঁরা ভারতবর্ষ জয় করেন। সুতরাং মোগলরা ভারতে চারদিকেই শত্রু পরিবেষ্টিত। ভারতের একশতজন ভারতীয়দের মধ্যে একজন খাঁটি 'মোগল' আছে কি না সন্দেহ। শতকরা একজন মুসলমান আছে কি না সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। সুতরাং ভারতে নিরাপদে রাজত্ব করা ও বসবাস করা মোগলদের কাছে একটা সমস্যার ব্যাপার। ঘরে শত্রু– বাইরেও শত্রু। ঘরে দেশীয় রাজারা প্রবল শত্রু, বাইরে ইরান থেকে আক্রমণের আশঙ্কাও আছে। ঘরে-বাইরে এভাবে শত্রু পরিবেষ্টিত হয়ে থাকার জন্য মোগল-সম্রাটরা সর্বদা নিরাপত্তার ও আত্মরক্ষার দুশ্চিন্তাতেই ব্যস্ত থাকেন। এ জন্য তাঁদের বিশাল সেনাবাহিনী সব সময় প্রস্তুত রাখতে হয়। সঙ্কটের সময় তো হয়ই, শান্তির সময়ও হয়।

এ দেশের মানুষদের নিয়েই সেনাবাহিনী গঠন করা ছাড়া উপায় নেই। তার মধ্যে অধিকাংশই রাজপুত ও পাঠান এবং বাকিরা মোগল সৈন্য। এখানে 'মোগল' কথাটা অবশ্য একটা বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। যে কোনো শ্বেতাঙ্গ বিদেশী ব্যক্তি ইসলামধর্মী হলেই তিনি 'মোগল' বলে পরিচিত হন। আসল 'মোগল' কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমই আছে। রাজদরবারেও বিশেষ নেই। উজবেক, ইরানী, আরবীয়, তুর্কী, সকলেরই বংশধররা এখন 'মোগল' নামে অভিহিত হয়। এ প্রসঙ্গে এ কথাও জেনে রাখা দরকার, এইসব তথাকথিত 'মোগল'রা এ দেশে কিছুদিন বসবাস করার পর আর তেমন মর্যাদা পায় না। তাদের বংশধররা অনেকটা এ দেশী হয়ে যায়। সম্রাটের কাছে তাদের 'মোগলাই' মর্যাদার জৌলুষও অনেক ম্লান হয়ে যায় এবং নবাগত বিদেশী মুসলমানরা মোগলাই আভিজাত্যের তক্‌মা এঁটে ঘুরে বেড়ায়। দু-তিন পুরুষের মধ্যে তথাকথিত 'মোগল'দের বংশধররা এমন এক পর্যায়ে নেমে আসে যে, তখন মোগল সেনাবাহিনীতে সামান্য পদাতিক বা ঘোড়সওয়ার হতে পারলেই তাঁরা কৃতার্থ বোধ করে। এই হলো মোগলদের পরিচয়।

এবার মোগল সেনাবাহিনী সম্পর্কে আপনাকে দু'চার কথা লিখবো। কি পরিমাণ অর্থব্যয় যে সৈন্যদের জন্য করা হয়, তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। প্রথমে ভারতীয় সৈন্যদের কথা বলি।

ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য হলো জয় সিং এবং যশোবন্ত সিংয়ের রাজপুত সৈন্য। এ দুজন এবং অন্য আরও রাজাদের মোগল সম্রাট

যথেষ্ট টাকা দেন। টাকা দিয়ে তাঁদের সৈন্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট একটা সংখ্যাকে নিজের কাজের জন্য নিযুক্ত রাখেন। অর্থাৎ রাজারা মোগল সম্রাটের অর্থের বিনিময়ে রাজপুত সৈন্য দিয়ে যুদ্ধবিগ্রহের সময় তাঁকে সাহায্য করেন। অর্থ অনুপাতে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। বিদেশী ও মুসলমান ওম্‌রাহদের সমান মর্যাদা রাজারা পান। ওমরাহদের অধীনেও নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য থাকে এবং সেই সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী তারা জায়গীর ও বেতন পান। একাধিক কারণেই এই দেশীয় রাজাদের এভাবে হাতে রাখার দরকার হয়।

প্রথম কারণ হলো, রাজপুতরা সৈনিক হিসেবে চমৎকার। তাদের বীরত্বের তুলনা হয় না। আগেই বলেছি, এই রাজারা ইচ্ছা করলে একদিনে প্রত্যেকে বিশ হাজারেরও বেশি সৈন্য মোতায়েন করতে পারেন।

দ্বিতীয় কারণ, এই রাজারা প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের রাজ্য শাসন করেন। তারা কেউ মোগল সম্রাটের বেতনভুক্ত নন, কোনো হুকুমের ধার ধারেন না। 'কর' দিতে বললেও তাঁরা যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ধারণ করেন এবং যুদ্ধে যোগ দিতে বললে আদেশ আগ্রহ্য করেন। এমন মানসিকতায় পুষ্ট রাজাদের যদি ফিকির-ফন্দি করে কিছুটা আয়ত্তে রাখা যায়, তাহলে মোগল সম্রাটের তাতে সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হবার কথা নয়।

তৃতীয় কারণ হলো, এই রাজাদের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি করতে পারলে মোগল সম্রাটের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধা। তাঁর রাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্যও তাই। তিনি সব সময় চেষ্টা করেন দেশীয় রাজাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতে। একজন রাজাকে বেশিমাত্রায় তোষণ করে, উপঢৌকন দিয়ে অন্যান্য রাজাদের বিদ্বেষভাব জাগিয়ে তোলেন। রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে এই বিদ্বেষ থেকে, তাঁদের সৈন্যক্ষয় ও ধনক্ষয় হয় এবং তাঁরা দুর্বল হয়ে যান। তাতে মোগল সম্রাটের শক্তি ও নিরাপত্তা বাড়ে। এ কারণেও অনেক সময় মোগল সম্রাট দেশীয় নৃপতিদের দলভুক্ত করার চেষ্টা করেন।

চতুর্থ কারণ, এই দেশীয় রাজারা দলে থাকলে পাঠানদের জব্দ করার সুবিধা হয় এবং বিদ্রোহী ওম্‌রাহদের জব্দ করা যায়।

পঞ্চম কারণ হলো, গোলকুন্ডার রাজা যখন কর দিতে চান না অথবা বিজাপুর বা অন্যান্য প্রতিবেশী রাজাদের মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সাহায্য করতে চান, তখন এই দেশীয় রাজাদের পাঠানো হয় তাকে জব্দ করার জন্য। সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত ওমরাহদের পাঠাতে সম্রাট ভরসা পান না।

ষষ্ঠ কারণ, ইরানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে এই দেশীয় রাজাদের ওপর মোগল সম্রাট সবচেয়ে বেশি নির্ভর করেন। তার কারণ, তাঁর ওমরাহরা অধিকাংশই ইরানী এবং তারা নিজেদের দেশের রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে রাজি হন না। তাদের ইমাম বা খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তাঁরা

কাফেরের হীন কাজ বলে মনে করেন। সুতরাং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহে মোগল সম্রাটের পক্ষে এই দেশীয় রাজাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। এ কারণেও রাজাদের স্বপক্ষে রাখার দরকার হয়।

মোগল সম্রাট যে কারণে রাজপুতদের স্বপক্ষে রাখতে বাধ্য হন, অনেকটা সেই একই কারণে পাঠানদেরও তিনি নিজের দলে রাখতে চান। এ ছাড়া বিশাল মোগল সেনাবাহিনীও তাঁকে নিযুক্ত রাখতে হয় এবং তার জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করতেও তিনি বাধ্য হন। এই সেনাবাহিনীরও কিছুটা পরিচয় দিচ্ছি।

প্রধানত পদাতিক ও ঘোড়সওয়ার সৈন্য নিয়ে এই সেনাবাহিনী গঠিত। একদল সৈন্য সব সময় সম্রাটের নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁর কাছেই রাখা হয়, আর বাকি সৈন্যরা বিভিন্ন প্রদেশে সুবাদারদের অধীনে ছড়িয়ে থাকে।

ঘোড়সওয়ার সৈন্যের মধ্যে সম্রাটের নিজস্ব প্রয়োজনের জন্য যারা তৈরি থাকে তাদের কথা প্রথমে বলি।

এই ঘোড়সওয়াররা ওমরাহ, মনসবাদ, রৌশিনদার প্রভৃতির অধীনে বহাল থাকে। ঘোড়সওয়ার সৈন্য ছাড়াও পদাতিক সৈন্য আছে এবং গোলন্দাজ বাহিনীর মধ্যে পদাতিক গোলন্দাজ ও ঘোড়সওয়ার গোলন্দাজ আছে। তাদের কথাও একে একে জানাবো।

এ কথা ভাববেন না যে, রাজদরবারের ওমরাহরা বনেদী পরিবারের বংশধর– ফ্রান্সের অভিজাতশ্রেণির মতো। আদৌও তা নয়। ভারতের সম্রাটই যেহেতু সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারী, সে জন্য সেখানে ইউরোপের মতো 'লর্ড' বা 'ডিউক'রা গজিয়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। বিরাট কোনো সম্পত্তির মালিকানাস্বত্ব বংশপরম্পরায় ভোগ করে কোনো পরিবার ভারতে প্রচুর পরিমাণ ধন সঞ্চয় করার সুযোগ পায় না। সম্রাটের সভাসদরা সবাই ওমরাহদের বংশধরও নন। সম্রাট সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী বলে কোনো ওমরাহের মৃত্যু হলে তার ধন-সম্পত্তির মালিক হন সম্রাট। আমির পরিবারের আভিজাত্য একপুরুষ, কি দুইপুরুষের মধ্যেই শেষ হয়ে যায় এবং তার পুত্র বা পৌত্ররা প্রায় ভিক্ষান্নজীবীর পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য হয়। তখন তারা সম্রাটের সেনাবাহিনীতে সাধারণ ঘোড়সওয়ার সেনাদলে নাম লেখান। সম্রাট অবশ্য সাধারণত মৃত আমিরের পত্নী ও সাবালকদের একটা ভাতার বন্দোবস্ত করে দেন, কিন্তু সেটা আমিরী আভিজাত্য অক্ষুণ্ন রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয়। আর যদি কোনো আমির সৌভাগ্যক্রমে দীর্ঘায়ু হন তাহলে তার জীবদ্দশায় তিনি চেষ্টা করে হয়তো পুত্রদের জন্য একটা ভালো ব্যবস্থা করে দিয়ে যেতে পারেন। সেটা আর কিছু নয়, সম্রাটের সুনজরে এনে পুত্রদের কোনো যোগ্য পদে বহাল করে যেতে পারা। কিন্তু সে রকম ব্যবস্থা করে যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাও আবার তার জন্য পুত্রটির সুদর্শন শ্রী থাকা দরকার, যাতে তাকে

দেখলে বনেদী মোগল বংশজাত বলে মনে হয়। তা না হলে সম্রাটের নেকনজরে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। সাধারণত সম্রাট হঠাৎ কাউকে কোনো উচ্চপদের বহাল করতে চান না।

সাধারণ পর্যায় থেকে সকলকে ধীরে ধীরে উচ্চপর্যায়ে উঠতে হয়। এই জন্য দেখা যায় মোগল দরবারের ওমরাহরা সকলে বনেদী বংশের সন্তান নন। কারণ বংশানুক্রমে আমিরী মর্যাদা ভোগ করা ভারতে খুব কম ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হয়। সাধারণত ওমরাহরা বিদেশী ভাগ্যান্বেষীর দল এবং অধিকাংশই অনভিজাত বংশজ। প্রায়ই দেখা যায় তারা ক্রীতদাসপুত্র এবং তাদের মাঝে শিক্ষা-দীক্ষার কোনো বালাই নেই। সে জন্য সম্রাট নিজেই মর্জিমাফিক তাদের পদমর্যাদায় ভূষিত করতে পারেন এবং টেনে নামিয়েও দিতে পারেন। মান-অপমানবোধ তাদের বিশেষ নেই।

ওমরাহদের কথা

ওম্‌রাহরা কেউ 'হাজারী', কেউ 'দু হাজারী', কেউ 'পাঁচ হাজারী', কেউ 'সাত হাজারী', কেউ 'দশ হাজারী' ইত্যাদি পদমর্যাদা বিশিষ্ট। হাজার ঘোড়ার অধিনায়ক যিনি তিনি হাজারী, দু হাজার ঘোড়ার যিনি তিনি দু হাজারী ইত্যাদি। হাজারী, দু হাজারী, পাঁচ হাজারী ইত্যাদি শব্দ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। দ্বাদশ হাজারীও কেউ কেউ আছেন, যেমন সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র। সৈন্যসংখ্যার অনুপাতে ওমরাহরা বেতন পান না, বেতন পান ঘোড়ার সংখ্যা অনুপাতে। যিনি যতোগুলো ঘোড়ার মালিক, তার বেতনও সেই অনুপাতে ধরা হয়। সাধারণত একজন সৈন্যের জন্য দুটি করে ঘোড়া বরাদ্দ থাকে। কথায় বলে, যার একটি মাত্র ঘোড়া, তার এক পা নাকি মাটিতেই থাকে। কিন্তু ওমরাহরা যে তাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী ঘোড়া পোষেণ, তা ভাবার কোনো কারণ নেই। যিনি যতো হাজারী– সম্রাট তাকে সেই অনুপাতে বেতন দেন, এ কথা আগেই বলেছি। সৈন্যদের বেতন বাবদও তিনি বরাদ্দ টাকা পান। সেই টাকার বেশিটা তিনি নিজে আত্মসাৎ করেন। তা ছাড়া যতোগুলো ঘোড়া তার পদমর্যাদা অনুযায়ী রাখার কথা তা তিনি রাখেন না। ঘোড়ার রেজিস্টার বা খাতায় অবশ্য নির্দিষ্ট সংখ্যাটি ঠিকই লেখা থাকে এবং সেই ঘোড়ার খরচ বাবদ তার প্রাপ্য তিনি আদায়ও করে নেন। ঘোড়ার বদলে বরাদ্দ টাকা তিনি নিজেই ভোগ করেন। কেউ কেউ নগদ টাকার বদলে জায়গীরও ভোগ করেন। অবশ্য বাইরে থেকে 'হাজারী' খিলাতের হাঁকডাক যতোটা, আসলে তার অনেকটাই ফাঁকা বুলি। দু হাজারী যিনি, তার হয়তো আসলে দুশো ঘোড়া রাখার অধিকার আছে। সেই দুশো ঘোড়ার ভরণপোষণের খরচ তিনি পান। তা থেকে যথেষ্ট উদবৃত্ত টাকা নিজে আত্মসাৎ করেন।

আমি যে আমিরের অধীনে কাজ করতাম, তিনি একজন 'পাঁচ হাজারী', কিন্তু তার পাঁচশো ঘোড়া পোষার হুকুম ছিল। এই পাঁচশো ঘোড়ার বরাদ্দ টাকা থেকেও তিনি মাসে পাঁচ হাজার ক্রাউন আত্মসাৎ করতেন। তবু তো তিনি জায়গীর ভোগী ছিলেন না, নগ্‌দী ছিলেন। অর্থাৎ, নগদ টাকায় তার বেতন দেয়া হতো। জায়গীর ভোগীদের উপরি আয়ের যথেষ্ট সুযোগ থাকে, প্রচুর আয় তারা করেনও। কিন্তু নগ্‌দীদের সে সুযোগ খুব কম থাকে। তবু তা থেকেও তারা অল্প ঘোড়া পুষে, খাতাপত্রে ঘোড়ার হিসেব ঠিক দেখিয়ে যথেষ্ট উদবৃত্ত টাকা আত্মসাৎ করেন।

এতো আয়ের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ওমরাহদের মধ্যে ধনী খুব অল্পই আমার নজরে পড়েছে। আমি যাদের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম, তাদের মধ্যে অধিকাংশই দেনার দায়ে জর্জরিত। অন্যান্য দেশের লর্ড বা ডিউকদের মতো তারা যে নিজেদের ভোগবিলাসের জন্য এরকম দুরবস্থার মধ্যে পড়েছেন, তা নয়। অধিকাংশ ওমরাহের শোচনীয় দুর্দশার কারণ হলো, বছরে একাধিক উৎসব-পার্বণে তাদের সম্রাটকে ভেট দিতে হয় এবং তার জন্য বেশ মোটা টাকা ব্যয় হয়ে যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ ওমরাহকে বহুসংখ্যাক স্ত্রী, চাকরবাকর, উট, ঘোড়া ইত্যাদি পালন করতে হয়। প্রধানত এই দুই কারণে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যান।

বিভিন্ন প্রদেশে, সেনাবাহিনীতে ও রাজদরবারে যথেষ্ট ওমরাহ আছেন। তাদের সংখ্যা ঠিক কতো, তা আমি বলতে পারবো না। তবে সংখ্যা সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু নেই। রাজসভার ওমরাহের সংখ্যা পঁচিশ থেকে ত্রিশজনের মধ্যে, তার বেশি নয়। সকলেই প্রায় মোটা টাকা আয় করেন এবং আয়ের মাত্রা তাদের ঘোড়ার সংখ্যার ওপর নির্ভর করে। ঘোড়ার সংখ্যা এক হাজার থেকে বারো হাজার পর্যন্ত হতে পারে। এই ওমরাহরাই হলেন রাষ্ট্রের সবচেয়ে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি। বড় বড় রাজকার্যের দায়িত্ব ও রাজকীয় মর্যাদা তারাই পান। রাজসভায়, প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে তারাই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। ওমরাহদের মোগল সাম্রাজ্যের স্তম্ভ বলা যায়। তারা রাজদরবারে জাঁকজমক বজায় রেখে চলেন, পথেঘাটে সাধারণের মধ্যে তাদের চলাফেলা করতে দেখা যায় না।

বাইরে যখন তারা যান তখন রাজকীয় পোশাকে সুসজ্জিত হয়ে যান। জমকালো পোশাক দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। কখনো যান হাতির পিঠে চড়ে, কখনো বা ঘোড়ার পিঠে। পালকিতে চড়েও যেতে দেখা যায়। যখন যেভাবেই যান না কেন, বাইরে যাবার সময় তাদের সঙ্গে একদল ঘোড়সওয়ার সৈন্য থাকে। তা ছাড়া একদল চাকর তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। আগে যায় একদল পথের লোকজন সরাতে সরাতে, ময়ূরপুচ্ছ দিয়ে মশা-মাছি ধুলো

ঝাড়তে ঝাড়তে। দুই পাশে যায় দুই দল চাকর, কেউ পিকদানী, কেউ খাবার পানি, কেউ হিসেবের খাতা ইত্যাদি নিয়ে। এভাবে ওমররাহরা পথে চলেন।

প্রত্যেক আমিরকে প্রত্যহ দুবার করে রাজদরবারে হাজিরা দিতে হয়। একবার বেলা দশটা-এগারোটার সময়, সম্রাট যখন বিচার করতে বসেন, আর একবার সন্ধ্যা ছ'টায়। প্রত্যেক আমিরকে সপ্তাহে অন্তত পুরো একদিন (২৪ ঘণ্টা) পালাক্রমে দুর্গ পাহারা দিতে হয়। যাঁর যখন পাহারা দেবার পালা পড়ে তিনি তখন নিজের যাবতীয় আসবাবপত্র, বিছানা সঙ্গে করে নিয়ে যান। সম্রাট শুধু তাদের আহারের ব্যবস্থা করেন। নিচে মাটিতে হাত ঠেকিয়ে, ধীরে ধীরে সেই হাত উপরে তুলে 'তছলিম' করে তিনি সম্রাটের সেই প্রেরিত খাদ্য গ্রহণ করেন। মাঝেমধ্যে সম্রাটের বিলাসভ্রমণে যান, পালকি করে হাতির পিঠে বা তখৎ রওয়ানে চড়ে। তখৎ রওয়ান ভ্রাম্যমাণ সিংহাসন, সম্রাটের ভ্রমণের জন্যই তৈরি করা। আটজন বেহারা তখৎ কাঁধে করে ছুটে চলে আর আটজন সঙ্গে থাকে প্রয়োজন মতো কাঁধ বদলাবার জন্য।

সম্রাট যখন ভ্রমণে যাবেন তখন ওমরাহরাও তাঁর সঙ্গে যাবেন, এই হলো প্রথা। অসুস্থতা, বার্ধক্য বা অন্য কোনো বিশেষ কারণ ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারবেন না। সম্রাট পালকিতে, হাতির পিঠে বা তখৎ রওয়ানে চড়ে যাবেন, ওম্‌রাহরা ঘোড়ায় চড়ে তাঁর অনুগমন করবেন। ঝড়-বাদল-ধুলো উপেক্ষা করেই তাদের যেতে হবে। সব সময় সম্রাট চারদিকে প্রহরীবেষ্টিত হয়ে বাইরে চলবেন, তা শিকারের সময়ই হোক, যুদ্ধযাত্রার সময় হোক বা নগর থেকে নগরান্তের যাত্রাকালেই হোক।

যখন সম্রাট রাজধানীর কাছাকাছি কোথাও শিকারে, বাগানবাড়ি বা প্রমোদভবনে যান, অথবা মসজিদে যান, তখন খুব বেশি আমির ওমরারহ, সাঙ্গোপাঙ্গ দাসদাসী নিয়ে যান না। সেদিনে যে ওমরাহদের পাহারা দেয়ার পালা পড়ে, শুধু তাদেরই তখন সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়।

মনসবদারের মর্যাদা

মনসবদাররা* ঘোড়া রাখতে পারেন এবং তারাও বেতন পান। পদমর্যাদা তাদেরও আছে, বেতনও তাদের অল্প নয়। ওমরাহদের সমান বেতন না হলেও সাধারণ কর্মচারীদের চেয়ে তারা অনেক বেশি বেতন পান। সে জন্য মনসব-দারদের ক্ষুদে ওমরাহ বলা হয়। সম্রাট ছাড়া তারা আর কারো অধীন নন এবং ওমরাহদের মতো তাদেরকেও কয়েকটি নির্দিষ্ট রাজকর্তব্য পালন করতে হয়।

---

* আরবী ও ফার্সী ভাষায় 'মসনব' শব্দটির অর্থ office বা 'পদ'। 'মনসবদার' কথার অর্থ অফিসার' বা পদস্থ কর্মচারী। সম্রাট আকবর মনসবদারের সংখ্যা ৬৬ জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন।– অনুবাদক।

ঘোড়া রাখার অধিকার থাকলে তারা স্বচ্ছন্দে ওমরাহদের সমকক্ষ হতে পারতেন। আগে এ অধিকার তাদের ছিল, এখন তাদের দুটি, চারটি বা ছ'টি ঘোড়া রাজকীয় মর্যাদার প্রতীক রূপে রাখার অধিকার আছে।

মনসদারদের বেতন মাসিক দেড়শো টাকা থেকে সাতশো টাকা পর্যন্ত। তাদের সংখ্যাও নির্দিষ্ট নয়, তবে ওমরাহদের চেয়ে অনেক বেশি। বিভিন্ন প্রদেশে ও সেনাবাহিনীতে মনসবদার অনেক আছেন, রাজদরবারেও তাদের সংখ্যা দু-তিনশোর কম নয়।

রৌজিনদার বা পদাতিক

রৌজিনদাররাও পদাতিক বাহিনীর অন্তর্গত। যারা রোজ বেতন পায় তাদেরই 'রৌজিনদার' বলে। রোজ বেতন পেলেও তাদের বেতন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মনসবদারদের চেয়ে বেশি। বেতন ও পদমর্যাদা অবশ্য অন্য রকমের, সম্মান বা মর্যাদার দিক দিয়ে মনসবদারদের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

রাজপ্রাসাদে ব্যবহৃত কার্পেট বা অন্যান্য আসবাবপত্র যা পরবর্তী সময় মনসবদাররা ব্যবহারের সুযোগ পায়, রৌজিনদাররা তা পায় না। এই সব আসবাবপত্রের সম্মানমূল্য অনেক সময় যথেষ্ট বেশি ধার্য করা হয়। রৌজিনদাররা সংখ্যায় অনেক বেশিও। সম্রাটের দফরতরখানায় তারা নানা ধরনের ছোটখাটো কাজকর্মে নিযুক্ত থাকে। কেরানীর কাজও অনেকে করে। অনেকে সম্রাটপ্রদত্ত বরাতের উপর দস্তখতের ছাপ দেয়ার কাজ করে। 'বরাত' হলো টাকা দেবার আদেশপত্র।[১] এইসব বরাত দেয়ার সময় তারা উৎকোচ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করে না।

---

১. 'বরাত' আধুনিককালের `pay order'-এর মতো একটি পমাণপত্র। ঠিক একালের ব্যাঙ্কের চেকের মতো না হলেও, 'বরাত'কে অনেকটা মোগল যুগের চেকও বলা যায়। কি কাজের জন্য কতো টাকা দেয়া হচ্ছে, বরাতে তা লেখা থাকতো এবং সম্রাটের স্বাক্ষরসহ মোহরাঙ্কিত থাকতো প্রত্যেকটি 'বরাত'। অনেক হাত ঘুরে, অনেক কর্মচারীর স্বাক্ষর-চিহ্নিত হয়ে তবে বরাতের বিনিময়ে নগদ টাকা পাওয়া যেতো।

'বরাত' সম্বন্ধে 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, সম্রাটের কারখানার কারিগর এবং পিলখানা, অশ্বশালা, উষ্ট্রশালা ইত্যাদি বিভাগের কর্মচারীদের বরাতের মারফত বেতন দেয়া হতো। বরাতের হিসেব দেখে দেওয়ান তন্‌খার ব্যবস্থা করে দিতেন এবং পাশে লিখে দিতেন 'বরাত'-নবীসন্দ'। মুস্তফী মুলরেফ তাই দেখে একটি 'কবচ' তৈরি করে দিতেন।

'কবচ' শব্দটি ফার্সী, অর্থ হলো হাতের তালু। কবচ থেকে কব্জা শব্দটি এসেছে। কবচপত্র পেলে বোঝা গেল, উদ্দেশ্য হস্তগত হয়েছে। 'কবচ' কতো কটা 'প্রমিসারী নোট' ও 'রসিদে'র সংমিশ্রণ বলা চলে। এক সময় জমিদাররা 'কবচ' বা দাখিলা দিতেন, কিন্তু মোগল আমলে কবচ একালের গভর্নমেন্ট নোটের মতো ব্যবহৃত হতো।

যা হোক, মুস্তফী কবচ করে দেন, তাতে দেয় টাকার কথা লেখা থাকে। সেই টাকার এক-চতুথাংশ কেটে নেয়া হয়। পরে কবচ ও বরাত উভয়পত্রে তৌজীনবীশ, মুস্তফী, নাজীর, দেয়ান, উকিল প্রভৃতি দস্তখত করে। তারপর সম্রাটের পাঞ্জা ও মোহরের ছাপ পড়ে। পাঞ্জা-মোহরের পাশে লেখা থাকে কোন্ শ্রেণির মুদ্রায় টাকা দেয়া হবে।– অনুবাদক।

সাধারণ ঘোড়সওয়াররা ওমরাহদের অধীন থাকে। দুই শ্রেণির ঘোড়সওয়ার আছে। প্রথম শ্রেণির ঘোড়সওয়াররা দুটি করে ঘোড়া রাখে এবং ঘোড়ার পায়ে ওমরাহদের মোহরাঙ্কিত থাকে। দ্বিতীয় শ্রেণির ঘোড়সওয়াররা একটি মাত্র ঘোড়া রাখে। প্রথম শ্রেণির ঘোড়সওয়ারদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণির চেয়ে বেশি এবং তাদের বেতনও বেশি। ওমরাহদের ব্যক্তিগত মর্জি ও উদারতার উপর সৈন্যদের বেতন অনেকটা নির্ভর করে। অবশ্য বাদশাহের হুকুমে প্রত্যেক ঘোড়সওয়ার (একটি ঘোড়ার রক্ষক) অন্তত : পঁচিশ টাকা মাসিক বেতন পাওয়া উচিত।[২] এই বেতনের হারেই ওমরাহের সঙ্গে হিসাব-নিকাশ করা হয়।

পদাতিক ও বন্দুকচি

পদাতিক সৈন্যরা সবচেয়ে অল্প বেতন পায়। শোচনীয় অবস্থা হলো গাদা-বন্দুকধারীদের। মাটিতে শুয়ে পড়ে যখন তারা বন্দুক ব্যবহার করে তখন তাদের অবস্থা দেখলে মায়া হয়। তারাও ভয় পেয়ে যায়। চোখ দুটো তাদের বিস্ফারিত হয়ে থাকে। যাদের লম্বা দাড়ি আছে তারা দাড়িতে আগুন লাগার ভয়ে ঘাবড়ে যায়। তা ছাড়া, জিন্-পরীদের ভয় তো আছেই। বন্দুকচিকদের ধারণা, জিন-দৈত্যদের ষড়যন্ত্রে গাদাবন্দুক ফেটে গিয়ে আগুন ধরে যেতে পারে। তাই বন্দুকচিরা যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দুকের চেয়ে দাড়ি ও চোখ সামলাতেই বেশি ব্যস্ত থাকে। বেতন তাদের কারো কারো মাসিক কুড়ি টাকা, কারো পনের টাকা, কারো বা দশ টাকা।

গোলন্দাজবাহিনী

কিন্তু গোলন্দাজ বাহিনীর সৈন্যরা অনেক বেশি বেতন পেয়ে থাকে, বিশেষ করে বিদেশী পর্তুগীজ, ইংরেজ, ডাচ, জার্মান ও ফরাসীরা। গোয়া ও অন্যান্য ডাচ ও ইংরেজ কুঠির পলাতক কর্মচারীরা সম্রাটের গোলন্দাজ বাহিনীতে যোগদান করতো। এই ফিরিঙ্গি বা খ্রিস্টান গোলান্দাজরা অনেক বেশি বেতনও পেতো। গোড়ার দিকে যখন গোলন্দাজ সেনা সম্পর্কে মোগল সম্রাটের বিশেষ

---

২. মোগল সম্রাটের আমলে যুদ্ধের ঘোড়া চিহ্নিত করা হতো এবং তাদের সাত ভাগে ভাগ করা হতো। যেমন, আরবীয়, ইরাকীয়, তুর্কী, ইয়াবু, তাজী ও জঙ্গলী। যারা আরবীয় ঘোড়সওয়ার তাদের বেতন ছিল ৬০৮ দাম, মোজন্নস ঘোড়সওয়ারদের ৫৬০ দাম (ইরাকীয় ও তুর্কী ঘোড়ার সংমিশ্রণ জাতকে মোজন্নস বলা হতো), তুর্কী ঘোড়সওয়ারদের ৪৮০ দাম, ইয়াবুদের ৪০০ দাম, তাজী ও জঙ্গলী ভারতীয় ঘোড়সওয়ারদের বেতন ছিল ৩২০ দাম এবং জঙ্গলী ঘোড়সওয়ারদের ২৪০ দাম। যারা টট্টু ঘোড়ায় চড়ে সংবাদবাহকের কাজ করতো, তারা ১৪০ দাম বেতন পেতো। ('আইন-ই আকবরী')।— অনুবাদক।

ধারণা ছিল না, তখন তিনি রীতিমতো উচ্চ বেতন দিয়ে ফিরিঙ্গীদের নিয়োগ করতেন। সেই সময় ফিরিঙ্গী গোলন্দাজরা সাধারণত মাসিক দুশো টাকা পর্যন্ত বেতন পেতো। পরে যখন দেশী লোক এ কাজে দক্ষ হয়ে উঠলো এবং গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে উঠলো, তখন সম্রাট আর ফিরিঙ্গীদের এতো টাকা বেতন দিতেন না। মাসিক ত্রিশ-বত্রিশ টাকা করে তারা বেতন পেতো।*

কামান দু'রকমের আছে– ভারী ও হালকা কামান। ভারী কামান সম্পর্কে এটুকু বলতে পারি, একবার স্বচক্ষে সম্রাটের সসৈন্য রাজধানী থেকে লাহোরের পথে কাশ্মীরযাত্রা করতে দেখেছি এবং মনে আছে সেই সৈন্যদের সঙ্গে গোলন্দাজরাও ছিল। ভারী কামান প্রায় সত্তরটি ছিল এবং দুশো থেকে তিনশো উটের পিঠে সরঞ্জামসহ সেগুলো বহন করা হয়েছিলো। কামানগুলো সব পিতলের তৈরি।

যাত্রাপথে সম্রাট কিভাবে শিকার করতেন, আমাদের জন্য তা সত্যিই বলবার মতো একটি বিষয়। প্রতিদিন কিছু-না কিছু শিকার করা তাঁর চাই-ই চাই। হয় কোনোদিন তিনি তাঁর শিকারের পাখিগুলো ছেড়ে দিতেন এবং তারা কিছু শিকার করে নিয়ে আসতো। কোনোদিন তিনি নীল গাই শিকার করতেন নিজে, কোনোদিন হরিণ শিকার করতেন নিজের পোষা নেকড়ের দল লেলিয়ে দিয়ে। আবার কখনো বাদশাহী মেজাজ হলে সিংহ শিকারও করতেন।

সম্রাটের কাশ্মীর যাত্রার সময় হালকা কামানধারীদেরও বেশ সুসজ্জিত দেখেছি। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি হালকা কামান ছিল, সব পিতলের তৈরি। হালকা কামান প্রত্যেকটি সুন্দর একটি শকটের ওপর বসানো এবং তার সঙ্গে গোলাগুলির বাক্স সাজানো। একটির পর একটি সারবন্দীভাবে সাজানো ছিল এবং তার ওপর নানা আকৃতির লাল পতাকা ঝুলছিলো। টেনে নিয়ে যাবার জন্য দুটি করে বলিষ্ঠ ঘোড়া প্রত্যেক কামানের শকটের সঙ্গে বাঁধা ছিল এবং পাশে আরোও একটি করে ঘোড়া ছিল তার সঙ্গে। ভারী কামানধারী যারা তারা রাজপথ বা সোজা সড়ক দিয়েই চলছিলো, সব সময় যে সম্রাটকে অনুসরণ করছিল তা নয়। কারণ সম্রাট সব সময় বাঁধানো সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন না, মাঝেমধ্যে শিকারের সন্ধানে আশেপাশের সরু পথেও ঢুকে পড়ছিলেন। সুতরাং ভারী কামানধারীদের পক্ষে সব সময় তাঁকে অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু হালকা কামানধারীদের পদে পদে তাঁকে অনুসরণ করার কথা এবং তারা তা করছিলোও।

শুধু সংখ্যার দিক থেকে ছাড়া প্রাদেশিক সেনাবাহিনীর সঙ্গে নিজস্ব সেনাবাহিনীর বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। প্রত্যেক জেলায় ওমরাহ,

---

* ইউরোপীয়দের সংস্রবে ভারতীয় গোলন্দাজ বাহিনী গড়ে ওঠার এই ইতিহাস প্রণিধানযোগ্য।–অনুবাদক।

মনসবদার, রৌজিনদার, সাধারণ সেনাদল পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী আছে। শুধু দাক্ষিণাত্যেই আছে প্রায় বিশ-পঁচিশ থেকে ত্রিশ হাজার ঘোড়সওয়ার সৈন্য। গোলকুন্ডা, বিজাপুর ও অন্যান্য রাজাদের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার পক্ষে খুব বেশি সৈন্য নয়। কাবুলে সম্রাট যে সৈন্য রাখেন তার সংখ্যাও প্রায় বারো হাজার থেকে পনেরো হাজার এবং ইরানী, বেলুচী ও সীমান্তের অন্যান্য জাতির অভিযান ও উপদ্রব প্রতিরোধ করার জন্য এরকম সৈন্য থাকে।

বাংলাদেশের সৈন্যসংখ্যা আরোও বেশি। কারণ বংলাদেশে বিদ্রোহ ও যুদ্ধবিগ্রহ প্রায় লেগেই থাকে। এরকম প্রত্যেক প্রদেশ ও অঞ্চলে বাদশাহী সৈন্য থাকে এবং স্থানের গুরুত্ব হিসেবে সৈন্যসংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়। এ কারণে সারা ভারতে মোট সৈন্যসংখ্যা এতো বেশি যে, বাইরে থেকে তা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

পদাতিক সৈন্যের কথা আপাতত বাদ দিয়ে বলা যায় যে, শুধু সম্রাটের অধীনে ঘোড়সওয়ার সৈন্য আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ৪০ হাজার। এর সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশের সৈন্যসংখ্যা যোগ করলে ঘোড়সওয়ার সৈন্যের সংখ্যা দু লাখে গিয়ে দাঁড়াবে।

পদাতিক সৈন্যের বিশেষ গুরুত্ব নেই বলেছি। বন্দুকচি ও গোলন্দাজদের নিয়ে সম্রাটের অধীনে প্রায় পনেরো হাজার পদাতিক সৈন্য আছে। এই সংখ্যা থেকে প্রদেশের পদাতিক সংখ্যা সম্পর্কেও একটা ধারণা করা যায়। কিন্তু অনেক সময় সৈনিক, চাকরবাকর, খিদমতগার, খানসামা, দাসদাসী, ব্যবসায়ী শ্রেণির লোক যারা সম্রাটের অনুগমন করে, তাদের সকলকেই পদাতিক নামে অভিহিত করা হয়। কেনো তাদেরকে পদাতিক শ্রেণিভুক্ত করা হয়, আমি ঠিক বুঝি না।* যদি এভাবে পদাতিকের সংখ্যা নির্ধারণ করার নিয়মটিকে মেনে নেয়া হয়, তাহলে সম্রাট যখন তাঁর রাজধানী ছেড়ে কোথাও যাত্রা করেন তখন তাঁর সঙ্গে দু লাখ থেকে তিন লাখ পদাতিক সৈন্য থাকে, এ কথা বলা যায়।

সংখ্যার কথা শুনলে হয়তো আশ্চর্য হবেন। হবারই কথা। কিন্তু সম্রাট যখন কোনো জায়গায় যান তখন তাঁর সঙ্গে কতো ধরনের জিনিস ও কতো শ্রেণির লোকলস্কর যে থাকে, সে সম্পর্কে যদি আপনার কোনো ধারণা থাকতো, তাহলে আপনি একেবারেই আশ্চর্য হতেন না। সম্রাট যান, তাঁর সঙ্গে যায় তাঁবু, আসবাবপত্র, নানা রকমের জিনিসপত্র, চাকরবাকর, দাসদাসী, সৈন্যদের জন্য প্রচুর নারী, খাদ্যসামগ্রী, পানীয় ইত্যাদি। এসব লোকজন ও

---

* সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে ডাকহরকরা, কুস্তিগীর, পাল্‌কিবাহক, ভিস্তিওয়ালাদেরকেও পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা হতো।– অনুবাদক।

লটবহর বহন করার জন্য যায় অসংখ্য হাতি, ঘোড়া, উট, গাড়ি, পাল্‌কি, চৌপালা। সব মিলিয়ে একটা বিচিত্র চলমান নগর মনে হয়।

সম্রাট যে দেশে সর্বশক্তিমান ও সর্বময় কর্তা, সম্রাট যেখানে দেশের যাবতীয় ধনসম্পদের একমাত্র আইনসঙ্গত মালিক, সেখানে এরকম ঘটনা ঘটা মোটেই আশ্চর্যের নয়। সেখানে রাজধানী প্রধানত সম্রাট বা রাজাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে এবং সম্রাট না থাকলে রাজধানী হতশ্রী হয়ে যায়। দিল্লী ও আগ্রা এই রকম রাজসর্বস্ব রাজধানী। সম্রাট থাকেন বলে তার শ্রী থাকে, তিনি না থাকলে শ্রীহীন হয়ে যায়।

রাজধানী ছেড়ে সম্রাট যখন কোনো জায়গায় যান তখন মনে হয় যেনো গোটা রাজধানীটাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলছে। এ দৃশ্য স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমির-ওমরাহ, আমলা-অমাত্য, সেনাবাহিনীর, সাঙ্গোপাঙ্গ, দাসদাসী, কারিগর-কারখানার সঙ্গে উষ্ট্রশালা, হাতিশালা, ঘোড়াশালা– সব সম্রাটের সঙ্গে চলতে থাকে। মনে হয় যেন সম্রাটের সঙ্গে রাজধানীও চলছে– রাজধানী একেবারে জনশূন্য হয়ে পড়ে।

দিল্লী বা আগ্রা ঠিক প্যারিসের মতো শহর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির বলতে যা বোঝায়, দিল্লী-আগ্রাকে অনেকটা তাই বলা যায়। শিবির গুটিয়ে সেনাপতি যেমন স্থান থেকে স্থানান্তরে যাত্রা করেন, তেমনি ভারতের সম্রাটও তাঁর রাজধানী গুটিয়ে নিয়ে অন্য স্থানে যান। এরকম রাজধানীকে যুদ্ধক্ষেত্রের শিবির ছাড়া কি বলা যায়?

সৈন্য ও আমলাদের বেতনের কথাও এখানে বলতে হয়। আমির ওমরাহ থেকে সাধারণ সৈনিক, সকলকে দু'মাস পরপর বেতন দিতে হয়, না দিলে চলে না। কারণ সম্রাটের এই বেতনের উপর জীবনধারণের জন্য তাদের সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। ফ্রান্সে যেমন কোনো জাতীয় সঙ্কটের সময় সম্রাট যদি তাঁর ঋণ দু-এক মাসের জন্য পরিশোধ করতে না পারেন, তাহলে যেমন যে কোনো কর্মচারী বা সাধারণ সৈনিক নিজেদের সামান্য মজুত অর্থেও কোনো রকমে জীবনধারণ করতে পারে, ভারতে তা পারে না। সাধারণ সৈনিক বা কর্মচারীরা তো নয়ই, আমির-ওমরাহরাও না।

সম্রাটের কর্মচারীদের ব্যক্তিগত আয়ের কোনো উপায় নেই ভারতে। সম্পূর্ণ সম্রাটের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা ছাড়া তাদের কোনো পথ নেই। সুতরাং নিয়মিত মাসিক বেতনের গুরুত্ব ভারতে অত্যধিক। সৈন্যদের যদি বেতন দিতে দেরি হয় তাহলে ভারতে তার ফল ভয়াবহ হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। প্রথমে তারা নিজেদের সামান্য আসবাবপত্র ও গৃহসামগ্রী বেচে বাঁচার চেষ্টা করে। তারপর যখন সব নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন সেনাদল ছেড়ে পলায়ন করে। কেউ কেউ বিদ্রোহ করে অথবা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। সে এক ভয়াবহ দৃশ্য– সহ্য করা যায় না, এবং বিশ্বাসও করা যায় না।

মোগল সাম্রাজ্যে সিংহাসন নিয়ে ঘরোয়া যুদ্ধের শেষদিকে লক্ষ্য করেছি, অর্থাভাবে সৈন্যরা তাদের নিজেদের ঘোড়া বিক্রি করে দিতে চেয়েছে। বিক্রি তারা করতে আরম্ভ করতো, যদি আরোও কিছুদিন ঘরোয়া লড়াই চলতো। তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ, আপনি হয়তো জানেন না যে মোগল সেনাবাহিনীর প্রত্যেক সৈন্য ও সেপাই বিবাহিত। তাদের পুত্রকন্যা আছে, পরিবার আছে, ঘরবাড়ি, দাসদাসী আছে। জীবিকার জন্য সকলেই তাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে, অর্থাৎ তাদের মাসিক বেতনের দিকে। হিসেব করলে দেখা যায়, এভাবে কয়েক লাখ লোক, স্ত্রীপুরুষ, ছেলেমেয়ে সকলে সরকারি কর্মচারীদের মাসিক বেতনের ওপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে। জানি না, কোনো রাজকোষ থেকে এতো মানুষের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব কিনা!

মোগল সম্রাটের অন্যান্য খরচের কথা আমি এখনও আপনাকে জানাইনি। দিল্লী ও আগ্রাতে সম্রাট সব সময়ের জন্য প্রায় দু-তিন হাজার বাছা বাছা ঘোড়া রেখে দিতেন। তা ছাড়া প্রায় আট-নয়শো হাতি এবং কয়েক হাজার টাট্টু কাহারা, বেহারাও থাকে সম্রাটের বড় বড় তাঁবু ও তাঁবুর সরঞ্জামাদি বহন করার জন্য।[৪] শাহজাদী জাহান আরা ও নানান শ্রেণীর মহিলাও সম্রাটের সঙ্গে যান। তার সঙ্গে গঙ্গার পানি ও নানা রকমের জিনিসপত্র।[৫] এতো জিনিস, এতো

---

৪. মোগল যুগে তাঁবু অনেক রকমের ছিল। 'আইন-ই আকবরী'তে তার কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। আকার ও রকমভেদে তাঁবুর নাম ছিল নানারকম। যেমন বরগা, চৌবীনরৌতি, ডুরাসন মঞ্জিল, খাটগা, সরাপর্দা, সামীয়ানা ইত্যাদি। বরগা বিরাট তাঁবু, নিচে কম করেও দশ হাজার লোক দাঁড়াতে পারতো। বরগা তাঁবু এক হাজার লোকে সাতদিনে খাটাতে পারতো। 'চৌবীনরৌতি' দশটা খুঁটির ওপর টাঙানো হতো। তাঁবুর নিচে খস্‌খসের চাল দেয়া থাকতো এবং সঙ্গে খস্‌খস ও বেণা বোনা থাকতো। খস্‌খসের বেড়ার ওপর ভালো কিংখাব ও মলমল আঁটা থাকতো। উপরে চাঁদোয়ার মতো লাল সুলতানী বনাত দেয়া হতো। চৌবীনরৌতি তাঁবু টাঙাবার জন্য রেশমের ও তসরের দড়ি ব্যবহার করা হতো। দোতলা তাঁবুর নাম ছিল 'ডুরাসন মঞ্জিল', আট-নটি খুঁটির ওপর দাঁড় করানো। উপর তলায় সম্রাট নামাজ পড়তেন, নিচের তলায় বেগমরা থাকতেন। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংকলিত)—অনুবাদক।

৫. মোগল সম্রাটরা পানি-বিশারদও ছিলেন। খাওয়ার পানি গোসলের পানি সম্পর্কে তাঁদের বিলাসিতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। 'আইন-ই-আকবরী'তে এ সম্বন্ধে চমৎকার বিবরণ আছে। সরকারি দফতরখানায় একটি স্বতন্ত্র বিভাগই ছিল যার কাজ ছিল খাওয়ার পানি শীতল করা ও বরফ আমদানী ইত্যাদি সম্বন্ধে তদারক ও ব্যবস্থা করা। সেই বিভাগের নাম ছিল– 'আবদারখানা'। সাধারণত সোরা দিয়ে সম্রাটের খাওয়ার পানি শীতল করা হতো। বালি ও মাটির তৈরি কুঁজোতে পানি ভরে, তার মুখে ভিজে কাপড় বেঁধে একটা বড় গামলায় রাখা হতো। সেই গামলায় পানি থাকতো এবং তাঁতে প্রচুর পরিমাণে সোরা মেশানো থাকতো। কুঁজোর গলায় তিনপাক রেশমের দড়ি দিয়ে, ঠিক যেমন করে মন্থনদণ্ড ঘোরানো হয়, তেমনি করে কুঁজো ঘোরানো হতো। খানিকক্ষণ ঘোরালেই কুঁজোর পানি খুব শীতল হতো। একে 'গড়গড়ি' পানি বলা হতো। হর্ষচরিত্রে এর বিবরণ দেয়া আছে।

সাজসরঞ্জাম, বিলাসসামগ্রী কোনো সম্রাটের দরকার হয় না কখনো। এর সঙ্গে যদি আবার হারেম বা বেগমমহলের খরচের কথা বলি, তাহলে আপনার কাছে রূপকথার কাহিনী বলে মনে হবে। দামী দামী সোনা-রুপার কাজ করা কাপড়, রেশম, মণিমুক্তা, মৃগনাভি, সুগন্ধি আতর ইত্যাদি হারেমখানার জন্য অজস্র আমদানি করা হতো।[৬]

মোগলদের ধনদৌলত

যদিও সম্রাটের রাজস্ব এবং ঐশ্বর্য প্রচুর, তাঁর এই অপরিমিত ব্যয়ের জন্য উদ্বৃত বিশেষ কিছু থাকে না। যেমন আয় তেমনি তাঁর ব্যয়। অনেক রাজার রাজস্বের আয় থেকে ভারতের সম্রাটের আয় অনেক বেশি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁকে আমি ধনী সম্রাট বলতে রাজি নই। মোগল সম্রাটকে ধনী বলাও যা, কোনো কোষাধ্যক্ষকে ধনী বলাও তাই। কোষাধ্যক্ষ প্রচুর টাকা নাড়াচাড়া করে, এক হাতে জমা নেয়, অন্য হাতে দিয়ে দেয়। সেই টাকার মালিক সে নয়। তেমনি ঠিক ভারতের সম্রাট। ধনী ও ঐশ্বর্যবান সম্রাট আমি তাঁকেই বলতে পারি যিনি নিজের রাজ্যের প্রজাদের পীড়ন বা শোষণ না করে এমন রাজস্ব আদায় করতে পারেন যা দিয়ে স্বচ্ছন্দে তাঁর রাজদবরারের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন, বড় বড় প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করতে পারেন, রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সৈন্যসামন্ত যথেষ্ট সংখ্যক বহাল করতে পারেন। এবং এ সব করা সত্ত্বেও যিনি বিপদ-আপদ ও সঙ্কটের জন্য প্রচুর পরিমাণে উদ্বৃত টাকা মজুত রাখতে পারেন। এসব অধিকাংশ গুণই সম্রাটের আছে বটে, কিন্তু পরিমাণে যতোটা থাকলে ভালো হয়, ততোটা নেই।

আমি যা বলতে চাইছি আশা করি তা আপনি বুঝতে পেরেছেন। আপনিও নিশ্চয় ভারতের সম্রাটকে এই কারণে খুব ধনী সম্রাট বলতে চাইবেন না।

এবার আপনার জন্য আমি আরো দুটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি, যা থেকে আপনি আমার বক্তব্য সমর্থন করার মতো যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাবেন। এ

সম্রাটের রন্ধনশালায় গঙ্গা ও যমুনার পানি ব্যবহার করা হতো। পাঞ্জাবের কাছে থাকলে হরিদ্বার থেকে আর আগ্রায় থাকলে প্রয়াগ থেকে পানি আনা হতো। হিমালয়ের কাছ থেকে বরফও আমদানী করা হতো। ('আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)-অনুবাদক।

৬. হারেম বা বেগম মহলেরও সুন্দর বিবরণ আছে 'আইন-আকবরী'তে। চারদিকে উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হারেমের মধ্যে একজন বেগমের জন্য একটা মহল তৈরি থাকে। দু-তিনটি মহলের মধ্যে একটি করে বাগান, পুস্করিণী ও কুয়ো। সম্রাট আকবরের কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বেগম ও সেবিকা ছিল। এক-এক দল বেগমের ওপর একজন মহিলা দারোগা নিযুক্ত থাকতো। দারোগাদের যে সর্দার তাঁকে হারেমকর্ত্রী বলা হতো। বেগমদের প্রত্যেকের মাসোহারা নির্দিষ্ট থাকতো। বয়স ও রূপগুণ অনুসারে এক হাজার আটশো টাকা মাসোহারা ছিল তাদের। সেবিকাদের পঞ্চাশ থেকে দুশ টাকা পর্যন্ত বেতন দেয়া হতো।-অনুবাদক।

ঘটনা থেকেই বুঝতে পারবেন, মোগল সম্রাটের ঐশ্বর্য সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে ধারণা রয়েছে, তা ঠিক নয়।

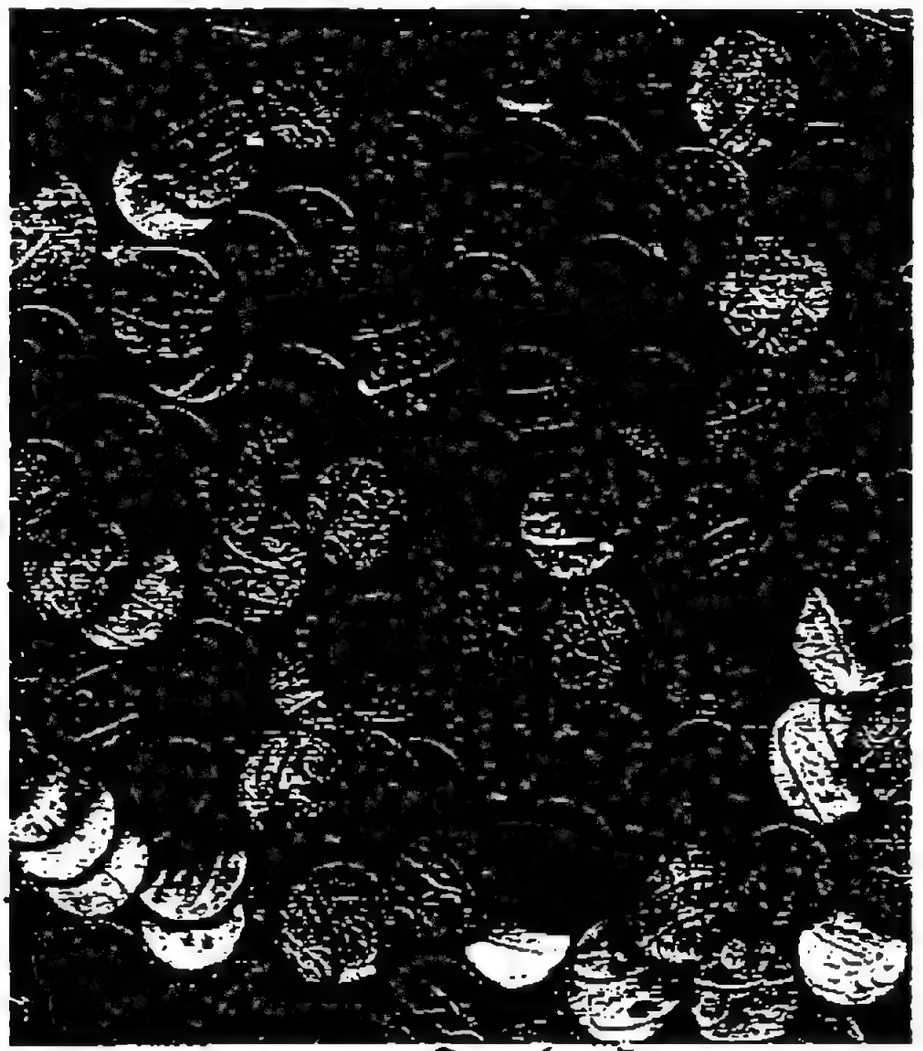

মোগল আমলে প্রচলিত স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা

প্রথম ঘটনা: বিগত গৃহযুদ্ধের শেষদিকে সম্রাট আওরঙ্গজেব সৈন্যদের বেতন সম্পর্কে রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি ভেবেই কূল পাচ্ছিলেন না, কি করে তাদের বেতন ও ভাতা দেবেন। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, গৃহযুদ্ধ পাঁচ বছর মাত্র স্থায়ী হয়েছিলো এবং সৈন্যদের বেতন স্বাভাবিক অবস্থায় যে রকম থাকতো, তার চেয়ে কম ছিল। আর, শুধু বাংলাদেশ ছাড়া, যেখানে সুলতান সুজা তখনও লড়াই করছিলেন– ভারতের অন্য কোথাও বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহ হচ্ছিলো না। সর্বত্র শান্তি বজায় ছিল বললেও ভুল হয় না। এও মনে রাখা দরকার, সম্রাট আওরঙ্গজেব যেভাবেই হোক সেই সময় তাঁর পিতা শাহজাহানের অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা: সম্রাট শাহজাহান যথেষ্ট বিচক্ষণ সম্রাট ছিলেন এবং প্রায় চল্লিশ বছর তিনি রাজত্ব করেছেন। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে খুব বড় রকমের কোনো যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তিনি লিপ্ত হননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছয় কোটি টাকার বেশি জমাতে পারেননি। অবশ্য টাকার সঙ্গে আমি সোনা-রূপার অসংখ্য মূল্যবান জিনিস, দামী দামী পাথর, মণিমুক্তা, হীরা-জহরত ইত্যাদির মূল্য যোগ করিনি। এদিক দিয়ে বরং সম্রাট শাহজাহানের মতো দৌলত অন্য কোনো সম্রাটের ছিল না বলা চলে। কিন্তু এই মূল্যবান মণিমুক্তা, হীরা-জহরত

দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত ও সংগৃহীত, অধিকাংশই হিন্দু রাজা ও পাঠানদের। ওমরাহদের কাছ থেকে উপহার পাওয়াও কম নয়। এ সবই সম্রাটের পবিত্র সম্পত্তি ও স্পর্শ করা নিষেধ। দেশের দুর্দিনেও সম্রাট তাঁর এই সম্পদের কোনো সাহায্য নেন না।

ভারতীয়দের দারিদ্র্যের কারণ

অবশেষে আমি এ কথা বলতে চাই, যদিও মোগল সাম্রাজ্যের সোনা-রুপা ও সম্পদের আদি-অন্ত নেই, তাহলেও সোনা যে অন্য দেশের তুলনায় মোগলদের খুব বেশি আছে, তাও আমার মনে হয় না। বরং ভারতের লোকদের দিকে তাকালে মনে হয়, তারা অন্যান্য দেশের জনগণের তুলনায় দরিদ্র। এমন মনে হবার কারণও আছে।

প্রথম কারণঃ সোনা অনেক পরিমাণে গলিয়ে নষ্ট করে ফেলা হয়, অর্থাৎ সোনা গলিয়ে মেয়েদের অলঙ্কার তৈরি করা হয় এবং হাত-পা, মাথা, গলা, কান, সর্বত্র অলঙ্কৃত করার জন্য সোনা অপচয় করা হয়। সোনা থেকে নানা রকমের জরি-জালিদাও তৈরি করা হয়। সেই সব সোনার জরি দেয়া পাগ্‌ড়ি পোশাক ইত্যাদি দেহের শোভাবর্ধন করে। এভাবে কতোটা সোনা যে ভারতে অপব্যবহার করা হয়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আমির-ওমরাহ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ কর্মচারী পর্যন্ত সকলে গিল্টি করা অলঙ্কার ব্যবহার করেন। সাধারণ পদাতিকরা পর্যন্ত স্ত্রী-পুত্রকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করার জন্য উদগ্রীব। অনাহারে ও অর্ধাহারে থেকেও ভারতবর্ষে সোনার গহনা পরার প্রবণতা ও অভ্যাস খুব প্রবল।[৭]

দ্বিতীয় কারণঃ সম্রাট দেশের যাবতীয় সম্পদের মালিক, বিশেষ করে ভূসম্পত্তির। সামরিক কর্মচারীদের বেতন হিসেবে তিনি ভূসম্পত্তির ভোগাধিকার দান করেন। তাকে 'জায়গীর' বলে, যেমন তুর্কীতে বলে 'তিমর'। এই জায়গীর থেকে তারা তাদের ন্যায্য বেতন আয় করে। প্রাদেশিক সুবাদারদেরও জায়গীর দেয়া হয়, শুধু বেতন জন্য নয়, সৈন্যসামন্তদের জন্যও। একমাত্র শর্ত এই যে, বাসথরিক বাড়তি রাজস্ব যা আয় হবে সেটা সম্রাটকে দিতে হবে। যে সব ভূসম্পত্তি জায়গীর দেয়া হয় না, সেগুলো সম্রাটের নিজস্ব আয়ত্তে থাকে এবং তিনি রাজত্ব আদায়কারী (জমিদার ও চৌধুরী) নিয়োগ করে তার রাজস্ব আদায় করেন।

---

৭. বার্নিয়ারের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের ক্ষমতা দেখে প্রশংসা করতে হয়। মোগল সম্রাটদের একটি রত্নভাণ্ডার ছিল। রত্নভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষের নাম 'তেপকচী'। একজন জহুরী দারোগাও থাকতেন। চুনী, পান্না, হীরা, নীলা প্রভৃতি নানা রকমের মণিমাণিক্য ভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকতো।—অনুবাদক।

এভাবে ভূসম্পত্তির অধিকারী যারা হন– সুবাদার, জায়গীরদার ও জমিদার, তারা প্রজাদের একমাত্র হর্তাকর্তা হয়ে যান। চাষীদের ওপর তাদের পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় থাকে, এমন কি নগর ও গ্রামের বণিকশ্রেণি ও কারিগরদের ওপরেও। এই কর্তৃত্ব ও আধিপত্য তারা যে কি নির্মমভাবে নিষ্ঠুর অত্যচারীর মতো প্রয়োগ করেন তা কল্পনা করা যায় না। এই অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে অভিযোগ করারও কোনো উপায় নেই। কারণ যিনি রক্ষক– তিনিই ভক্ষক। এমন কোনো নিরপেক্ষ কর্তৃপক্ষ নেই, যার কাছে তারা অভিযোগ পেশ করতে পারে।

ফ্রান্সের মতো ভারতে পার্লামেন্ট নেই, আইনসভা নেই, আদালতের বিচারক নেই– অর্থাৎ এমন কিছু নেই যার সাহায্যে এই নিষ্ঠুর অত্যাচারীদের বর্বরতার প্রতিকার করা যেতে পারে। কেউ নেই, কিছু নেই। আছেন শুধু কাজী সাহেব, কিন্তু কাজীর বিচারও তেমনি হাস্যকর। কারণ কাজীর কাছে জনসাধারণের সুবিচারের কোনো আশা নেই। রাষ্ট্রীয় কর্তব্য ও দায়িত্বের এই চরম লজ্জাজনক অপব্যবহার শুধু রাজধানীতে (দিল্লী ও আগ্রা) বা রাজধানীর কাছাকাছি থাকা নগরে ও বন্দরে একটু কম দেখা যায়। কারণ কোনো অন্যায় বা অত্যাচার এই সব স্থানে ঘটলে, সম্রাটের কর্ণগোচর হতে দেরি হয় না। এ অবস্থাকে আমরা 'দাসত্ব' ছাড়া আর কি বলতে পারি?

এই দাসত্বই হলো ভারতের প্রগতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ব্যবসা-বাণিজ্য, আর্থিক অবস্থা, ব্যক্তিগত জীবনধারা, আচার-ব্যবহার, সবকিছু এই কারণে এতো অনুন্নত বলে মনে হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্যেও বণিকশ্রেণি বিশেষ কোনো উৎসাহ পায় না। কারণ বাণিজ্যে অর্থলাভ ঘটলে আশার চেয়ে আতঙ্কের সম্ভাবনা থাকে। প্রতিবেশী স্বেচ্ছাচারী তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের দম্ভে সার্থক ব্যবসায়ীর সর্বনাশ করার চেষ্টা করে এবং কিছুতেই অন্য আরেকজনের ঐশ্বর্যের প্রতিপত্তি সহ্য করে না। সুতরাং ভারতের বণিকশ্রেণি ও বাণিজ্যে কোনো ক্রমোন্নতি নেই, কোনো প্রসার ও প্রগতি নেই।

তা ছাড়া, ভারতের আরোও একটা বৈশিষ্ট্য আছে– যদি কেউ ধনোপার্জন করে, তাহলে সে কখনো ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের জন্য এক কপর্দকও খরচ করে না। তার ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ, আসবাবপত্র সব একরকম থাকে– কখনো বদলায় না এবং তা দেখে বোঝার উপায় নেই যে তার কতো ধনদৌলত আছে। কৃপণতাই ভারতীয়দের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এদিকে ক্রমে ক্রমে সোনা-রুপা মজুত হতে থাকে এবং মাটির গভীর তলদেশে স্তূপাকারে সমাধিস্থ হয়ে আত্মগোপন করে থাকে। ধনী কৃষক, ধনী কারিগর, ধনী বণিক– সবার ঠিক একই রকম মনোবৃত্তি– সে মুসলমান বা হিন্দু, যে কোনো সম্প্রদায়েরই লোক হোক কেনো।

সাধারণত ভারতে বণিকশ্রেণি বলতে হিন্দুদেরই বোঝায়। কারণ হিন্দুরাই ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করে। নানা উপায়ে অর্থ সঞ্চয় করে রাখলে পরলোকে পরমাত্মার সদ্‌গতি হবে, এ বিশ্বাস হিন্দুদের মধ্যে প্রবল। মুষ্টিমেয় একদল লোক যারা সম্রাট বা আমির-ওমরাহের আওতায় থাকে তারাই শুধু ভোগ-বিলাসের জন্য ব্যয় করে এবং বাইরে দীনদরিদ্র সেজে থাকে না।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সোনা-রুপা এভাবে মজুত করে রাখার অভ্যাস যুক্তিহীন। খরচ না করে টাকা জমিয়ে রাখার প্রবৃত্তির জন্যই ভারতে দারিদ্র্য এতো বেশি। উপার্জিত অর্থ দিয়ে লেনদেন না করে যদি তা ঘরে সঞ্চয় করে রাখা হয়, তাহলে পর্যাপ্ত ধনসম্পদ থাকা সত্ত্বেও কোনো দেশের দারিদ্র্য দূর হতে পারে না।[৮]

যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে সকলের মনে একটা স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগবে। প্রশ্নটি এই: সম্রাট যদি সব ভূসম্পত্তির মালিক না হতেন এবং সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার যদি স্বীকৃত হতো, তাহলে কি ভারতের আরোও বেশি উন্নতি হতো?[৯]

আর্থিক অবনতির কারণ কি?

এই প্রশ্নটি নিয়ে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি। ইউরোপের যে সব রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রয়েছে এবং যে সব রাষ্ট্রে নেই– তাদের অবস্থা তুলনা করে দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করলে রাষ্ট্রের মারাত্মক ক্ষতি হয়।

পূর্বালোচনা থেকে আমরা বুঝেছি, ভারতবর্ষে ছোটবড় প্রতিটি রাষ্ট্রে ধনরত্ন কিভাবে জায়গীরদার, সুবাদার ও জমিদাররা গোপন সিন্দুকে মজুত করে ফেলে এবং লেনদেনের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে তা আত্মাসৎ করে। তাদের এমন মনোবৃত্তির কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। জায়গীরদার, জমিদারের এই নিষ্ঠুরতা সংযত করার ক্ষমতা সম্রাটের পর্যন্ত নেই, একমাত্র রাজধানীর কাছাকাছি

---

৮. আধুনিক অর্থনীতির ছাত্রদের কাছে বার্নিয়ারের এই মন্তব্য শ্রদ্ধার উদ্রেক করবে। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, অর্থাৎ সাড়ে চারশো বছর আগে বার্নিয়ার মোগল সাম্রাজ্য ভ্রমণ করে গিয়ে তার অর্থনৈতিক অবস্থার এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যদি আজও কেউ মধ্যযুগের ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখেন, তাহলে বার্নিয়ারের এই বিশ্লেষণ থেকে তিনি যথেষ্ট মূল্যবান ইঙ্গিত পেতে পারেন। আধুনিক অর্থনীতির ছাত্ররা জানেন, 'Saving', 'Spending', 'Consumption' ও 'National income'-এর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কি, এবং 'Consumption curve' কাকে বলে। সাড়ে চারশো বছর আগে বার্নিয়ার এইসব বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাৎপর্য না জেনেও বিশ্লেষণের মধ্যে বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন।–অনুবাদক।

৯. সামাজিক ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে'র যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, প্রত্যেক সমাজবিজ্ঞানী সে কথা স্বীকার করবেন। বার্নিয়ার এখানে সেই ভূমিকার আভাস দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি শ্রদ্ধা পাওয়ার অধিকার রাখে।–অনুবাদক।

অঞ্চলে ছাড়া। সাধারণত রাজধানী থেকে দূরে একটি অঞ্চলের কর্তৃত্ব নিয়ে এরা যথেচ্ছাচার করতে থাকে এবং তার অধিকাংশই সম্রাটের কর্ণগোচর হয় না। সুতরাং যথেচ্ছাচারিতার সীমাও থাকে না। এই যথেচ্ছাচার মাঝেমধ্যে এমন কদর্যভাবে সীমা ছাড়িয়ে যায় যে, চাষী ও কারিগররা দৈনন্দিন জীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করতে পারে না এবং না পারার জন্য অনাহারে, কষ্টের মধ্যে নীরবে মৃত্যুবরণ করে। এই যথেচ্ছাচারিতার জন্য দরিদ্র চাষীদের বংশবৃদ্ধিও হয় না। এবং হলেও ভবিষ্যৎ বংশধরদের তারা মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়। চাষবাস সম্বন্ধে বিশেষ কোনো আগ্রহ থাকে না চাষীদের মনে, নেহায়েত বাধ্য হয়ে করতে হয় বলেই তারা চাষ করে। অনেক সময় তারা উদার ব্যবহার পাওয়ার প্রত্যাশায় গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে চলে যায়। কেউ কেউ সেনাবাহিনীতেও যোগদান করে।

সাধারণ চাষীদের পক্ষে পানি সেচনের জন্য খাল বা নালা খনন করা সম্ভব নয়। তাদের সামর্থ্যে কুলোয় না। সুতরাং পানি সেচন ব্যবস্থার অভাবের জন্য চাষাবাদের খুবই ক্ষতি হয় এবং যথেষ্ট আবাদী জমি পতিত থাকে।

দেশের বসতবাড়ির অবস্থাও শোচনীয়। সবই জরাজীর্ণ এবং নতুন করে তৈরি করার সঙ্গতিও খুব অল্প মানুষেরই আছে। মনে হয় ভারতের চাষী ও সাধারণ মানুষের মনে এটি প্রশ্ন জাগে : 'কেনো আমি একজন স্বেচ্ছাচারী জারগীরদার বা জমিদারের জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করবো? পরিশ্রমের সার্থকতা কি? আমার সম্পত্তি ও জমানো টাকা যদি স্বেচ্ছাচারী প্রভু ছিনেয়ে নেয়, তাহলে মেহনতের সার্থকতা কোথায়? সুতরাং যেভাবে হোক; জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই হলো। ফসল ফলিয়ে, সম্পদ বাড়িয়ে লাভ কি?'

প্রায় একই প্রশ্ন রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের মনেও জাগে। তারাও ভাবে : 'দেশের অবস্থা, চাষাবাসের অবস্থা কি হচ্ছে না হচ্ছে, তা নিয়ে ভেবে লাভ কি? এ ভূমির পেছনে অর্থ ব্যয় করাও অর্থহীন। কেনোই বা আমার জমির উন্নতির জন্য, ফলস ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্য অর্থ ব্যয় করবো? যে কোনো দিন সম্রাটের মর্জি অনুযায়ী আমাদের যাবতীয় অধিকার কেড়ে নেয়া হতে পারে। আমরা সাধারণ প্রজা বলে গণ্য হতে পারি। তাই যদি হয়, তাহলে আমাদের সুকাজের সুফল যে বংশধররা উত্তরাধিকার সূত্রে ভোগ করবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং ক্ষণিকের রাজা যখন আমরা, তখন প্রজাদের শোষণ করে যতোটুকু সম্ভব অর্থ রোজগার করাই ভালো। তাতে যদি প্রজারা অনাহারে মরে বা ভিটেমাটি ছেড়ে চলে যায়, তাহলে আমাদের কিছু করার নেই। কারণ আজ আছি কাল নেই। দেশের ভবিষ্যৎ, প্রজার কল্যাণ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয় চিন্তা করে আমাদের লাভ কি? যে কদিন পারা যায় আমরা লুটে নেবো এবং যখন সব ছেড়ে চলে যাবো তখন এমন রিক্ত অবস্থায় রেখে যাবো যে, ভবিষ্যতে

সম্রাটের নিযুক্ত অন্য কোনো জমিদার এ জমিদারি থেকে আর কিছু শোষণ করতে পারবেন না।'

এ কারণেই শুধু ভারতের নয়, এশিয়ার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অবনতি হয়েছে। যে দেশের সরকারের এই অবস্থা, সেখানে অবনতি ছাড়া উন্নতি হবে কেমন করে? এই অবনতির চিহ্ন ভারতের সর্বত্র দেখা যায়। ভারতের অধিকাংশ নগরের ঘরবাড়ির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। মাটির ঘরবাড়ি এবং এই রকম পরিত্যক্ত নগরের অভাব নেই সেখানে। জীর্ণ ঘরবাড়ির ভগ্নস্তূপে পরিণত নগরও আছে বেশ কিছু। যেগুলোর এখনো টিকে আছে সেগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ধ্বংসস্তূপের পরিণত হতে ওদের আর বেশি বাকি নেই।

ভারতের কথা ছেড়ে দিয়েও দেখা যায়, আরো কাছাকাছি অন্যান্য দেশের অবস্থাও প্রায় একই রকম। সেই স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রীয় শক্তির ধ্বংসলীলার সুস্পষ্ট চিহ্ন সব জায়গায় বিরাজমান– মেসোপোটেমিয়া, আনাটোলিয়া, ফিলিস্তিন– সর্বত্র। এক সময় এই দেশগুলোকে বলা হতো সোনার দেশ। মাটিতে সোনা ফলতো বললেও ভুল বলা হয় না। দিগন্তবিস্তৃত শস্যশ্যামল ফসল ক্ষেত এই সব দেশের প্রাকৃতিক শোভাবর্ধন করতো। আর সেখানে এখন মরুভূমির অবস্থা বিরাজ করছে। ক্ষেতের দিকে তাকালে কল্পনা করা যায় না, যেখানে আবাদ করলে সোনা ফলতো, এখন সেখানে জলা-জঙ্গল, কীটপতঙ্গের উপদ্রব্য হয়েছে এবং মানুষ বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠেছে।

ফসলে ঝলমল করা দেশ মিসরের ইতিহাসও ঐ একই রকম– দাসত্ব ও ক্রমিক অবনতির ইতিহাস। মিসরের দশভাগের একভাগ অঞ্চল বিগত আশি বছরে অনাবাদী পতিত জমিতে পরিণত হয়েছে। জলসেচনের প্রণালীগুলো সংস্কার করা হয়নি এবং করার জন্য কোনো কর্তৃপক্ষই মাথা ঘামায়নি। নীলনদের নিয়ন্ত্রণের সমস্যা নিয়েও কেউ মাথা ঘামানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। তার ফলে ভাঁটি অঞ্চল প্রতি বছর প্রবল বন্যায় ভেসে যায় এবং বালিতে ঢেকে যায়। এই বালির আবরণ পরিষ্কার করা রীতিমতো শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য।

শিল্পী ও শিল্পকলার অবস্থা

দেশের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে কোনো শিল্পকলার সুষ্ঠু বিকাশ হতে পারে না। কোনো শিল্পী শিল্পকলার উৎকর্ষের জন্য এই পরিবেশের মধ্যে আত্মোৎসর্গ করতে পারে না। যে দেশে দারিদ্রের বীভৎসতা প্রকট, ধনীরা কৃপণতাকে জীবনের ধর্ম বলে গ্রহণ করে, সুলভ মূল্যের দ্রব্যাদির জন্য লালায়িত থাকে, সেখানে শিল্পকলার উৎকৃষ্টতা বা সৌন্দর্যের কোনো মূল্য থাকে না।

যে দেশের ধনীরা ফকিরের মতো জীবন যাপন করাটা জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মনে করে, না খেয়ে না পরে শুধু মাটির তলায় টাকা পুঁতে রাখতে চায়, খরচ করতে চায় না, তাদের জীবন সম্বন্ধে কোনো উদার দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে না। আর যাই হোক, তারা কখনো শিল্পকলার সমঝদার বা পৃষ্ঠপোষক হতে পারে না। এ অবস্থায় শিল্পকলা বা শিল্পীর বিকাশ বা সমৃদ্ধি কখনই সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যেখানে শিল্পীদের তথাকথিত 'অপরাধের' জন্য কথায় কথায় বেত্রাঘাত করতে সঙ্কোচ বোধ হয় না, সেখানে শিল্পীরা তো মানুষ বলেই গণ্য নন! শিল্পীদের সেখানে কোনো মর্যাদা নেই, কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্যের অধিকার নেই। সৃষ্টিযোগ্যতার জন্য তাদের কোনো সম্মান দেয়া হয় না। তারাও সমাজের অন্যান্য শ্রেণির মতো দাসত্বই করে। যেখানে শিল্পসৃষ্টির স্বাধীনতা নেই এবং তার কোনো স্বীকৃতিও নেই, সেখানে শিল্পকলার উন্নতির জন্য শিল্পীরা কোনো প্রেরণা পেতে পারে না।

শিল্পীদের আর্থিক অবস্থাও শোচনীয়। অর্থ উপার্জনের কোনো স্বাধীনতা শিল্পীর নেই। ধন-সম্পত্তি সঞ্চয় করার অধিকারও নেই। বংশপরম্পরায় শিল্পীদের অস্তিত্ব বজায় রাখাই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। একেবারে ক্রীতদাসের মতো অবস্থা। একটু মূল্যবান পোশাক পর্যন্ত তারা ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ পোশাক দেখে যদি আমির-ওমরাহ বা জায়গীরদার-জমিদারদের মনে সন্দেহ হয় যে তিনি বিত্তশালী, তাহলে তার পরিত্রাণ নেই।

আমার বিশ্বাস, ভারত থেকে শিল্পকলার অস্তিত্ব বহুদিন আগে বিলুপ্ত হয়ে যেতো যদি সম্রাট ও আমির-ওমরাহরা বেতনভুক্ত শিল্পী নিয়োগ না করতেন, তাঁদের বংশধরদের শিল্প শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা না করতেন, এবং একই সঙ্গে পুরস্কার ও তিরস্কার বা চাবুকের ভয় না দেখাতেন।

ধনিক-বণিক ও ব্যবসায়ীরাও শিল্পীদের নিজেদের কাজকর্মের জন্য নিয়োগ করে এবং তার জন্য শিল্প ও শিল্পীর অস্তিত্ব কিছুটা বজায় থাকে। অনেক সময় তারা বেশি মজুরিও দেয়। কোনো মহানুভবতা বা উদারতার জন্য নয়, তা তারা করে সম্পূর্ণ নিজেদের স্বার্থের জন্য। চাবুকের ভয় দেখিয়ে ধনী বণিকরাও কারিগর ও শিল্পীদের কাজ করাতে দ্বিধাবোধ করে না।

কারিগর ও শিল্পীদের কোনো ভাবেই ধন সঞ্চয় করার উপায় নেই। দু বেলা দু মুঠো খেয়ে, সামান্য মোটা কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করে তারা বেঁচে থাকে এবং তাতেই তারা খুশি। তাদের তৈরি কারুশিল্পাদি বিক্রয় করে প্রচুর ধন সঞ্চয় করে বণিকরা এবং বণিকদের লক্ষ্য হলো তাদের পৃষ্ঠপোষকদের সন্তুষ্ট করা– শিল্পীদের নয়।

শিক্ষা ও বাণিজ্যের অবস্থা

এই যে সমাজের পরিচয় দিলাম, এর ভবিষ্যৎ কি? এরকম সামাজিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হতে পারে না। অশিক্ষাই এই সমাজ ব্যবস্থার অনিবার্য পরিণাম। ভারতে এই অবস্থার মধ্যে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলেজ বা একাডেমি জাতীয় কিছু কি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? আমার তো মনে হয়, সম্ভব নয়। কারণ প্রতিষ্ঠাতা কোথায় পাওয়া যাবে, কে প্রতিষ্ঠা করবেন? প্রতিষ্ঠা করলেও বা বিদ্যান ব্যক্তি কোথায় পাওয়া যাবে? তেমন লোকই বা কোথায়, যারা শিক্ষার জন্য খরচ করবেন? যদিও বা সেরকম দু-চারজন থাকেন, তারা তা ভয়ে করবেন না। কারণ তাদের যে আর্থিক সামর্থ্য আছে, এ কথা তারা প্রকাশ্যে প্রচার করতে চান না। আর যদি কেউ এতো সমস্যা সত্ত্বেও শিক্ষা পায়, তাহলে সেই শিক্ষার উপযুক্ত মর্যাদাই বা কে দেবে? অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম বা দাফতরিক চাকরি-বাকরি এমন কিছু নেই যার জন্য বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা প্রয়োজন। সুতরাং তরুণরা শিক্ষার প্রেরণাই বা পাবে কোথা থেকে? এ অবস্থায় ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়।[১০] কারণ বাণিজ্যের অধিকার যদি বাধাবন্ধনহীন না হয়, তাহলে তার বিস্তারও হয় না।

ইউরোপের মতো তাই ভারতে বাণিজ্যিক উন্নতি হয়নি। এমন লোক কে আছে, যে পরের স্বার্থের জন্য নিজে পরিশ্রম করবে, দুশ্চিন্তা করবে এবং বিপদ-আপদের সম্মুখীন হবে?

প্রাদেশিক সুবাদার যদি বাণিজ্যের মুনাফার মোটা অংশ গ্রাস করে ফেলে, তাদের বণিকদের বাণিজ্য করার দরকার কি? যে বণিক যতোই মুনাফা করুক না কেন, লোকসমাজে তাকে দীনদরিদ্রের বেশেই থাকতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যভোগও নিশ্চিন্তে করতে পারবে না। কারণ তাহলেই সে প্রতিবেশী, জমিদার বা সুবাদারের ঈর্ষার পাত্র হবে এবং তার ধন-সম্পত্তি থেকে হয়তো বঞ্চিতও হবে।

সাধারণত বণিকরা উচ্চপদস্থ ফৌজদার বা আমিরের আশ্রয়ে থেকে ব্যবসা করে। তা না হলে ব্যবসা করা বিপজ্জনক। তাহলেও কিন্তু ভারতে

---

১০. প্রাচীন যুগ থেকে ব্রিটিশ যুগের আগপর্যন্ত ভারতীয় বণিকশ্রেণির বিকাশের ইতিহাস নিয়ে আজও অর্থনীতির বা ইতিহাসের কোনো ছাত্র গবেষণা করেননি। অথচ ভারতীয় বণিকরা ক্রমবিকাশের ধারা বিশেষভাবে অনুসন্ধানের বিষয়। ভারতীয় বণিকরা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করতো এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হলো না, কেন এদেশ শিল্প-বাণিজ্যের যুগের আবির্ভাব হলো না, কেন বণিকরা যুগে যুগে সমাজের উপেক্ষার পাত্রই হয়ে রইলো, এ সব প্রশ্ন ইতিহাসের দিক দিয়ে জটিল প্রশ্ন। বার্নিয়ার এই জটিল প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করেছেন এবং বিস্ময়কর বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।–অনুবাদক।

বণিকের কোনো স্বাধীনতা বা সম্মান নেই। বণিকদেরকে তাদের পৃষ্ঠপোষক আশ্রয়দাতাদের ক্রীতদাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাদের আশ্রয় ও পোষকতার জন্য তারা বণিকদের কাছে যে কোনো মূল্য দাবি করতে পারে। সাধারণত সেই মূল্য হচ্ছে আশ্রয়দাতার খেয়ালখুশি মতো বাণিজ্যের মুনাফার অংশ ।

মোগল সম্রাট তাঁর নিজের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের জন্য কখনো রাজবংশ ও সম্ভ্রান্ত বংশের লোক নির্বাচন করেন না। এমন কি সাধারণ ভদ্র নাগরিক, বণিক বা ব্যবসায়ী কেউ কোনোদিন তাঁর নেকনজরে পড়ে না। শিক্ষিক লোক, সঙ্গতিপন্ন পরিবারের লোক, যারা সাহস ও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকর্তব্য পালন করতে পারে, বিপদে-আপদে নিজেদের সামর্থ্য নিয়ে সম্রাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে, দেশের প্রতি যাদের অনুরাগ বেশি, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে যারা সচেতন, তারা কেউ সম্রাটের রাজকার্যের দায়িত্ব পালন করার জন্য আমন্ত্রিত হয় না। তার বদলে সম্রাট নিরক্ষর ও বর্বর ক্রীতদাস পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতে ভালোবাসেন। সমাজের জঘন্য আবর্জনাস্তূপ থেকে কুড়িয়ে নেয়া একদল পরানুগ্রহী মোসাহেব তাঁকে ঘিরে থাকে। তারা দেশপ্রেম বা রাজভক্তি কাকে বলে জানে না। তার ধারও ধারে না। সম্রাটের নেকনজরে থেকে তারা মিথ্যা দম্ভের বড়াই করে শুধু, সৎসাহস, সম্মান বা শালীনতার তোয়াক্কা করে না। দরবারের শোভা তারাই বর্ধন করে।

এভাবে ভারত ক্রমে অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে যাচ্ছে। বিশাল একদল সেনাবাহিনী ও বিরাট এক রাজদরবারের কৃত্রিম জাঁকজমকের ব্যয়ভার বহন করতেই ভারত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনীর প্রয়োজন। কারণ তারই জোরে ভারতের জনসাধারণকে পদানত করে রাখতে হয়। সৈন্য না হলে ভারতে সম্রাটের পক্ষে রাজত্ব করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

ভারতের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশারও সীমাহীন। শুধু চাবুকের জোরে তাদের ক্রীতদাস করে রাখা হয়েছে। তারা অমানুষিক খাটুনিও খাটে এবং চাবুক মেরেই তাদের খাটানো হয়। নানাভাবে নির্যাতন করে জনগণকে বিদ্রোহের প্রান্তে আনা হয়েছে ভারতে। গণবিদ্রোহ শুধু সামরিক শক্তির জোরে দাবিয়ে রাখা হয়েছে।

আমি বলবো, ভারত এক হতভাগ্য দেশ। ভারতের দুর্ভাগ্যের আরও একটা বৈশিষ্ট্য হলো, বড় যুদ্ধবিগ্রেহের সময় বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার প্রচুর অর্থের বিনিময়ে আত্মবিক্রয় করে। প্রাদেশিক সুবাদাররা ক্রয়মূলের এই টাকা কড়ায়গণ্ডায় আদায় করে নেয়। উচ্চহারে সুদ দিয়ে টাকাটা তারা কর্জ করে। প্রদেশগুলো এভাবে কেনা হোক বা না হোক, সম্রাটের ওপর যার যথেষ্ট প্রভাব আছে, তেমন উজীর, খোজা বা বেগমমহলের কোনো মহিলাকে প্রতিবছর

প্রত্যেক সুবাদার, জায়গীরদার ও রাজস্ব আদায়কারী জমিদারদের মূল্যবান উপহার পাঠাতে হয়। ভেট না দিয়ে কোনো কাজ হাসিল করার উপায় নেই। প্রাদেশিক সুবাদার সম্রাটের নিয়মিত কর-পেস্কাদিও আদায় করে দেয়। এভাবে একজন অতি নিম্নশ্রেণির লোক, ক্রমে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হয়ে দেশের মধ্যে হোমরাচোমরা ব্যক্তি বলে গণ্য হয়।

আবার বলছি, ভারত প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। অগ্রগতির কোনো চিহ্ন নেই কোথাও। মনে হয় আলোর কোনো আভাস নেই, চারদিকে কারগারের ভয়াবহ নিস্তব্ধতা ও গাঢ় অন্ধকার থমথম করছে।

প্রাদেশিক সুবাদাররা হঠাৎ নবাব হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করে এবং এই জাতীয় ক্ষুদে নবাবের উৎপীড়ন, অত্যাচার ও যথেচ্ছাচার করার ক্ষমতাও অপরিসীম। তাদের ঔদ্ধত্যের রশি সংযত করার মতো কেউ নেই। এই সীমাহীন অত্যাচার দিনের পর দিন মাথা হেঁট করে ভারতের জনসাধারণ নীরবে সহ্য করে। প্রতিকারের কোনো পথ নেই, ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই। অভিযোগ ও আবেদন করার মতো কোনো নিরপেক্ষ বিচারক নেই কোথাও। রক্ষকরাই সেখানে ভক্ষক।

ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ

এ কথা অবশ্য ঠিক যে, মোগল সম্রাট প্রত্যেক প্রদেশে একজন করে 'ওয়াকীনবীশ'[১১] পাঠান। তাদের একমাত্র কাজ হলো সেই প্রদেশে যা ঘটবে তা ঠিকভাবে সম্রাটকে জানানো। কিন্তু বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তার সঙ্গে প্রায়ই এই ওয়াকীনবীশদের মধ্যে দ্বিমতের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে বিরোধও দেখা দেয়। সুতরাং প্রজাদের কোনোদিক থেকেই

---

১১. 'ওয়াকী' কথার অর্থ 'ঘটনা' বা সংবাদ। 'ওয়াকীনবীশ অর্থ যিনি ঘটনার খোঁজ রাখেন, হিসাব রাখেন। উইলসনের অভিধানে 'ওয়াকীনবীশ' সম্বন্ধে এই বিবরণ দেয়া হয়েছে :

'A remembrancer, a recorder of events; an officer on the royal establishment under the Moguls, Who Kept a record of the various orders issued by and transactions connected with, the soverign, in the revenue department: an officer of his denomination was also attached to the Nazim or provincial governor, who reported to the principal remembrancer at the court the particular revenue transactions of the province: any communicator of official intelligence'-Wilson's Glossary.

ওয়াকীনবীশ সম্রাটের হুকুম লিখে নেন, সম্রাটের রোজনামচা লিখে থাকেন, সম্রাটের কাছে রোজ আবেদন অভিযোগ উপস্থিত হয় তার হিসাব রাখেন। এ ছাড়া সম্রাটের পানাহারের ব্যবস্থা, তাঁর হারেমে যাবার ব্যবস্থা, বরগাখাসে যাবার ব্যবস্থা, শিকারের উদ্‌যোগ ইত্যাদি করেন এবং নজর ফরমান, হুকুম ইত্যাদির হিসাব রাখেন। সাম্রাজ্যের ভেতরের ও বাইরের বিবরণপত্র কোথায় কি ঘটলো তার বিবরণ রাখা, এসব হলো ওয়াকীনবীশের কাজ। ওয়াকীনবীশ প্রতিদিন একটি রোজানামা লিখে এনে সম্রাটকে পড়ে শোনান এবং সম্রাট মঞ্জুর করলে তাতে মোহর দিয়ে দস্তখত করেন। এই দস্তখতী কাগজকে 'ইয়াদদস্ত' বা 'স্মারকলিপি' 'মেমরেন্ডাম বলে। (আইন-ই-আকবরী' থেকে সংগৃহীত)।–অনুবাদক।

নিশ্চিত হবার সুযোগ নেই। প্রজার দুঃখ-দুর্দশা, অভিযোগ সম্রাটের কর্ণগোচর হওয়াও সম্ভব নয়।

ভারতে 'সরকার' বিক্রি হয়। তবে তুরস্কের মতো অতোটা প্রকাশ্যে নয় এবং ঘনঘন তো নয়ই। 'প্রকাশ্যে' বিক্রির কথা বললাম এ জন্য যে, প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবাদাররা যে রকম নিয়মিতভাবে সম্রাটের কাছে মূল্যবান উপঢৌকন ও ভেট পাঠায়, তাতে একটা প্রদেশের শাসনাধিকার কেনা যেতে পারে। ভেটের মূল্য প্রায় প্রদেশের ক্রয়মূল্যের সমান হয়ে থাকে।

ভারতে একই লোক দীর্ঘকাল সুবাদার থাকেন, তুরস্কের মতো ঘনঘন বদলি হন না এবং দীর্ঘকালের স্থায়ী সুবাদররা প্রজাদের সুখ-সুবিধার দিকে তবু একটু নজর দেন, যা নতুন সুবাদাররা লোভের বশবর্তী হয়ে একেবারেই দেন না। স্থায়ী সুবাদাররা নিজেদের স্বার্থেও কিছুটা সংযত ব্যবহার করতে বাধ্য হন। কারণ তারা জানেন, অতিরিক্ত অত্যাচার করলে প্রজারা অন্য রাজার রাজ্যে গিয়ে বাস করবে এবং তাতে তারই ক্ষতি হবে। ভারতে এরকম প্রায়ই হয়ে থাকে।

ইরানে প্রকাশ্যে বা ঘনঘন সরকার বেচাকেনা হয় না। বংশানুক্রমে সেখানে অনেকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার ফলে ইরানের সাধারণ লোকের অবস্থা অনেক বেশি উন্নত। ইরানীরা তুর্কীদের চেয়ে অনেক বেশি অমায়িক এবং বিদ্যাচর্চার প্রতি তাদের অনুরাগও আছে। কিন্তু তুরস্ক, ইরান ও ভারত– এই তিনটি দেশের সম্রাটদের ব্যক্তিগত ধন-দৌলত বা ভূসম্পত্তির প্রতি বিশেষ কোনো শ্রদ্ধা নেই। এই দিক দিয়ে তিনটি দেশের সাদৃশ্য আছে মনে হচ্ছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করার অর্থ সব রকমের সামাজিক অগ্রগতির পথ বন্ধ করে দেয়া। এই মারাত্মক ভুলের জন্য এই দেশগুলোকে একদিন অনুতাপ করতে হবে এবং তারা বুঝতে পারবে অস্বাভাবিক ব্যবস্থার ফলে তাদের কি অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যে দেশের শাসকরা স্বীকার করেন না, সে দেশের অগ্রগতির কোনো আশা নেই।

আমার প্রায়ই মনে হয়, এইসব দেশবাসীর তুলনায় আমরা কতো সুখী! আমাদের দেশের সম্রাটরা সমস্ত ভূসম্পত্তির মালিক নন। তা যদি হতো তাহলে আমরা এতো সুন্দর দেশ, এতো বড় বড় শহর-নগর, এতো সব সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারতাম না। এতো লোকসংখ্যা বাড়তো না, এতো ফসল ফলতো না আমাদের দেশে। সম্পত্তির অধিকার যদি আমাদের না থাকতো, তাহলে ইউরোপের সম্রাটদের সঞ্চিত ধনরত্ন থাকতো প্রচুর এবং তাদের প্রতি প্রজাসাধারণের এরকম আনুগত্যবোধাও থাকতো না। রাজারা প্রত্যেকে

একাকী মরুভূমিতে রাজত্ব করতেন সন্ন্যাসী ও যাযাবর অধ্যুষিত মরুভূমিতে।

এশিয়ার রাজা-বাদশা বা সম্রাটরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তাদের ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা এতো বেশি ও অন্ধ যে, তারা রাজকীয় শক্তিকে ঐশ্বরিক শক্তির চেয়েও স্বেচ্ছাচারী মনে করেন এবং সবকিছু ভোগ-দখল করতে গিয়ে শেষমেশ প্রকৃতির নিয়মে সর্বস্ব হারাতে বাধ্য হন। তাঁদের টাকাপয়সা সংগ্রহের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আদায় করার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ব্যর্থ হন। আজ যদি আমাদের দেশেও এমন সম্রাট থাকতেন এবং দেশের ধন-সম্পত্তির ওপর তার একচেটিয়া অধিকার থাকতো, তাহলে আমাদের দেশে ধনী ব্যক্তির সংখ্যা এরকম বৃদ্ধি পেতো না আর ব্যবসায়ী ও কারিগরদের এতো উন্নতি হতো না। প্যারিস, লিঅঁ, তুলু, রুয়েঁর মতো এমন সুন্দর সুন্দর শহরও গড়ে উঠতো না। এতো নগর ও গ্রামের অস্তিত্ব থাকতো না। এতো সুন্দর সব ঘরবাড়ি তৈরি করা বা পাহাড়-পর্বতে ও উপকত্যকায় এতো যত্ন ও মেহনত করে প্রচুর পরিমাণ ফসল ফলানো, এসব কিছুই সম্ভব হতো না। তা ছাড়া আমাদের দেশের শিল্প-বাণিজ্য ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব রাষ্ট্র উপার্জন করে, তাই বা কোথা থেকে করা সম্ভব হতো? এই রাজস্ব থেকে রাজা ও প্রজা উভয়েই উপকৃত হয়। সম্পত্তির অধিকার না থাকলে এই অগ্রগতির পথ বন্ধ হয়ে যেতো। দেশের এই সমৃদ্ধ রূপ বদলে যেতো। এই বিচিত্র প্রাণৈশ্বর্য দেশ থেকে লোপ পেয়ে যেতো। আমাদের বড় নগরগুলো মানুষের বসবাস যোগ্য থাকতো না, নরকের মতো বিষাক্ত হয়ে উঠতো। তার পরিবেশ নিষ্ক্রিয় ও নিস্পন্দ হয়ে যেতো। কোনো লোকালয়ের চিহ্ন কোথাও থাকতো না।

আজ যে পাহাড়ি জমিতে আবাদ করে আমরা সোনা ফলাচ্ছি, তা আর সম্ভব হতো না তখন। সোনার বদলে, ফসলের বদলে কীটপতঙ্গ, বনজঙ্গল, কাঁটাগাছ ও বন্যজন্তুর জন্ম হতো সেখানে। পর্যটকদের জন্য এরকম সুন্দর ব্যবস্থা আমরা করতে পারতাম না। প্যারিস ও লিঅঁর মধ্যবর্তী পথে যে সব পান্থনিবাস আজ বিদেশী ও দেশী পর্যটকদের কলরবে মুখর হয়ে উঠছে, সে সব হয়তো কুৎসিত ক্যারাভান সরাইয়ে পরিণত হতো। আর পর্যটকরা যাবাবরের মতো নানা জায়গায় মালপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হতো।

এশিয়ার ক্যারাভান সরাইগুলোকে এক-একটি গোলাঘর বললেও ভুল বলা হয় না। শত শত পথিক ও দেশযাত্রী তার মধ্যে তাদের ঘোড়া, উট ও ঘোটক-গর্দভসহ একসঙ্গে বাস করে। সে এক বিচিত্র জীবন! মানুষ ও পশুর দল যে এভাবে মিলেমিশে দিনযাপন করতে পারে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না।

গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপের জন্য ক্যারাভান সরাইয়ে বাস করা যায় না, অতিষ্ঠ হয়ে উঠতে হয়। শীতকালেও শুধু জন্তুজানোয়ারের সাহচর্যের উত্তাপেই যাত্রীদের ওমের সন্ধান করতে হয়।

ভারত ছাড়াও এমন দু-একটি দেশ আছে যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকার না করা সত্ত্বেও শ্রীবৃদ্ধির কোনো ক্ষতি হয়নি। তার জন্য খুব বেশি দূর যাবার দরকার নেই– আমাদের কাছেই ইতালীর দৃষ্টান্ত দেয়া যায়। ইতালীতেও সম্পত্তির ব্যক্তিগত অধিকার বিধিসম্মত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতালী ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে গেছে। এতো বড় সাম্রাজ্য ইতালী এবং এতো সমৃদ্ধ সব দেশ সেই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে, বিনা চাষাবাসেও তাদের উর্বরতাশক্তি নষ্ট হবে না। এরকম যার সাম্রাজ্য, তার অবশ্য উন্নতির পথে কোনো বাধা না থাকাই উচিত। তার শক্তি ও ঐশ্বর্য তো থাকবে। কিন্তু এদিক দিয়ে বিচার করলে তুরস্কের সামর্থ্য ও সম্পদ যে কতো স্বল্প, তা বলা যায় না। অথচ তুরস্কের প্রাকৃতিক সম্পদ অতুলনীয়। তুরস্কের সম্পত্তির অধিকার যদি আজ থাকতো, সেখানকার মাটিতে যদি প্রচুর ফসল ফলতো এবং বহু লোকজন বসবাস করতো, তাহলে সেখানে আগেকার মতো সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব হতো না। কন্‌স্টানটিনোপলের মতো শহরে পাঁচ-ছ হাজার সৈন্য নিয়ে একটা বাহিনী গড়ে তুলতে এখন প্রায় তিন মাস সময় লাগে। তার কারণ কি? সে দেশের জনগণের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেছে, লোকশূন্য হয়ে গেছে দেশ এই নীতির কারণে।

তুরস্কের সাম্রাজ্যের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আমি ভ্রমণ করে স্বচক্ষে তার চরম দুরবস্থা দেখেছি। কল্পনা করা যায় না তার ভয়াবহতা। যেখানে গেয়েছি সেখানেই দেখেছি ধ্বংসের চিহ্ন, মৃত্যু, হতাশা ও নিষ্ক্রিয়তার চিহ্ন। কোনো প্রাণের সাড়া নেই কোথাও। লোকালয় প্রায় জনশূন্য।

তুরস্কের একটা বড় সম্পদ হলো, চতুর্দিক থেকে বন্দী করে আনা খ্রিস্টান ক্রীতদাসের দল। কিন্তু শুধু ক্রীতদাসের মেহনতে কি হবে? যদি তুরস্কের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী আরো কিছুকাল রাজত্ব করে, তাহলে তুরস্কের নিশ্চিত ধ্বংস সম্বন্ধে আমি জোরগলায় ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। কোনো সম্ভাবনা নেই তুরস্কের মতো দেশের উন্নতির ও অগ্রগতির। নতুন করে মাথা তোলার কোনো আশা নেই তার। ভেতরের দুর্বলতায় তুরস্কের পতন অবশ্যম্ভাবী, যদিও এখন মনে হয় যেন এই দুর্বলতাই তুরস্কের জীবনশক্তি জোগাচ্ছে। কারণ এখন তুরস্কে আর এমন কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা নেই যিনি কোনো পরিকল্পনা কার্যকর করার মতো অর্থ জোগাড় করতে পারেন। আর করতে পারলেও তার জন্য যে জনবলের প্রয়োজন হবে, তা সংগ্রহ করতে পারেন। দেশকে বাঁচিয়ে রাখার, সাম্রাজ্য রক্ষা করার এ এক বিচিত্র পদ্ধতি। তুরস্ক তার নিজের মধ্যেই

ধ্বংসের বীজ বহন করে চলেছে। জনসাধারণের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া আন্দোলনের স্পন্দন বন্ধ করতে গিয়ে তুরস্ক অনেকটা সেই পেগুর[১২] (মিয়ানমারের) কুখ্যাত রাজার মতো আচরণ করছে বলা চলে।

পেগুর (মিয়ানমারের) রাজা তাঁর রাজ্য রক্ষার জন্য রাজ্যের প্রায় অর্ধেক প্রজাকে দুর্ভিক্ষে ও অনাহারে মেরে ফেলেছিলেন, সারা দেশটাকে জঙ্গলে পরিণত করেছিলেন এবং দীর্ঘকালের জন্য প্রজাদের চাষাবাদের কোনো সুযোগও দেননি। তাতেও তিনি কৃতকার্য হননি। রাজ্যকে ভাগ করতে বাধ্য হোন শেষপর্যন্ত। অবশ্য এমন কথা আমি বলছি না যে হঠাৎ কয়েকদিনের মধ্যে তুরস্কের পতন হবে এবং তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। তা হয়তো হবে না। কারণ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোও এমন শক্তিশালী নয় যে তুরস্কের বিরুদ্ধে তারা সামরিক অভিযান চালাতে পারে। বিদেশীর সাহায্য ছাড়া তাদের আত্মরক্ষা করারও শক্তি নেই। এদিক দিয়ে তুরস্কের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন হবার কোনো আশঙ্কা নেই। কারণ বিদেশী রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের প্রতিবেশী শত্রুদের সন্দেহের চোখে দেখে এবং প্রয়োজনে বা বিপদে-আপদে কোনো সাহায্যই তারা করবে না। নিজের দুর্বলতায়, নিজের শক্তি অপচয়ের দোষে, নিজের অদূরদর্শিতা ও ভুল কূটনীতির জন্য তুর্কী সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে।

বিচারের সুযোগ

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, প্রাচ্যদেশে সাধারণ লোক সুবিচারের জন্য আইনের সাহায্য নিতে পারে না কেনো? কেনো তারা উজীর[১৩] বা প্রধানমন্ত্রী

---

১২. বার্নিয়ারের নিজের পাণ্ডুলিপিতে 'Brama' কথাটি আছে। ফার্ডিনান্ড মেন্ডেজে পিন্টো ১৫৪২-৪৫ সালে পেগু ভ্রমণ করেন। তদানীন্তন বার্মার রাজাকে তিনি 'Brama' বলে বর্ণনা করেছেন। পেগুর এই রাজা ১৫৩৯ সালে অনেক রাজভক্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে মৃত্যুদণ্ড দেন, অকথ্য অত্যাচার করেন প্রজাদের ওপর এবং তার ভয়ে দেশের লোকজন দেশ ত্যাগ করে। বার্নিয়ার বোধ হয় এই ঘটনার কথাই উল্লেখ করেছেন।—অনুবাদক।

১৩. 'উজীর' হলেন মোগল যুগের 'প্রধানমন্ত্রী'। এই পদমর্যাদার সঙ্গে অবশ্য বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তব্যের সম্পর্ক নেই। সাধারণত তিনি রাজস্ব বিভাগের প্রধান বলে গণ্য হতেন এবং তখন তাকে 'দেওয়ান' বলা হতো। দেওয়ান মাত্রই অবশ্য 'উজীর' ছিলেন না, বিশেষ করে হিন্দু দেওয়ানদের 'উজীর' বলা হতো না।
সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে প্রধানমন্ত্রীকে বলা হতো 'উকিল' (Wakil) এবং অর্থমন্ত্রীকে বলা হতো 'উজীর' (Wazir)।
'উজীর' কথার উৎপত্তি পহলবী শব্দ 'বিচির' (সংস্কৃত 'বিচার'?) থেকে হয়েছে বলে মনে করা হয়। এর অর্থ বিচারক।
প্রথম যুগের খলিফাদের শাসনকালে 'সেক্রেটারি অব স্টেট'কে বলা হতো 'কাতিব' বা লেখক। আব্বাসীরা ইরানীদের কাছে শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক দিক থেকে ঋণী এবং তারাই প্রথম 'উজীর' কথাটি ব্যবহার করে। ক্রমে উজীর পত্রলেখক থেকে ট্রেজারির প্রধান

অথবা সম্রাটের কাছে তাদের অভিযোগ বা আবেদন-নিবেদন পেশ করতে পারে না? বাধা কোথায়?

সেখানে বিচারের কোনো বিধানই যে নেই, তেমন তো নয়! স্বীকার করি– আছে। আইনকানুন, বিধিবিধান কিছুই যে এশিয়াতে নেই তা নয়, আছে এবং এও স্বীকার করি যে, সুষ্ঠুভাবে সেই বিধান মেনে চললে বা প্রয়োগ করলে বসবাসের দিক থেকে এশিয়া পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল থেকে কম উপভোগ্য হবে না। কিন্তু শুধু ভালো ভালো বিধান থাকলেই তো হয় না, এবং মনে মনে সদিচ্ছা থাকলেও কোনো লাভ নেই। কার্যক্ষেত্রে যথাসময়ে সেগুলো প্রয়োগ করা দরকার এবং তার সাহায্য নেয়ার সুযোগ দেয়াও প্রয়োজন। তা যদি না হয় বা না দেয়া হয়, তাহলে হাজার বিধান থাকা সত্ত্বেও ন্যায়বিচারের কোনো আশা নেই।

প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবাদাররা অন্যায় করে, অত্যাচার করে, ক্ষমতার অপব্যবহার করে পদে পদে, কিন্তু সেই একই উজীর বা একই সম্রাট কি তাদের প্রত্যেকবার ঐ পদে নিয়োগ করেন না? সুবাদাররা কি তাদেরই মনোনীত ব্যক্তি নয়? এই সম্রাট ও উজীরই হলেন হর্তাকর্তা-বিধাতা, ন্যায়-অন্যায়ের প্রধান বিচারক। অত্যাচারী শাসনকর্তা ছাড়া অন্য কোনো প্রকৃতির লোক নিয়োগ করার সাধ্যও নেই তাঁদের। তার কারণ, হয় সম্রাট, নয় তাঁর উজীর রাজ্যটিকে একরকম বিক্রি করে দেন। যিনি বেশি উপঢৌকন দেন, ভেট পাঠান, তাকেই তাঁরা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। আর যদিও স্বীকার করা যায় যে তাঁরা অভিযোগ শুনতে রাজি আছেন, তাহলেও কোনো দরিদ্র চাষী বা অসহায় কারিগরের পক্ষে অতো দূরে রাজধানীতে গিয়ে বিচারের জন্য হাজির হওয়া সম্ভব নয়। শত শত মাইল দূরে রাজধানীতে যাওয়ার খরচ তাদের কে জোগাবে? পায়ে হেঁটে যে তারা যাবে, তারও উপায় নেই। কারণ শেষপর্যন্ত সশরীরে পৌছবে কিনা, তা বলা যায় না। পথে হয়তো খুনে চোর-ডাকাতের হাতেই তাদের প্রাণ যাবে। ভারতে পথেঘাটে প্রায়ই এমন ঘটে থাকে। যদিও কোনো রকমে গিয়ে রাজধানীতে পৌছায়, সেখানে গিয়ে দেখবে

হন এবং আবেদন-নিবেদনের বিচারক হয়ে ওঠেন। ওসমানীয় তুর্কীদের রাজত্বকালে প্রায় 'সাতজন' উজীর ছিলেন। "As a rule, Wazir in later times was simply a title of the high officials" (Encyclopaedia of Islam, V.1135)

ভারতীয় শিক্ষাবিদ স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন : "Originally, the Wazir was the highest officer of the revenue department, and in the natural course of events control over the other departments gradually passed into his hands. It was only when the king was incompetent, a pleasure-seeker or a minor, that the wazir controlled the army also....it was only under the degenerate descendants of Aurangzib that the Wazirs became virtual rulers of the state, like the Mayors of the palace in mediaeval France.' (Jadunath Sarkar, Mughal Adminstration : পৃ. ২০-২১)–অনুবাদক।

সে পৌঁছানোর আগেই যার বিরুদ্ধে তার অভিযোগ, সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে সম্রাটের কাছে ব্যাপারটা বিবৃত করেছে। তার পরে তার পক্ষে কোনো আবেদন বা অভিযোগ করাও যা– না করাও তাই। মোটকথা, সুবাদারই সর্বময় কর্তা। বিচারক, আদালত, আইন, সভা, খাজনা, আবওয়াব নির্ধারণ ইত্যাদি সব ব্যাপারে সে সর্বময় অধীশ্বর। এই শ্রেণির শোষক ও অত্যাচারী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সম্বন্ধে এক ইরানী ভদ্রলোক বলেছেন যে, সুবাদাররা শুকনো বালি থেকে তেল নিংড়ে বের করে। কথাটা মিথ্যা নয়। স্ত্রী-পুত্র, ক্রীতদাস, রক্ষিতা, মোসাহেবদের নিয়ে সুবাদারদের যে বিশাল পোষ্যসংখ্যা থাকে, তাতে তাদের নির্দিষ্ট উপার্জিত আয়ে কুলোয় না।

যদি কেউ বলেন যে, আমাদের দেশের (ফ্রান্সের) সম্রাটেরও তো জমিদারি আছে এবং সেই জমিদারিতে ভালোভাবে চাষাবাস হয়, যথেষ্ট লোকজন বাস করে, তাহলে তার উত্তরে আমি বলবো– যে রাজ্যের রাজা অন্য আরো অনেকের মতো জাতীয় ভূসম্পত্তির সামান্য একাংশের মালিক মাত্র, তার সঙ্গে যিনি সমস্ত সম্পত্তির মালিক– এমন কোনো সম্রাটের তুলনা হতে পারে না।

ফ্রান্সে এমন সুন্দর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে যে, সম্রাট নিজেই তা সর্বপ্রথম মান্য করেন। তিনি যে ভূসম্পত্তির মালিক, সেখানেও তিনি সম্রাট বলে আইনকানুন অমান্য করে মালিকানা খাটাতে পারেন না। তার জমিদারির প্রত্যেকটি লোকের আদালতের সাহায্য নেয়ার ন্যায্য অধিকার রয়েছে এবং প্রত্যেক চাষী ও কারিগরের অন্যায়ের প্রতিকার করার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু এশিয়াতে তা নেই। এশিয়ায় দুর্বল ও অসহায়ের কোনো আশ্রয় নেই। অন্যায় ও অবিচারের প্রতিকার করার কোনো পন্থা বা সুযোগ নেই তাদের। একজন অত্যাচারী শাসকের চাবুক ও মর্জিই সেখানে একমাত্র ন্যায়দণ্ড, তার ওপরে আর কিছু নেই।

কেউ কেউ হয়তো বলবেন, এই রকম এশিয়ার মতো, একজন রাজার ও শাসনকর্তার একনায়কত্ব যেখানে প্রতিষ্ঠিত, সেখানে সুবিধাও আছে অনেক। সেখানে আইনজীবী উকিলের সংখ্যা অল্প, মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও বেশি নয়। সামান্য যে দু-চারটি মামলা হয় তা তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যায়। বিলম্বিত বিচারের চেয়ে দ্রুত বিচার অনেক ভালো।

দীর্ঘস্থায়ী মামলা-মোকদ্দমা রাষ্ট্রের পক্ষে যে মারাত্মক ক্ষতিকর, তাতে কোনো সন্দেহ নেই এবং রাজার কর্তব্য এই ধরনের মামলা-মোকদ্দমার দ্রুত নিষ্পত্তির একটা ব্যবস্থা করা– এ কথা আমি স্বীকার করি। এ কথাও ঠিক, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার যদি কেড়ে নেয়া যায়, তাহলে আইন-আদালত বা মামলা-মোকদ্দমার ঝঞ্ঝাটও অনেক কমে যায়। 'আমার' 'তোমার' এ অধিকার যদি একেবারে হরণ করে নেয়া যায়, তাহলে মামলার সমস্যাও সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়, বিশেষ করে দীর্ঘস্থায়ী জটিল মামলার কোনো চিহ্নই থাকে না।

সম্রাট যে সব ম্যাজিস্ট্রেট বা হাকিম নিয়োগ করেন, তাদের অধিকাংশেরই তাহলে আর কোনো কাজ থাকে না এবং অসংখ্য আইন ব্যবসায়ীরও আর কোনো প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এ কথাও ঠিক, এভাবে যদি মামলা-মোকদ্দমার ব্যাধির চিকিৎসা করতে হয়, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কেড়ে নিয়ে যদি সমাজকে মামলামুক্ত করতে হয়, তাহলে ব্যাধির তুলনায় প্রতিষেধক অনেক বেশি ক্ষতিকর হবে। সে ক্ষতির কোনো খতিয়ান করা সম্ভব হবে না। হাকিমের বদলে আমাদের সম্রাট-নিযুক্ত প্রাদেশিক শাসকের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হবে এবং সেই নির্ভরতা যে কি ভয়াবহ তা আগে বলেছি।

এশিয়ায় সুবিচার বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তাহলে তা একমাত্র দরিদ্র-নিম্নশ্রেণির লোকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। কারণ সে ক্ষেত্রে কোনো পক্ষই মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ পয়সা দিয়ে কিনে হাকিমকে প্রভাবিত করতে পারে না। দুই পক্ষই সমান দরিদ্র ও অসহায় বলে হাকিম অনেকটা নিরপেক্ষ বিচার করতে পারেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোনো সুবিচারের আশা নেই। ধনীর পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভবপর এবং এরকম সাক্ষী সেখানে যথেষ্ট পাওয়া যায় সস্তায়। দীর্ঘকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি এসব কথা বলছি। নানাদিক থেকে খোঁজ করে, নানাজনকে জিজ্ঞেস করে আমি এইসব তথ্য অনেক কষ্টে সংগ্রহ করেছি। শুধু ভারতের লোক নয়, সেখানকার ইউরোপীয় ব্যবসায়ী, রাজদূত, কনসাল, দোভাষী– সকলের মতামত যাচাই করে গ্রহণ করেছি প্রত্যেকটি তথ্য। আমি জানি, আমার এই বিবরণের সঙ্গে অন্য অনেক পর্যটকের বিবরণ মিলবে না। তাঁরা হয়তো কোনো শহরের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ কাজীর সামনে দুজন অপোগণ্ড লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। দেখেছেন হয়তো হাকিম তাদের 'মুসালিহ বাবা' (শান্তিতে থাকো, বাবা) বলে বিদায় দিচ্ছেন। দুই পক্ষের এক পক্ষেরও যদি ঘুষ দেয়ার ক্ষমতা না থাকে এবং দুই পক্ষই যদি সমান দরিদ্র হয়, তাহলে অনেক সময় কাজীরা এরকম বিচারই করে থাকেন। 'শান্তিতে থাকো, বাবা' বলে তাদের দ্রুত বিদায় করে দেন। অন্যান্য পর্যটকরা এরকম কাজীর বিচার দেখে বাইরে থেকে হতবাক হয়ে গেছেন। ভেবেছেন, এরকম সুন্দর বিচার আর হয় না। বিচার তো বিচার, কাজীর বিচার! কিন্তু ভেতরে তারা একেবারেই তলিয়ে দেখেননি। যদি দেখতেন, তাহলে দেখতে পেতেন কাজীর বিচার সত্যই কি! দুই পক্ষের মধ্যে একপক্ষের যদি দুটো টাকা কাজীর ট্যাকে গুঁজে দেয়ার সাধ্য থাকতো, তাহলেই কাজীর বিচার অন্যরকম হয়ে যেতো। 'শান্তিতে থাকো, বাবা' বলে তখন তিনি আর দুই পক্ষকেই বিদায় দিতেন না। বেশ ধীরে-সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে বিচার করতেন এবং যে পক্ষ 'কিঞ্চিত' দিয়েছে, মিথ্যা সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করেছে, সেই পক্ষেরই সমর্থনে তিনি বিচক্ষণের মতো রায় দিতেন।

অবশেষে এ কথা বলে আমি এই চিঠি শেষ করতে চাই : ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হরণ করার অর্থ হলো– অন্যায়, অত্যাচার দাসত্ব, অবিচার, ভিক্ষাবৃত্তি ও বর্বরতার পথ পরিষ্কার করা। মানুষ তাহলে জমিতে আবাদ করে ফসল ফলাবে না এবং দেশ পরিত্যক্ত মরুভূমিতে পরিণত হবে। সম্রাটের সর্বনাশের পথ, রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হবে। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তিই হলো মানুষের একমাত্র আশা-ভরসা প্রেরণা, যাতে মানুষ উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

মানুষ তার মেহনতের ফলভোগ করবে নিজে এবং সেই ভোগের অধিকার দিয়ে যাবে তার বংশধরদের– এই হলো মানুষের কামনা। এই কামনা চরিতার্থ হয় বলেই মানুষের হাতে পৃথিবীর রূপ বদলে যায়, সুন্দর হয়ে ওঠে পৃথিবী। যে কোনো দেশের দিকে চেয়ে দেখলেই বোঝা যায়, যেখানে এই অধিকার কেড়ে নেয়া হয়নি সেখানে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে এবং যে দেশে এই পবিত্র অধিকার থেকে মানুষ বঞ্চিত, সে দেশ ক্রমে শ্রীহীন হয়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির জাদুস্পর্শেই পৃথিবীর পরিবর্তন হয়, নতুন রূপ ধারণ করে পুরনো পৃথিবী।

দিল্লী ও আগ্রা

[বার্নিয়ারের এই চিঠিটি শুধু মোগল সম্রাটদের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রার প্রাচীন ঐতিহাসিক বিবরণের জন্য মূল্যবান নয়, দরবারের কার্যপ্রণালী, তখনকার লোকসমাজের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি ইত্যাদি বিশ্বস্ত ও বিস্তৃত কাহিনী হিসেবেও মূল্যবান। এককথায়, এই চিঠিটিকেও মঁশিয়ে কলবার্টের কাছে লেখা চিঠির মতো ভারতের সামাজিক ইতিহাসের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলা চলে। এই চিঠিটি বার্নিয়ার ১৬৬৩ সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সের মঁশিয়ে দ্য লা ভেয়ারের কাছে লিখেছিলেন। নৃবিজ্ঞান, ভূবিজ্ঞান ও ইতিহাসের বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন দ্য লা ভেয়ার। সে সময়কার ফরাসী বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের মধ্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। বার্নিয়ার ছিলেন দ্য লা ভেয়ারের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। ভেয়ার যখন মৃত্যুশয্যায় তখন বার্নিয়ার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। বার্নিয়ারকে দেখেই মুমূর্ষু দ্য লা ভেয়ার উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন : কি সংবাদ মঁশিয়ে, মোগল সাম্রাজ্যের সংবাদ কি বলুন।]

মঁশিয়ে ভেয়ারের কাছে লেখা বার্নিয়ারের চিঠি

মঁশিয়ে, আমি জানি স্বদেশে ফিরে আসার পর আপনি প্রথমেই আমাকে মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লী ও আগ্রা শহরের কথা জিজ্ঞেস করবেন। সৌন্দর্যে, আয়তনে ও লোকজনের বসবাসের দিক দিয়ে ফরাসী শহর প্যারিসের সঙ্গে দিল্লী ও আগ্রার তুলনা হয় কি না, সে কথা জানবার জন্য এবং আমার কাছ থেকে শোনবার জন্য আপনি ব্যাকুল হয়ে উঠবেন। আপনার সেই ব্যাকুলতা ও কৌতূহল মেটাবার জন্যই আমি এই চিঠি লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। শুধু শহরের বিবরণ নয়, চিঠির মধ্যে এমন আরোও অনেক কথা বলবো, যা আপনার কাছে চিত্তাকর্ষক মনে হবে।

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য শহর

দিল্লী ও আগ্রার সৌন্দর্য প্রসঙ্গে প্রথমেই একটি কথা আমি বলতে চাই। আমি দেখেছি, অনেক সময় ইউরোপীয় পর্যটকরা বেশ একটু উদাসীনতা আর তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভারতের এসব শহরের কথা বলে থাকেন। তাঁদের মন্তব্য শুনে আমি অবাক হয়ে যাই। তারা যখন পাশ্চাত্য শহরের সঙ্গে এই সব শহরের সৌন্দর্যের তুলনা করেন তখন একটি কথা একেবারেই ভুলে যান যে, ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ অনুযায়ী স্থাপত্যের বিভিন্ন স্টাইলের বিকাশ

হয়। প্যারিস, লন্ডন বা আমস্টার্ডামের স্থাপত্য আর হিন্দুস্থানের দিল্লীর স্থাপত্য এক ও অভিন্ন হতে পারে না। কারণ ইউরোপে যে পদ্ধতির ঘরবাড়ি বাসোপযোগী, হিন্দুস্থানে তা ব্যবহার্য নয়। কথাটা যে কতোখানি সত্য, তা রাজধানী স্থানান্তরিত করলেই বোঝা যেতে পারে। ইউরোপের শহর যদি ভারতে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে তা সম্পূর্ণ ধূসিসাৎ করে নতুন পরিকল্পনায় আবার তা গড়ে তোলার দরকার হয়ে পড়বে।

ইউরোপের শহরের সৌন্দর্য অতুলনীয় এ কথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু তার একটা নিজস্ব রূপ আছে, যেটা শীতপ্রধান দেশের শহরের নিজস্ব রূপ। সেই রকম দিল্লীরও একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে, যেটা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের নিজস্ব সৌন্দর্য। ভারতে গরম এতো বেশি যে, কেউ সেখানে পায়ে মোজা পরে না, এমন কি স্বয়ং সম্রাটও নন। স্যান্ডেলই পায়ের একমাত্র আচ্ছাদন। মাথার আভরণ পাগড়ি, তাও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কাপড়ের। অন্যান্য পোশাক-পরিচ্ছদও সেই অনুপাতে খুব সূক্ষ্ম এবং হালকা।

গ্রীষ্মকালে সাধারণত কোনো ঘরের দেয়ালে হাত দেয়া যায় না, অথবা কোনো বালিশে মাথা রাখাও যায় না। বছরে ছ'মাসেরও বেশি সময় মানুষজন প্রায় বাইরে খোলা জায়গায় শুয়ে ঘুমোয়। সাধারণ লোক রাস্তাতেই শুয়ে থাকে। বণিক বা অন্যান্য ধনিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাদের বাগানে বা খোলা বারান্দায় শুয়ে নিদ্রা যায়। তা না হলে ভালো করে ঘরের মেঝে পানি দ্বারা মুছে নিয়ে তারপর ঘুমোয়। এ অবস্থায় একবার কল্পনা করুন যে আমাদের এই সব শহরের কোনো রাস্তা যদি তার ঘিঞ্জি ঘরবাড়িসহ ভারতের কোনো শহরে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহলে কি হতে পারে। ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি, তার ওপর প্রত্যেকটি বাড়ির উপরতলার শেষ নেই যেনো। এই সব বাড়িতে এভাবে কি সেখানে মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভবপর? রাতে কি সেখানে এই সব বাড়ির বদ্ধ ঘরে ঘুমিয়ে থাকা যায়, যখন বাইরে হাওয়া পর্যন্ত থাকে না এবং গরমে দম বন্ধ হয়ে আসে?

এমনটা ধরে নিন, একজন ঘোড়ায় চড়ে বহুদূর ঘুরে ক্লান্ত হয়ে বাড়িতে ফিরলেন। গ্রীষ্মের উত্তাপে তিনি প্রায় অর্ধমৃত, ধূলায় আচ্ছাদিত, নিশ্বাস পর্যন্ত ফেলতে পারছেন না। এমন অবস্থায় যদি তাকে একটি সঙ্কীর্ণ ঘুপচি সিঁড়ি ভেঙে চারতলা-পাঁচতলার কোনো কক্ষে উঠে সেখানে বিশ্রাম নিতে হয়, তাহলে কি অবস্থা হয় তার? ভারতে এসবের কোনো বালাই নেই। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানীয় পান করে, পোশাক-পরিচ্ছদ ছেড়ে মুখ-হাত, পা ধুয়ে আরামকেদারায় আপনাকে সেখানে শুয়ে পড়তে হবে। এবং পাখাওয়ালকে বলতে হবে টানাপাখা টানতে। সে যা হোক, এখন আমি আপনাকে দিল্লী শহরের আসল বর্ণনা সবিস্তারে লিখছি, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন দিল্লীকে সুন্দর শহর বলা চলে কি না, অথবা দিল্লীর কোনো নিজস্ব সৌন্দর্য আছে কিনা।

দিল্লীর কথা

বর্তমান সম্রাট আওরঙ্গজেবের পিতা সম্রাট শাহজাহান নিজের নাম অমর করে রাখার জন্য প্রায় চল্লিশ বছর আগে দিল্লী শহর গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছিলেন। নতুন রাজধানীর নাম তাঁর নামেই হবে, এই ছিল তার বাসনা; করেছিলেনও তাই।

প্রাচীর ঘেরা মোগল রাজধানী দিল্লী

দিল্লী শহর যখন নতুন তৈরি হলো তখন তার নাম রাখা হলো 'শাহাজাহানবাদ', সংক্ষেপে 'জাহানবাদ'। অর্থাৎ সম্রাট শাহজাহানের বাসস্থান। শাহজাহান সিদ্ধান্ত নেন যে, নতুন দিল্লীতেই তিনি তাঁর রাজধানী স্থানান্তরিত করবেন। কারণ আগ্রায় গ্রীষ্মের উত্তাপ এতো বেশি যে, সেখানে তাঁর পক্ষে বাস করা সম্ভব নয়।

প্রাচীন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষের ওপর নতুন দিল্লী নগরী গড়ে উঠলো। ভারতে এখন আর কেউ দিল্লীকে 'দিল্লী' বলে না, 'জাহানবাদ' বলে। জাহানবাদ নতুন নাম, এখনও বাইরে তেমন পরিচিতি পায়নি, তাই 'দিল্লী' নামেই আমি এখানে তার বর্ণনা করেছি।

দিল্লী নতুন শহর। যমুনা নদীর তীরে বেশ প্রশস্ত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত। লোয়ের নদীর সঙ্গে যমুনার তুলনা করা যায়। যমুনার তীরে শহরটি গড়ে উঠেছে ঠিক যেনো একফালি চাঁদের মতো– দুটি কোণ দুই দিকে এসে তীরের সঙ্গে মিশেছে। এক দিকে নৌকার একটি সেতু দিয়ে অন্য তীরে যাওয়া যায়। যেদিকে যমুনা নদী প্রবাহিত, সেদিক ছাড়া অন্য সব দিক ইটের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীর তেমন মজবুত নয়, এবং দুর্গের চারদিকে যেমন খাত থাকে

সেরকম কোনো খাতও নেই। প্রাচীরের পর শুধু চার-পাঁচ ফুট আন্দাজ চওড়া মাটির একটা বেদীর মতো আছে, আর প্রায় একশো পা অন্তর তোরণ আছে একটি করে। এমন কিছু বিরাট ব্যাপার নয়।

আমি নিজে শহরের এই প্রাচীর ঘুরে দেখেছি, তিন ঘণ্টার বেশি সময় লাগেনি। যদিও আমি ঘোড়ায় চড়ে ঘুরেছিলাম, তাহলেও ঘণ্টায় এক লীগের বেশি দ্রুত যাইনি। আমি কিন্তু শহরতলির কথা বলছি না, শুধু দিল্লী শহরের কথা বলছি। শহরের তুলনায় শহরতলির আয়তন আরোও অনেক বড়।

শহরের একদিকে প্রায় লাহোর পর্যন্ত সারবন্দী গৃহশ্রেণি চলে গেছে– প্রাচীন শহরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এবং তিন-চারটি ছোট ছোট শহরতলি অঞ্চল। এভাবে শহরটি আয়তনে এতো বড় হয়ে উঠেছে যে, দিল্লীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত সরলরেখা টানলে প্রায় দেড় লীগ দৈর্ঘ্য হবে। বৃত্তের ব্যাস সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারবো না। কারণ শহরতলিতে বাগান ও খোলা জায়গা আছে যথেষ্ট। তাই সব মিলিয়ে আয়তনের দিক দিয়ে দিল্লী শহরকে রীতিমতো বড় শহর বলা চলে।

দুর্গের অভ্যন্তর

দুর্গের প্রাঙ্গণে রাজপ্রাসাদ আছে। তাতে রয়েছে জেনানা বা বেগম মহল এবং আরও অন্যান্য সব রাজকীয় বিভাগ। সে সবের বিস্তারিত আলোচনা যথাসময়ে করবো।

দুর্গটি অর্ধবৃত্তাকার। সামনে নদী। প্রাসাদ ও নদীর মধ্যে বালুকাময় প্রশস্ত ব্যবধান। এই প্রশস্ত স্থানে, নদীতীরে হাতির লড়াই হয়, সম্রাট দেখেন। আমির-ওমরাহ, রাজা-মহারাজাদের সৈন্য-সামন্তের কুচকাওয়াজ হয়। রাজপ্রাসাদের গবাক্ষ দিয়ে সম্রাট এই সব ক্রীড়া ও কুচকাওয়াজ দেখেন।

অন্তদুর্গের প্রাচীর ও তার গোলাকার তোরণগুলো কতোটা বাইরের নগরের প্রাচীর ও নগর তোরণের মতো। তবে অন্তদুর্গের প্রাচীর ইট ও লাল পাথরের তৈরি বলে আরও বেশি সুন্দর দেখায়।

নগর-প্রাচীরের চেয়ে অন্তদুর্গের প্রাচীর অনেক বেশি মজবুত ও দৃঢ়। তার মধ্যে নগরের দিকে মুখ করে ছোট ছোট কামান বসানো থাকে।

নদীর অন্যান্য দিক পরিখা দিয়ে ঘেরা। পরিখায় পানি থাকে, মাছ থাকে, আর তার সামনে থাকে বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ড। এসব অবশ্য বাইরে থেকে দেখতে যতোটা জমকালো মনে হয়, আসলে ততোটা জমকালো নয়। আমার ধারণা, পরিমিত পরিমাণে যুদ্ধোপকরণ নিয়ে এ ধরনের আত্মরক্ষার দুর্গ সহজেই ধূলিসাৎ করা যায়।

পরিখার পাশে গড়ে তোলা বিরাট উদ্যানগুলো নানা রকমের ফুল ও গাছপালা দিয়ে সাজানো। বিশাল লাল রঙের প্রাচীরের পাশে এই সুবিস্তৃত সবুজের সমাবেশ অপূর্ব সুন্দর দেখায়।

বাগানের পাশেই বাদশাহী বাগ এবং তার ঠিক উল্টো দিকে শহরের দুটি বড় রাজপথের সংযোগস্থল। যেসব হিন্দু রাজা মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেছেন এবং তার জায়গীর বা বেতন পান, তারা প্রতি সপ্তাহে যখন দিল্লীতে কুচকাওয়াজ করতে আসেন তখন এই বাগের মধ্যে তাঁবু ফেলে থাকেন। তারা চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে চান না– মুক্ত স্থানে স্বাধীনভাবে থাকতে চান। এই রাজারা প্রধানত রাজপুত। দুর্গের মধ্যে সাধারণত ওমরাহ ও মনসবদাররা কুচকাওয়াজ করার জন্য অবস্থান করেন।

এই স্থানেই সম্রাটের ঘোড়াগুলোকে নিয়ে নিয়মিত দৌড় করানো হয়। এখান থেকে বাদশাহী ঘোড়াশালা খুব বেশি দূর নয়। সম্রাটের আস্তাবলে যে সব নতুন ঘোড়া আমদানি হয় এখানেই তাদের পরীক্ষা করা হয়। যদি তুর্কী ঘোড়া হয়, অর্থাৎ তুর্কিস্থান থেকে আমদানি হয়, যদি দেখা যায় যে তার যথেষ্ট শক্তি-সামর্থ্য ও তেজ আছে, তাহলে তার উরুতে বাদশাহী মোহর অঙ্কিত করে দেয়া হয়। তা ছাড়া যে আমিরের অধীনে সেই ঘোড়া থাকবে, তারও একটা ছাপ দেয়া হয়। ছাপ দেগে দেয়ার উদ্দেশ্য হলো, একই ঘোড়া কুচকাওয়াজের সময় যাতে অন্যের ঘোড়ার সঙ্গে মিশে না যায়।[১]

---

১. সম্রাট আকবর খুব ঘোড়া ভালোবাসতেন। আকবরের আমলে ইরাক, রুম, তুরস্ক বাদাকসান, সিরবান্, তিব্বত, কাশ্মীর প্রভৃতি দেশ থেকে ভালো ভালো ঘোড়া ভারতে আমদানি হতো। সম্রাটের ঘোড়াশালে সব সময়ই প্রায় বারো হাজার ঘোড়া মজুত থাকতো। ভালো ঘোড়া যখনই আমদানি করা হতো, তখনই তিনি পুরাতন ঘোড়া আমির-ওমরাহদের দান করে দিয়ে নতুন ঘোড়া কিনতেন। হিন্দুস্থানে যেমন ভালো ভালো ঘোড়া ছিল, তেমনি ঘোড়া বিশারদও ছিলেন। ভারতের কচ্ছ প্রদেশে (বর্তমানে এ অঞ্চলটি পাকিস্তানের অংশ) অতি উত্তম শ্রেণির ঘোড়া পাওয়া যেতো, সেগুলো আরবীয় ঘোড়ার তুলনায় কোনো অংশেই নিকৃষ্ট ছিল না।

বাংলার উত্তরে কোচপ্রদেশে তুর্কী আর পাহাড়ী তুটিয়া ঘোড়ার মিলনে একপ্রকার ঘোড়া জন্মাতো, তার নাম ছিল 'টাঙ্গন'। সম্রাট আকবর এতো ঘোড়াপ্রেমী ছিলেন যে, ভারতবর্ষে যেসব ব্যবসায়ী ঘোড়া বিক্রি করতে আসতেন, তিনি তাদের অভ্যর্থনা করার জন্য 'আমির কারাভানসরাই' ও 'তেপচক্রী' নামে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন।

ঘোড়াশালায় সাধারণত দুটি বিভাগ থাকতো– একটি খাসবিভাগ, আর একটি আম বিভাগ। খাসবিভাগ আরবীয়, পারসিক ও কচ্ছ প্রদেশের ঘোড়া থাকতো এবং সাধারণ বিভাগে থাকত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঘোড়া।

মোগল আমলে ঘোড়ারগাড়ি ব্যবহৃত হতো না। মানুষজন ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতো। যারা ঘোড়ায় চড়তে পারতো না তাদেরকে নিন্দার চোখে দেখা হতো। জাহাঙ্গীরের সময় যখন ইংরেজ দূত সার টমাস্ রো ভারতে এসেছিলেন তখন তিনি সম্রাটকে উপঢৌকন দেয়ার জন্য দু-তিন রকমের ঘোড়ার গাড়ি সঙ্গে এনেছিলেন। জাহাঙ্গীর

বাজারের জ্যোতিষী

কাছেই একটি বাজার আছে যেখানে এমন কোনো জিনিস নেই যা পাওয়া যায় না। বিচিত্র সব দ্রব্যসামগ্রী নানা দেশ থেকে আমদানি হয় সেখানে। বিচিত্র জিনিসের মতো নানা রকমের সব লোকজনেরও সমাবেশ হয়। যতো রকমের ভণ্ড, প্রতারক, হাতুড়ে বৈদ্য, জাদুকর এ দেশে আছে, সব এসে সেই বাজারে জড়ো হয়। জ্যোতিষীদেরও বেশ ভিড় হয় এবং তাদের মধ্যে হিন্দুও আছে মুসলমানও আছে। ভূত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের এই সব বিচক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানীরা মাটিতে শতরঞ্জ বা আসন পেতে চুপ করে বসে থাকে, হাতে থাকে নানা চেহারার কাঁটাকম্পাস, সামনে খোলা থাকে অদৃষ্টশাস্ত্রের একটি বিশাল গ্রন্থ এবং তার পাশে গ্রহ-উপগ্রহাদির স্থানাঙ্কিত একটি চিত্রপট। পথচারীরা তা দেখে আকৃষ্ট হয় এবং মনে করে যে জ্যোতিষীরা সৃষ্টিকর্তার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। তাদের মুখ দিয়ে যা উচ্চারিত হবে তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না, সাধারণ লোকেই এমন বিশ্বাস। অত্যন্ত গরিব যারা তারা হয়তো সামান্য একটি পয়সা দিয়েই তাদের ভবিষ্যৎ জানবার সুযোগ পায়। সুযোগটা সামান্য নয়। জ্যোতিষী প্রত্যেক মক্কেলের হাত ও মুখ ভালোভাবে নিরীক্ষণ করে, তারপর গণনার ভান করে নানান রকমের দুর্বোধ্য ভাষায় কি সব আবোল-তাবোল বিড়বিড় করে বলে বইয়ের পাতা উল্টায়। দেখাতে চায় সে কতো বড় পণ্ডিত এবং জ্যোতিষীর কাজটা কতো শ্রমসাপেক্ষ। এইসব ভড়ং দেখিয়ে সে মক্কেলকে একেবারে বশ করে ফেলে এবং তারপর সেই শুভ মুহূর্তটির কথা তার কানে কানে বলে দেয়– অমুক মাসে অমুক দিনে এ সময়ে তার মক্কেল যদি ঐ ব্যবসা আরম্ভ করে, তাহলে তার সাফল্য ও উন্নতি সুনিশ্চিত। কেউ তার লাভের পথ রোধ করতে পারবে না।

শুধু পুরুষ মক্কেলরাই যে হাত দেখাতে আসে তা নয়। আমি দেখেছি, স্ত্রীলোকেরাও হাত দেখাতে ও ভাগ্য গণনা করাতে আসে। আপাদমস্তক শরীর ওড়নায় ঢেকে স্ত্রীলোকেরা বাজারে এসে জ্যোতিষীর সামনে হাত প্রসারিত করে বসে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এমন কোনো গোপন কথা নেই যা তারা ঈশ্বরের মূর্তিমান প্রতিনিধি এই জ্যোতিষীদের কাছে না বলে। অপরাধীরা যেমন অনুতপ্ত হয়ে তাদের অন্যায় স্বীকার করে, ঠিক তেমনি করে তারা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সব গোপন কথা জ্যোতিষীদের কাছে স্বীকার করে এবং মুক্তির পথ জানতে চায়। এই সব অশিক্ষিত, কুসংস্কারগ্রস্ত লোকদের দৃঢ়

সেই গাড়ির অনুকরণে কয়েকটি গাড়ি তৈরি করান। এখনও আগ্রা অঞ্চলে সেই পুরাতন ধরনের ঘোড়ার গাড়ি ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষে ঘোড়ার গাড়ির প্রচলন সেই সময় থেকেই হয়। তার আগে এক্কাগাড়ি ছিল, কিন্তু তাতে ভালো ঘোড়া বিশেষ জোতা হতো না। –'আইন-ই-আকবরী' থেকে সংকলিত।–অনুবাদক।

বিশ্বাস যে, গ্রহ-উপগ্রহের একটা বিরাট প্রভাব আছে মানুষের জীবনে এবং সেটা এই মাটির পৃথিবীতে জ্যোতিষীরাই নিয়ন্ত্রণ করে।

পর্তুগীজ জ্যোতিষী

এই জ্যোতিষীদের মধ্যে একজনের কথা আমি এখানে বিশেষভাবে বলবো– একজন বিধর্মী পলাতক পর্তুগীজ জ্যোতিষীর কথা। এ ব্যক্তিও ঠিক অন্য জ্যোতিষীর মতো একটি আসন পেতে বাজারের মধ্যে চুপ করে বসে থাকতো এবং তারও যথেষ্ট মক্কেল ছিল, যদিও লেখাপড়া কিছুই সে জানতো না। বহুদিনের পুরনো একটি নাবিকের কম্পাস ছিল তার একমাত্র সম্বল। সেই কম্পাস দিয়েই সে অন্যদের মতো মানুষের নাড়ীনক্ষত্র ও ভাগ্য গণনা করতো।[২] জ্যোতিষশাস্ত্রের কোনো বই তার থাকার কথা নয়, জানেও না সে কিছু। পর্তুগীজ ভাষার পুরনো দু'একখানি প্রার্থনা-পুস্তক খুলে সে বসে থাকতো এবং তার ভেতরের ছবিগুলো মক্কেলদের দেখিয়ে বলতো– 'এগুলো হলো গ্রহ-নক্ষত্রের পর্তুগীজ চিত্র।' লজ্জাশরমের কোনো বালাই ছিল না তার।

· একবার এক রেভারেন্ড জেসুইট ফাদার তাকে বাজারের মধ্যে হাতেনাতে ধরে ফেলে জিজ্ঞেস করেন : 'এরকম বিধর্মীর মতো আচরণ করার কারণ কি?' উত্তরে পর্তুগীজ জ্যোতিষীটি বলে, 'যে দেশের যা আচার, তাই পালন করা কর্তব্য।' এমন নির্লজ্জ জবাব শুনে ফাদার অবাক হয়ে যান।

আমি শুধু এখানে সাধারণ বাজারের জ্যোতিষীদের কথা বললাম। যারা রাজা-বাদশাহ, আমির-ওমরাহদের দরবারে আনাগোনা করে, তারা বাজারের জ্যোতিষীর মতো স্বল্পবিত্ত নয়। তারা রীতিমতো ধনী এবং প্রতিপত্তি তাদের যথেষ্ট। যেমন তাদের অর্থ, তেমনি তাদের খাতির ও খ্যাতি। শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রায় সর্বত্র আমি এই কুসংস্কারে মোহমুগ্ধ সাধারণ লোককে দেখেছি। রাজা-মহারাজা, নবাব-বাদশাহরা এই সব জ্যোতিষী ও গ্রহাচার্যদের রীতিমতো উচ্চহারে বেতন দেন এবং সর্বব্যাপারে, তা সে যতো সামান্যই হোক, তাদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। গ্রহাচার্য ও জ্যোতিষীদের আদেশ ছাড়া তাঁরা এক পাও চলেন না। জ্যোতিষীরা পাঁজিপুঁথি দেখে, গ্রহ-উপগ্রহ গুনে, শুভযাত্রার বা কার্যারম্ভের দিনক্ষণটি বলে দেন। হিন্দুরা পাঁজিপুঁথি খুলে বলেন, মুসলমানরা বলেন পবিত্র কুরআন খুলে।

---

২. চীনের জ্যোতিষীরা নাবিকের কম্পাস অনেক আগে থেকেই ভাগ্য গণনার কাজে ব্যবহার করতেন।–অনুবাদক।

বাইরের শহর

বাদশাহী বাগের সামনে শহরের যে দুটি রাজপথ এসে মিশেছে বলে আগে উল্লেখ করেছি, তাদের প্রস্থ পঁচিশ-ত্রিশ পায়ের বেশি নয়। আঁকাবাঁকা পথ নয়, সরলরেখার মতো সোজা পথ– যতো দূর দৃষ্টি যায় ততো দূর দেখা যায়।

যে পথটি লাহোর ফটক পর্যন্ত গেছে তার দৈর্ঘ্য অনেক বেশি। ঘরবাড়ির দিক থেকে দুটি রাজপথের দৃশ্য প্রায় এক। আমাদের দেশের 'প্লেস রয়ালের' মতো, রাস্তার দুই দিকেই তোরণশ্রেণি। পার্থক্য শুধু এই যে, ভারতের তোরণগুলো শুধু ইটের তৈরি এবং উপরে শুধু একটি চাতাল ছাড়া আর কোনো গৃহ নেই।

আমাদের প্লেস রয়ালের সঙ্গে তার আরও একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য হলো এই যে, একটি তোরণ থেকে অপর তোরণের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ নেই। মধ্যবর্তী স্থানে খোলা দোকানঘর। দিনের বেলা এসব দোকানঘরে নানাশ্রেণির কারিগর কাজ করে, মহাজনরা বসে বসে বাণিজ্যিক লেনদেন করে এবং ব্যবসায়ীরা তাদের জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখে। তোরণের ভেতর দিকে একটি ছোট দরজার মধ্য দিয়ে গুদামঘরে যাওয়া যায়। রাতে মালপত্র ঐ গুমাদঘরেই বন্ধ করে রাখা হয়।

তোরণের পেছন দিকে গুদামঘরের ওপর বণিকদের বসতবাড়ি। রাস্তা থেকে বেশ সুন্দর দেখায় এবং মনে হয় বেশ বড় বড় কামরাওয়ালা বাড়ি। ঘরে যথেষ্ট আলো-বাতাস আসে এবং রাস্তার ধুলা থেকে ঘরগুলো অনেক দূরে। দোকানঘরের উপরের ছাদে চাতালে তারা রাতে ঘুমিয়ে থাকে। রাস্তা জুড়ে ঘরগুলো তৈরি নয়। মধ্যে মধ্যে তোরণের উপরেও বেশ ভালো ভালো ঘরবাড়ি আছে দেখা যায়। সাধারণত সেগুলো খুব নিচু, রাস্তা থেকে বড় একটা দেখা বা বোঝা যায় না। অবস্থাপন্ন ধনিক ব্যবসায়ী যারা তারা অন্য মহল্লায় বাস করে এবং দিনের বেলা কাজের সময় এখানে আসে।

আরও পাঁচটি রাস্তা শহরের মধ্যে আছে, কিন্তু যে দুটি রাস্তার কথা আগে বলেছি তাদের মতো লম্বা বা চওড়া নয়। অন্যান্য দিক থেকে রাস্তাগুলো দেখতে প্রায় একই রকম বলা চলে। এ ছাড়া আরও অনেক ছোটোখাটো রাস্তা ও অলিগলি আছে, তোরণও আছে রাস্তায় অনেক। কিন্তু রাস্তাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা-বাদশাহর আমলে তৈরি বলে তাদের পরিকল্পনার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। এসব রাস্তার ওপর আমির-ওমরাহ, মনসবদার, কাজী, বিচারক, বণিক প্রভৃতির বাড়িঘর। বিক্ষিপ্তভাবে তৈরি। দেখতে মোটামুটি ভালোই। ইট-পাথরের তৈরি বাড়ির সংখ্যা খুব অল্প, অধিকাংশই মাটি ও খড়ের তৈরি। মাটি ও খড়ের তৈরি হলেও বেশ খোলামেলা এবং দেখতে বেশ সুন্দর।

বাড়ির সামনে খোলা জায়গা ও বাগান এবং ভেতরেও ভালো আসবাবপত্র রয়েছে। লম্বা লম্বা শক্ত ও সুন্দর বেতের ওপর বেশ পুরু খড়ের ছাউনি। দেয়াল মাটির, তার ওপর চুনের প্রলেপ দেয়া। দেখতে সত্যিই সুন্দর।

এসব সুন্দর বাড়ির ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর ছোট ছোট খড়ের চালাঘর রয়েছে। সেইসব চালাঘর সাধারণ সৈনিক, সিপাই ও অন্যান্য নিম্নশ্রেণির সাধারণ ভৃত্যদের বসবাসের জন্য তৈরি করা হয়েছে। দিল্লী শহরের মধ্যে এরকম অসংখ্য খড়ের চালাঘর থাকার জন্য ঘনঘন অগ্নিকাণ্ড ঘটে। আগুন যখন লাগে এবং বছরে দু-একবার লাগেই, তখন অতি সহজেই তা শহরময় ছড়িয়ে পড়ে। দিল্লী শহর জুড়ে মনে হয় যেন আগুন জ্বলছে। এই গত বছরেই দিল্লীতে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিলো, প্রায় ষাট হাজার খড়ের ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিলো সে সময়। গ্রীষ্মকালে যখন মধ্যে মধ্যে ঝড় বইতে থাকে তখনই আগুন লাগে বেশি এবং ঝড়ের কারণে আগুন অতিদ্রুত ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। গত বছর এভাবে তিনবার আগুন লাগে দিল্লী শহরে (১৬৬২ সালে)। ঝড়ের জন্য আগুন এতো দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে যে, বহু ঘোড়া ও উট আগুনে পুড়ে মারা যায়। প্রাসাদের ও হারেমের অনেক স্ত্রীলোকও আগুনের শিখায় দগ্ধ হয়ে অসহায় অবস্থায় মারা যায়। এইসব স্ত্রীলোক এতো অসহায় ও লাজুক যে, ঘরে আগুন লাগলেও বাইরে বেরিয়ে মুখ দেখাতে তারা লজ্জা পায়। সে জন্য জেনানা মহলের স্ত্রীলোকেরা অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগুনে পুড়ে মারা যায়।

মধ্যযুগের শহর

দিল্লীতে মাটির চালাঘরের আধিক্যের জন্য আমার মনে হয় দিল্লী আধুনিক অর্থে শহর ও নগর নয়– কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। অথবা মনে হয় দিল্লী একটি বিরাট সামরিক শিবির, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সামরিক শিবিরে যে সব সুযোগ-সুবিধা থাকে, দিল্লীতেও তাই আছে, তার বেশি কিছু নয়।

আমির-ওমরাহদের ঘরবাড়ি যদিও নদীর তীরে ও শহরতলিতেই বেশি, তাহলেও তার মধ্যে কোনো পরিকল্পনার চিহ্ন নেই। চারদিকে সব ছড়ানো, অবিন্যস্ত ঘরবাড়ি। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি হলো উন্মুক্ত বাড়ি, চারদিকে খোলা বাড়ি। আলো-বাতাস প্রচুর পরিমাণে যে বাড়িতে পাওয়ার সুবিধা আছে সেই বাড়িই এখানে সুন্দর। সুতরাং ভালো বাড়ির সামনে খোলা জায়গা, বাগান, গাছপালা, পুকুর, বড় হলঘর, মাটির নিচে একটি শীতল ঘর ইত্যাদি থাকবেই। মাটির নিচে যে শীতলঘর করা হয় সেখানে টানাপাখা টাঙানো থাকে এবং দিনের বেলায় তীব্র উত্তাপের সময় সেখানে গৃহস্বামী আশ্রয় নেন। অনেকে দরজা-জানালায় খস্‌খসের পর্দা ঝুলিয়ে রাখেন। অবস্থাপন্ন

গৃহস্থদের বাড়িতে খস্‌খস তো থাকেই, তার কাছাকাছি পানি বোঝাই চৌবাচ্চাও থাকে। ভৃত্যরা সেখান থেকে পানি নিয়ে খস্‌খসের পর্দায় ছিটিয়ে দেয়। খস্‌খস সব সময় ভিজে থাকলে বাইরের গরম হাওয়া ভেতরে ঢুকতে পারে না এবং ঘর শীতল থাকে।

এখানকার মানুষ মনে করে, বেশ সুন্দর আরামপ্রদ বসতবাড়ি যদি তৈরি করতে হয় তাহলে একটি সুন্দর ফুলবাগান তো বাড়ির সঙ্গে চাই-ই। উপরন্তু বাড়ির চার কোণে চারটি মানুষসমান উঁচু বসবার জায়গা থাকা চাই, সেখানে বসে সমস্ত শরীরে মুক্ত আলো-বাতাস লাগানো যেতে পারে।

বাস্তবিকই প্রত্যেক ভালো বাড়িতে এরকম উঁচু চাতাল আছে এবং সেখানে গ্রীষ্মকালে বাড়ির লোকজন রাতে শুয়ে থাকে। বাইরের চাতাল থেকে ভেতরে শোবারঘরে যাবার পথ আছে এবং সহজেই যাওয়া যায়। হঠাৎ বৃষ্টি হলে বা বর্ষার দিনে খাটিয়া স্বচ্ছন্দে শয়নকক্ষে তুলে নিয়ে যাওয়া যায়। শুধু বর্ষার সময় নয়, তুষারপাত বা শীতের সময়ও এভাবে বাইরে থেকে উঠে গিয়ে ভেতরে শোবার দরকার পড়ে।

এবার ভেতরের ঘরের বর্ণনা দিচ্ছি।

ভালো ভালো বাড়ির ভেতরের ঘরের মেঝের ওপর প্রায় চার ইঞ্চি পুরু গদি পাতা, তার ওপর সাদা ধবধবে চাদর বিছানো থাকে, গ্রীষ্মে এবং শীতকালে সিল্কের কার্পেট। ঘরের বিশেষ কোণে আরো ছোট ছোট দু-একটি গদি পাতা আছে, এবং তার ওপর সুন্দর ফুল লতাপাতার কারুকাজ করা চাদর বিছানো থাকে। এগুলো গৃহস্বামীর নিজের অথবা তার বিশেষ সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতের জন্য বসার জন্য ব্যবহৃত হয়। হেলান দিয়ে বসে গল্পগুজব করার জন্য এসব ফরাসের ওপর ভালো ভালো তাকিয়া ফেলা থাকে। নানা রকমের কারুকাজ করা ভেলভেটের ও সাটিনের তাকিয়াই বেশি। মেঝে থেকে পাঁচ-ছয় ফুট উঁচুতে দেয়ালের গায়ে অনেক, কুলুঙ্গি থাকে নানা আকারের ও নক্সার কুলুঙ্গি। কুলুঙ্গিতে নানা রকমের জিনিসপত্র থাকে– যেমন, ফুলদানি গ্লাস ইত্যাদি। উপরের সিলিং গিল্টি করা ও রং করা, কিন্তু মানুষ বা জীব-জানোয়ারের কোনো চিত্র অঙ্কিত নয়। মানুষ বা জানোয়ারের চিত্র সিলিংয়ে আঁকা নাকি ধর্মনিষিদ্ধ। সেজন্য শুধু গিল্টি করা ও রং করা সিলিংই বেশি দেখা যায়।

এই হলো সংক্ষেপে দিল্লী শহরের ঘরবাড়ির বিবরণ এবং সুন্দর বাড়ির পরিচয়। এরকম সুন্দর বাড়িঘর দিল্লী শহরে যথেষ্ট আছে। সুতরাং এ কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে, ইউরোপের শহরের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করেও ভারতের রাজধানী দিল্লী কুৎসিত নয়। যথেষ্ট সুন্দর এবং প্রচুর নয়নাভিরাম ঘরবাড়ি দিল্লীতে আছে। ইউরোপের শহরের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্য নেই। এবং তার সঙ্গে তুলনা করা উচিতও নয়।

দোকানপাটের কথা

ঝকঝকে সুন্দর দোকানপাটের জন্যও ইউরোপীয় নগরের সৌন্দর্য বাড়ে। দিল্লীতে সেরকম দোকানপাট নেই। তবে দিল্লী শহর মোগল সম্রাটের বিখ্যাত রাজধানী এবং অজস্র মূল্যবান জিনিসপত্রের আমদানি করা হয় সেখানে। তাহলেও দিল্লী শহরের মধ্যে আমাদের এখানকার শহরের মতো পথঘাট নেই, এমনকি সারা এশিয়া মহাদেশেই নেই বলা চলে।

মূল্যবান পণ্যদ্রব্য সাধারণত সেখানে গুদামজাত করে রাখা হয় এবং দোকানপাট কখনো সাজানো হয় না। দোকান সাজানো ব্যাপারেই যেনো দিল্লীর ব্যবসায়ীরা অভ্যস্ত নয়। মাঝে মধ্যে এক-আধটি দোকান এরকম দেখা যায় যেখানে ভালো ভালো দামী রেশমী বস্ত্র, সোনা-রুপার জরির কাজ করা নানান আকৃতির ঢাল, শিরস্ত্রাণ ইত্যাদি সাজিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরকম একটি দোকানের বদলে পঁচিশটি দোকান দেখা যায় যেখানে দেখবার মতো কিছুই সাজানো থাকে না। মাটির পাত্রভরা তেল, ঘি, মাখন, বস্তা বস্তা চাল, গম, ছোলা, ডাল ইত্যাদি মজুদ করা থাকে। এসব অধিকাংশই হলো হিন্দু ভদ্রলোক শ্রেণির খাদ্য, যারা বেশি মাংস খায় না। দরিদ্র নিম্নশ্রেণির মুসলমানরাও অবশ্য তাই খায় এবং সাধারণ সৈনিকদের অধিকাংশকেই এই খাদ্য খেতে হয়।[৩]

এ ছাড়া একটি ফলের বাজার আছে, যা বাস্তবিকই দেখবার মতো। ফলের বাজারে দোকানের সংখ্যাও যথেষ্ট এবং গ্রীষ্মকালে এসব দোকান নানা রকমের ফলে ভর্তি হয়ে যায়।

ইরান, বল্‌খ, বোখারা, সমরকন্দ থেকে দিল্লীর বাজারে ঝুড়িঝুড়ি ফলের আমদানি হয়। কতো যে তার নাম তার ঠিক নেই– পেস্তা, বাদাম, আখরোট, খুবানী আরো কতোকি! এসব গ্রীষ্মকালে আমদানি করা হয়। শীতকালে আসে চমৎকার আঙুর– সাদা ও কালো রঙের। ঐ একই দেশ থেকে আসে, সযত্নে তুলোয় মোড়ানো অবস্থায়। তিন-চার রকমের আপেল, ডালিম-বেদানাও আসে প্রচুর। আর আসে তরমুজ, সারা শীতকাল থাকে, নষ্ট হয় না।

অত্যন্ত দামী ফল এই তরমুজ। এক-একটির দাম প্রায় দেড় ক্রাউন করে। এর চেয়ে নাকি অভিজাত ফল আর কিছু নেই। আমির-ওমরাহদের তরমুজ-খরমুজ না হলে চলে না। এই ফলের জন্য তারা প্রচুর খরচ করেন। ফল-মূল এমনিতে অবশ্য তারা যথেষ্ট খান। আমার মনিব যিনি ছিলেন তিনি দৈনিক প্রায় বিশ ক্রাউন করে নিজের ফলের জন্য খরচ করতেন।

---

৩. বার্নিয়ার এখানে বোধ হয় মুদির দোকান ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দোকানের কথাই বলতে চেয়েছেন। তাঁর প্রধান বক্তব্য হলো যে, দামী পোশাক বা অন্যান্য পণ্য সাজানো পরিপাটি দোকান দিল্লীতে বেশি ছিল না– মুদির দোকান ও খাদ্যের দোকানই বেশি ছিল।–অনুবাদক।

গ্রীষ্মকালে তরমুজের দাম সস্তা হয়। তবে তখন খুব ভালো জাতের তরমুজ সংগ্রহ করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়। ইরান থেকে বীজ আনিয়ে অত্যন্ত যত্ন করে মাটি তৈরি করে তাতে সেই বীজ বুনে দিতে হয়। সাধারণত অভিজাত শ্রেণির মানুষ ছাড়া অন্যরা তরমুজের চাষ করতে পারে না। ভালো তরমুজ পাওয়া সে জন্যই খুব ব্যয়সাপেক্ষ; কারণ যে কোনো মাটিতে তরমুজ হয় না এবং মাটি খুব ভালো না হলে এক বছরেই তরমুজের বীজ নষ্ট হয়ে যায়।

তরমুজ সারা বছর যথেষ্ট পাওয়া যায়, কিন্তু দিল্লী অঞ্চলের তরমুজের রং বা মিষ্টতা নেই। ভালো তরমুজ সাধারণত ধনীলোকদের বাড়িতেই দেখা যায়। কারণ তারা বাইরে থেকে বীজ আনিয়ে রীতিমতো খরচ ও যত্ন করে তরমুজ চাষ করে।

আম গ্রীষ্মকালে মাস দুই খুব সস্তা হয় এবং প্রচুর পরিমাণে আম পাওয়া যায়।[৪] কিন্তু দিল্লী অঞ্চলে বিশেষ ভালো আম তেমন পাওয়া যায় না। ভালো ভালো উৎকৃষ্ট আম আসে বাংলাদেশ আর গোলাকুন্ডা ও গোয়া থেকে। অপূর্ব সুস্বাদু ফল এই আম। আমের চেয়ে বোধ হয় কোনো মিষ্টান্নও সুস্বাদু নয়।

ময়রার দোকান দিল্লী শহরে অনেক আছে, কিন্তু মিষ্টান্নের তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য নেই– রুচি বা আস্বাদ, কোনো দিক থেকেই। মিষ্টান্ন খারাপ তো বটেই, তা ছাড়া মাছি আর ধুলোতে ভর্তি হয়ে থাকে। খাওয়ার যোগ্য নয়।

রুটিওয়ালাও শহরে অনেক আছে, কিন্তু তাদের চুলা আর আমাদের দেশের রুটিওয়ালাদের চুলা এক রকম নয়। চুলা ঠিক মতো বৈজ্ঞানিক উপায়ে তৈরি নয়। সে জন্য রুটি ভালোভাবে তৈরি করা সম্ভব হয় না এবং ছেঁকাও হয় না। প্রাসাদদুর্গের মধ্যে যে রুটি তৈরি হয় সেগুলো অনেকটা ভালো। আমির-ওমরাহরা সাধারণত নিজেদের ঘরেই রুটি তৈরি করিয়ে নেন, বাইরের রুটি খান না। রুটি তৈরি করার সময় টাটকা মাখন, দুধ বা ডিম দিতে তারা কোনো কার্পণ্য করেন না। কিন্তু এতো করা সত্ত্বেও রুটির আস্বাদ পোড়া পোড়া মনে হয়, খেতে তেমন ভালো লাগে না। ঠিক রুটির যে স্বাদ তা হয় না, অনেকটা কেকের মতো হয়। আমাদের এখানকার রুটির সঙ্গে তার কোনো তুলনাই চলে না।

বাজারে অনেক দোকান আছে, যেখানে নানা রকমের রান্না মাংস বিক্রি করা হয়। কিন্তু সেই সব বাজারের রান্না মাংস বিশ্বাস করে খাওয়া যায় না। কারণ, কিসের মাংস যে রান্না করা থাকে, তা অনেক সময় বলা মুশকিল। ঘোড়ার মাংস, উটের মাংস, এমন কি ব্যাধিগ্রস্ত মৃত ষাঁড়ের মাংসও রান্না করে

---

৪. 'আম' ও 'আম্র' উত্তর ভারতের প্রচলিত শব্দ। আমের তামিল নাম হলো 'মানকে'। 'মানকে থেকে পর্তুগীজরা 'মঙ্গ' এবং তাকে ইংরেজি 'ম্যাঙ্গো' করা হয়।–অনুবাদক।

বাজারের দোকানে বিক্রি করা হয়। সুতরাং, বাজারের খাদ্যের ওপর নির্ভর করাই যায় না। বাড়িতে রান্না করা ছাড়া তৃপ্তি করে কোনো খাদ্য খাওয়ার উপায় নেই।

শহরের প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলে মাংস বিক্রি হয়, কিন্তু পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস পাঁঠা বলে বেশি চলানো হয়ে থাকে। সে জন্য মাংস কেনার সময় খুব হুঁশিয়ার হয়ে মাংস কিনতে হয়। কারণ, গরু ও ভেড়ার মাংসের উত্তাপ বেশি এবং সহজপ্রাপ্য নয়।[৫] সাধারণত কচি পাঁঠার মাংসই ভালো, কিন্তু তার জন্য জ্যান্ত পাঁঠা কিনে আনা দরকার। জ্যান্ত একটা পাঁঠা কেনা মুশকিল, কারণ পাঁঠার মাংস বেশিক্ষণ রেখে খাওয়া যায় না। তেমন সুগন্ধও নেই। ছাগমাংস যা বাজারে বেশি বিক্রি হয় তা ছাগীর মাংস, অত্যন্ত শক্ত ও ছিবড়ে।[৬]

কিন্তু আমার দিক থেকে এভাবে অভিযোগ করা বোধ হয় অন্যায় হবে। কারণ ভারতের লোকজনের সঙ্গে এমনভাবে আমি মিশেছি এবং তাদের আচার-ব্যবহারে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, আমি যে রুটি ও মাংস খেতে পেয়েছি, তার মধ্যে অভিযোগ করার মতো কোনো ত্রুটি দেখতে পাইনি। সাধারণত ভালো খাবারই আমি খেতে পেতাম– আমার ভৃত্যকে পাঠিয়ে দুর্গের ভেতর থেকে খাবার কিনিয়ে আনাতাম। তারাও ভালো খাবার দিতো। কারণ খাবার তৈরির খরচ তাদের বিশেষ লাগতো না, অথচ আমি যথেষ্ট দাম দিয়ে কিনতাম।

রাজদুর্গের ভেতর থেকে এভাবে খাবার কিনে খাই শুনে আমার মনিব হাসতেন। বুদ্ধি খাটিয়ে এই উপায় উদ্ভাবন না করলে সামান্য দেড়শো ক্রাউন আমি যে মাসিক বেতন পেতাম, তাতে আমার উপোষ থাকতে হতো। অথচ ফ্রান্সে আমি যদি খাদ্যের জন্য আট আনা খরচ করি, তাহলে রাজার খাদ্য যে মাংস তাও বোধ হয় নিয়মিত খেতে পারি।

ভালো জাতের খাসী মোরগ তেমন পাওয়া যায় না, একরকম দুর্লভই বলা চলে। ওদেশের মানুষের জীবজন্তুর প্রতি দয়াটা যেনো একটু বেশি মনে হয়। মোরগ বেগম মহলের জন্যই প্রধানত বরাদ্দ থাকে। বাজারে সাধারণ প্রচুর পরিমাণে মুরগি পাওয়া যায়। ওগুলো বেশ ভালো মুরগি এবং দামও কম। নানাজাতের মুরগি পাওয়া যায়, তার মধ্যে একরকমের আছে

---

৫. বার্নিরের এই মন্তব্য এখন অনেকের কাছে অদ্ভুত মনে হবে। ছাগলের মাংস যে ভেড়ার মাংসের চেয়ে উপাদেয়, এ কথা এখন আর কেউ মনে করে কিনা সন্দেহ। কিন্তু একসময় করতো বলে মনে হয়।–অনুবাদক।

৬. বার্নিয়ারের কথা আজও যে কতো সত্য, তা মাংসাশী মাত্রই জানেন। খাদ্যের প্রতি, এমন কি মাংসের প্রতিও বার্নিয়ারের সজাগ দৃষ্টি পড়েছিলো। তা ছাড়া বাজারে যে পাঁঠার চেয়ে ছাগলের মাংস বেশি বিক্রি হয়, তিনি তাও লক্ষ্য করেছিলেন।–অনুবাদক।

খুব ছোট, কচি ও নরম। আমি তার নাম দিয়েছি ইথিয়োপিয়ান মুরগি বা হাব্‌সী মুরগি। কারণ তার গায়ের চামড়াটা রীতিমতো কালো।[৭]

পায়রাও বাজারে বিক্রি হয়, কিন্তু ছোট পায়রা নয়। কারণ বাচ্চা পায়রার উপর ভারতীয়দের মমতা খুব বেশি।

এক রকমের ছোট ছোট পাখিও বাজারে বিক্রি হয়। জাল ফেলে ধরা হয় পাখিগুলোকে এবং অনেক দূর থেকে বাজারে আনা হয়। পাখির মাংস মুরগির মতো খেতে সুস্বাদু নয়।

দিল্লী অঞ্চলের অধিবাসীরা সেরকম ভালো মৎস্যশিকারি নয়। মাছ ধরতে ভালো জানে না। মধ্যে মধ্যে ভালো মাছ বাজারে আমদানি হয়, কিন্তু তার অধিকাংশই সিং ও রুই মাছ। আমাদের এ দেশের একজাতীয় মাছের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে। শীত পড়লে কেউ আর মাছ খেতে চায় না, কারণ শীতকে তারা ভয়ানক ভয় করে– ইউরোপীয়রা গরমকে যা ভয় করে তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং শীতকালে যদি কোনো মাছ বাজারে আসে তখনই খোজারা তা কিনে নেয়। খোজারা বিশেষ করে মাছ খুব বেশি ভালোবাসে। কেনো বাসে জানি না। আমির-ওমরাহরা চাবুকের ভয় দেখিয়ে জেলেদের মাছ ধরতে পাঠায়। লম্বা-লম্বা চাবুক তাঁদের দরজার সামনে সব সময় ঝোলানো থাকে।

মোটামুটি যে বিবরণটুকু দিলাম তা থেকে আপনি বুঝতে পারবেন যে প্যারিস ছেড়ে দিল্লী শহর একবার বেড়াতে যাওয়া উচিত কি না। বড় বড় ধনী লোক যারা, তারা অবশ্য বেশ আরামে ও আনন্দেই থাকেন; কারণ তাদের হুকুম তামিল করার জন্য চাকরবাকরের অভাব থাকে না। টাকার জোরে তো বটেই, চাবুকের জোরেও তারা লোকজনকে দিয়ে নানা রকমের কাজ করিয়ে নেন।

দিল্লী শহরে কোনো মধ্যবর্তী অবস্থার লোকের অস্তিত্ব নেই। দুই শ্রেণির লোক দিল্লীতে সাধারণত বেশি দেখা যায়– হয় উচ্চশ্রেণির ধনী লোক, আর না হয় নিম্নশ্রেণির দরিদ্র। মধ্যশ্রেণির বা মধ্যবর্তী স্তর বলতে কিছু নেই।[৮]

---

৭. এটি বার্নিয়ারে সজাগ দৃষ্টির আরেকটি দৃষ্টান্ত। অন্য পর্যটকরা মাংস কালো রঙের বলেছেন, কিন্তু বার্নিয়ার বলেছেন যে, গায়ের চামড়াই কালো। সামান্য মুরগির ক্ষেত্রেও তাঁর অসাধারণ পর্যবেক্ষণশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা সমসাময়িক কোনো পর্যটকের মধ্যে পাওয়া যায়নি।–অনুবাদক।

৮. ভারতীয় সমাজে গঠনবিন্যাস সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই মন্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'মধ্যবিত্তশ্রেণি' বলতে আমরা যা বুঝি, তার বিকাশ হয়েছে আধুনিক শিল্পযুগে। মধ্যযুগে 'মধ্যশ্রেণি' বলে বিশিষ্ট ও উল্লেখযোগ্য কোনো সামাজিক শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল না।–অনুবাদক।

আমি নিজে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করি এবং খরচ করতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রায় এমন অবস্থা হয় যে আমার অদৃষ্টে কোনো খাদ্য জোটে না। অধিকাংশ দিন বাজারে কিছুই পাওয়া যায় না এবং যা-ও পাওয়া যায় তা ধনীদের ভুক্তাবশেষ বা উচ্ছিষ্ট ছাড়া কিছু নয়। ভোজনপর্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে মদ, তা দিল্লীর একটিমাত্র দোকানে পাওয়া যায়, আর কোথাও পাওয়া যায় না। অথচ মদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাওয়া সম্ভব। কারণ দেশী আঙুর থেকে ভারতে বেশ উত্তম মদ তৈরি করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও মদ বাইরের দোকানে বিক্রি হয় না। কারণ হিন্দুদের শাস্ত্র ও মুসলমানদের শরিয়তে মদ্যপান নিষিদ্ধ। যৎকিঞ্চিৎ মদ আমি মাঝেমধ্যে আহমেদাবাদ ও গোলকুন্ডায় পান করেছিলাম, তাও ডাচ ও ইংরেজদের গৃহে অতিথি হয়ে। কিন্তু সে মদের আস্বাদ তেমন ভালো নয়।[৯]

মোগল সাম্রাজ্যে মদ যা পাওয়া যায় তা সাধারণত দু রকমের– শিরাজী ও ক্যানারি। 'শিরাজী' ইরান থেকে আমদানি করা হয়। ইরান থেকে বন্দর আব্বাসি হয়ে সুরাটে এসে পৌছোয় এবং সেখান থেকে দিল্লীতে আসে ৪৬ দিনে।

'ক্যানারি' মদ ডাচরা নিয়ে আসে সুরাটে। কিন্তু এই দু রকমের মদেরই দাম এতো বেশি যে, তার আস্বাদ দামের জন্যই নষ্ট হয়ে যায়।[১০] অর্থাৎ অতো বেশি দাম দিয়ে মদ খেতে হলে তা খেতে ভালো লাগে না। প্যারিসে যে মদের পাঁইট বিক্রি হয়, সেই রকম তিন পাঁইট মদের দাম দিল্লীতে ছয়-সাত ক্রাউন। এক ধরনের দেশী মদ চিনি বা গুড় থেকে চোলাই করে ওদেশে তৈরি হয়। তাও প্রকাশ্য বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না। লুকিয়ে-চুকিয়ে লোকে খায়, খ্রিস্টানরা প্রকাশ্যেই খায়। দেশী আরক জাতীয় মদ পোল্যান্ডের ধেনো মদের চেয়ে অত্যন্ত কড়া, খাবার সময় রীতিমতো গলা থেকে বুক পর্যন্ত পুড়ে যাচ্ছে মনে হয়। বেশি খেলে শারীরিক ও মানসিক ব্যাধির উপসর্গ দেখা দেয়। বিচক্ষণ ও মিতাচারী ব্যক্তি যারা তারা বিশুদ্ধ পানি পান করেন অথবা সোডা-লেমনেড জাতীয় কিছু পানীয়। দামেও সস্তা, দেহেও সহ্য হয়, সুতরাং যত

---

৯. ভোজনবিলাসী বার্নিয়ারের মন্তব্য থেকে মনে হয়, এককালে দেশী মদ বোধ হয় বিলেতি মদের চেয়েও স্বাদে-গন্ধে উৎকৃষ্ট ছিল।–অনুবাদক।

১০. ফ্রায়ার (Fryer) লিখেছেন : 'বোম্বাই ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ইংরেজদের মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি, কিন্তু পর্তুগীজ ও দেশীয়রা বেশ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দীর্ঘজীবী হয়। তার কারণ তারা অত্যন্ত সংযমী এবং মদ্যপান করে না। ইংরেজরা খুব বেশি মদ্যপান করে বলে অকালে মারা যায়। বরং বৃদ্ধবয়সে কিছু কিছু মদ্যপান করা উচিত, কিন্তু অল্প বয়সে নয়।'(A New Account of East India and persia : Hakluyt. See Vol.p.180)

খুশি প্রাণভরে পান করতে কোনো বাধা নেই।[১১] সত্য কথা বলতে কি, খুব কম লোকই ভারতবর্ষে মদ পান করে। মদের প্রতি সেরকম কোনো বিশেষ আসক্তি ভারতবাসীদের মধ্যে দেখা যায় না। এদিক থেকে তাদের মিতাচারী ও সংযমী বলা চলে।

দেশের আবহাওয়ার গুণে লোকে হাঁপানি রোগে ভোগে খুব বেশি। কিন্তু বাত, পেটের অসুখ, স্টোন ইত্যাদি ব্যাধির বিশেষ কোনো চিহ্ন দেখা যায় না। এই জাতীয় ব্যাধি নিয়ে যদি কেউ বাইরে থেকে আসে তাহলে তার সম্পূর্ণ আরোগ্য হতেও বেশি সময় লাগে না। আমার নিজের এই ব্যাধি ছিল এবং আমি কিছুদিনের মধ্যেই সেরে উঠেছিলাম। এমনকি উপদংশ রোগেওর (Veneral disease) ভারতে বেশ প্রতিপত্তি থাকা সত্ত্বেও, তেমন মারাত্মক আকারে দেখা যায় না এবং অন্যান্য দেশের মতো তার ফলাফলও খুব ভয়াবহ নয়।[১২]

সাধারণ লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভালোই বলা চলে, কিন্তু তাহলে শীতপ্রধান দেশের লোকের মতো তারা কর্মঠ ও পরিশ্রমী নয়। বোধ হয় অত্যাধিক গরমের জন্য দেহ ও মনের জড়তা তাদের বেশি। কাজেকর্মে তেমন উদ্‌যোগ ও উৎসাহ নেই। শৈথিল্য ও অবসাদই তাদের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি। অবসাদের হাত থেকে যেন মুক্তি নেই ভারতের। নির্বিচারের সকল শ্রেণির মানুষকে এই জড়তা ও অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে। এমন কি, বিদেশী ইউরোপবাসীরাও এর হাত থেকে মুক্তি পায় না। বিশেষ করে গ্রীষ্মের পরিবেশে যারা তেমন অভ্যস্ত হতে পারেনি, তাদের তো কথাই নেই।

কারিগরদের কথা

দিল্লীতে সুদক্ষ কারিগরদের ভালো কারখানা বেশি নেই। অন্তত সেদিক থেকে গর্ব করার মতো বিশেষ কিছু নেই দিল্লীর। তার মানে, ভালো ভালো কারিগর যে ভারতবর্ষে নেই, তা নয়। সুদক্ষ কারিগর ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে এবং তার সংখ্যা যথেষ্ট। উঁচুদরের কারুশিল্পের প্রচুর নিদর্শন দেখা যায়।

---

১১. ভারতীয় পানীয়ের মধ্যে 'শরবত' অন্যতম। শরবতের প্রচলন হিন্দু যুগেও ছিল, কিন্তু তার বৈচিত্র্য তেমন ছিল না। লেবুর রস ও ফলের শরবত ইত্যাদি নানা রকমের শরবতের প্রচলন হয় মুসলমান যুগে। অতিথিকে শরবত পান করতে দেয়া (চা বা মদ নয়) ভারতীয় সংস্কৃতির একটি উল্লেখযোগ্য রীতি।—অনুবাদক।

১২. ভারতীর ব্যাধি সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই মন্তব্য বিস্ময়ের উদ্রেক করে। বার্নিয়েছেন বলেছেন যে, হাঁপানি রোগই ভারতবর্ষে বেশি দেখা যায়। গ্রীষ্মজনিত চারিত্রিক অবসাদ ও জড়তাকেও তিনি ব্যাধি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাত বা পেটের পীড়া ভারতবর্ষে নেই বললেই হয়– বার্নিয়ারের এই মন্তব্যে আজকাল রীতিমতো বিস্মিত হবার কথা। উপদংশ-রোগ সম্বন্ধে মন্তব্য কৌতূহল উদ্রেক করে।—অনুবাদক।

কারিগরী যন্ত্রপাতি বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও এবং কোনো গুরুর কাছ থেকে কোনোরকম শিক্ষা না পেয়েও তারা শিল্প তৈরি করে।[১৩] এক এক সময় ইউরোপীয় শিল্পদ্রব্য তারা এখন নিখুঁতভাবে নকল করে যে, দ্রব্যটি আসল কি নকল, তা সহজে ধরা যায় না।[১৪]

সম্রাট ও শাহজাদারা হেরেমবাসী আত্মীয়-স্বজন ও বাদীদের সঙ্গে আনন্দ করে তাদের অবসর সময় কাটাতেন, তারই জীবন্ত দৃশ্য ফুটে উঠেছে কোনো এক মোগল 'শিল্পীর অংকনশৈলীতে'

ভারতীয় কারিগররা বেশ চমৎকার বন্দুক বানাতে পারে। সোনার নানা রকমের অলঙ্কার এতো সুন্দর তারা তৈরি করে যে, তার কারুকাজ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ইউরোপের স্বর্ণকাররা এদিক থেকে কারিগরিতে ভারতীয় স্বর্ণকারদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে কি না সন্দেহ। ভারতীয় চিত্রকরদের ছবির প্রশংসা আমি অনেকবার করেছি। বিশেষ করে ছোট ছোট চিত্রের নৈপুণ্য ও কলাকুশলতার তুলনাই হয় না। একটি চিত্রিত ঢাল দেখেছিলাম, সম্রাট আকবরের আমলের।[১৫] তখনকার দিনের বিখ্যাত কোনো চিত্রকর সাত বছর

---

১৩. কারিগরদের সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই উক্তি থেকে ভুল বোঝার সম্ভাবনা রয়েছে। কারিগরদের 'গিল্ড' বা শ্রেণি ও সংঘ বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং তার বৈশিষ্ট্য হলো বংশানুক্রমে কারিগরবিদ্যার দীক্ষা দেয়া। কারিগরদের অনেকের যন্ত্রপাতি নেই বলতে তিনি নিঃস্ব দরিদ্র কারিগরদের কথাই বলতে চেয়েছেন বলে মনে হয়।–অনুবাদক।

১৪. ভারতীয় শিল্পকলায়, কারুশিল্পে, ইউরোপীয় প্রভাব মোগল যুগ থেকেই লক্ষ্য করা যায়। বার্নিয়ারের এই উক্তি তার প্রমাণ।–অনুবাদক।

১৫. এরকম একটি চিত্রিত ঢালের বিবরণ ১৯৯১ সালে ২০শে মার্চ ইংল্যান্ডের 'টাইম্‌স' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ঢালটির নাম 'রামায়ণ ঢাল'। জয়পুরের শ্রেষ্ঠ শিল্পী গঙ্গা বক্স এই ঢালটিতে রামায়ণের কাহিনী সম্পূর্ণ চিত্রায়িত করেন।–অনুবাদক।

ধরে ঐ ঢালের চিত্রগুলো এঁকেছিলেন। চিত্রায়নের সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বিস্ময়কর। এরকম বিচিত্র কলাকুশলতা সচরাচর দেখা যায় না।

ভারতীয় চিত্রকরদের, আমার মনে হয় চিত্রের সামঞ্জস্যবোধ বা প্রমাণবোধ (Sense of proportion) তেমন সজাগ নয়। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করে মুখের মধ্যে সামঞ্জস্যবোধের তেমন পরিচয় পাওয়া যায় না। কোনো গুরুর কাছে শিক্ষা পেলে এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সহজেই শোধরানো যেতে পারে।

শিল্পকলার পদ্ধতি ও রীতি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকার দরকার এবং তার জন্য দরকার শিক্ষার। ভারতীয় শিল্পীদের এই শিক্ষার অভাব আছে বলে ধারণা আমার।[১৬] সুতরাং শুধু প্রতিভার অভাবের জন্যই যে দিল্লী শহরে ভালো শিল্পকলার নির্দশন তেমন দেখা যায় না, তা নয়। শিল্পীরা যদি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও উৎসাহ পেতেন, তাহলে ভারতবর্ষে শিল্পকলার আশ্চর্য বিকাশ হতো। কিন্তু কোনো উৎসাহই ভারতীয় শিল্পীরা পান না।

ভারতবর্ষে শিল্পীরা সাধারণত অবজ্ঞার পাত্র এবং তাদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার হয়ে থাকে। মেহনতের জন্য তারা উপযুক্ত মজুরিও পান না। ধনী লোক যারা, তারা সস্তায় জিনিস কিনতে আগ্রহী, অর্থব্যয় করতে আগ্রহী নয়। কোনো আমির বা মনসবদার যদি কোনো কারিগরকে দিয়ে কিছু কাজ করাতে চায়, তাহলে তাকে বাজার থেকে লোক পাঠিয়ে ধরে নিয়ে আসে। অনেক সময় জোর করে, ভয় দেখিয়ে ধরে আনে এবং হুমকি দিয়ে তাকে কাজে নিযুক্ত করে। কাজটি যখন শেষ হয়ে যায় তখন প্রভু তাকে যা মজুরি দেয় তা তার মেহনত অনুপাতে নয়। দয়া করে যা দেয় তাই তাকে ঘাড় হেঁট করে নিতে হয়। কোনোরকম বাদ-প্রতিবাদ করার অধিকার নেই তার। কারণ তাহলে দানের সঙ্গে আমির বেত্রাঘাত দক্ষিণা দিতেও দ্বিধা করে না। এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে ভারতীয় শিল্পীদের কাজ করতে হয়। সুতরাং কোথা থেকে তারা কাজের প্রেরণা পাবেন? কি জন্য তারা শিল্পোনতির চেষ্টা করবেন? যশ্, খ্যাতি, সম্মান, এসবের প্রতি কোনো আকর্ষণই তাদের থাকে না। খেয়ালী ধনী ব্যক্তিদের খেয়াল চরিতার্থ করার জন্য কোনোরকম কাজের নামে তাঁরা দায় উদ্ধার করতে চান। তা না হলে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকাই তাদের পক্ষে

---

১৬. ভারতের আর্থিক-সামাজিক অবস্থার নিখুঁত বর্ণনায় বার্নিয়ার তাঁর সমসাময়িক পর্যটকদের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে। কিন্তু এখানে ভারতীয় শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন, তা সাধারণ শ্রেণির শিল্পীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, কিন্তু সর্বশ্রেণির শিল্পীদের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নয়। বোঝা যায়, অন্যান্য বিষয়ে বার্নিয়ার অসাধারণ জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণশক্তির পরিচয় দিলেও, শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল না। তখনকার দিনের একজন বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে ভারতীয় শিল্পকলার মতো বহুমুখী বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞের মতো জ্ঞান থাকা সম্ভবপরও নয়।—অনুবাদক।

সম্ভবপর নয়। তাই একটুকরো রুটির জন্য তারা আমির-ওমরাহদের হুকুম পালন করেন। এই হলো এখানকার সাধারণ শিল্পীদের অবস্থা।

যে সব শিল্পীর প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদা আছে, তারা সাধারণত রাজা-বাদশাহর অনুগ্রহজীবী, অথবা বড় বড় আমির-ওমরাহ তাদের পৃষ্ঠপোষক। তারা একটু ভালো খেতে-পরতে পান ও আরামে থাকেন। তাদের প্রতিষ্ঠা হয়। তা না হলে, অর্থাৎ রাজা-বাদশাহের মতো পৃষ্ঠপোষক না থাকলে ভারতে শিল্পীর কোনো কদর নেই।[১৭]

রাজপ্রাসাদের বর্ণনা

রাজদুর্গের ভেতর বেগম মহল ও অন্যান্য রাজকীয় ভবন রয়েছে। কিন্তু 'লুভ্যের' বা 'এসকিউরিয়্যালে'র অট্টালিকাদির মতো নয়।[১৮] ইউরোপীয় ঘরবাড়ির গঠনের সঙ্গে তার কোনো সাদৃশ্যই নেই। থাকা বাস্তবসম্মতও নয়। কেনো নয়, তা আমি আগেই বলেছি। ফরাসী বা স্পেনীয় স্থাপত্যের সঙ্গে তার তুলনা করা উচিত নয়। যদি পরিবেশ উপযোগী নিজস্ব আভিজাত্য তার থাকে, তা হলেই যথেষ্ট।

দুর্গের প্রবেশদ্বারের এমন কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। বড় বড় দুটি পাথরের হাতি আছে দুদিকে। একটি হাতির ওপর চিতোরের রাজা জয়মলের প্রস্তর মূর্তি, অন্যটির ওপর তার ভাইয়ের। এই দুজন দুঃসাহসী বীর ও তাঁদের বীর জননী ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। কারণ সম্রাট আকবর যখন চিতোর অবরোধ করেছিলেন তখন তাঁরা অমিতবিক্রমে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন, তা অতুলনীয়।[১৯] সেই প্রতিরোধ যখন চূর্ণ হয়ে যায়, যখন

---

১৭. শিল্পকলার গুণাগুণ সম্বন্ধে বার্নিয়ার মন্তব্যের মধ্যে ত্রুটি থাকলেও ভারতীয় শিল্পীদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ দিয়েছেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য অসামান্য।—অনুবাদক।

১৮. The History of Indian Architecture' গ্রন্থের মধ্যে (১৮৭৬ সাল) ফার্গুসন লিখেছেন: 'দিল্লীর রাজপ্রাসাদ প্রাচ্যের সমস্ত রাজপ্রাসাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল, এমন কি সারা পৃথিবীর রাজপ্রাসাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কারণ, এমন সুন্দর স্থাপত্যের পরিকল্পনা রাজপ্রাসাদ নির্মাণে আর অন্য কোথাও দেখা যায় না।'
মোগল সম্রাটের রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে হারেম, বেগম মহল ও অন্যান্য গোপন বিভাগের যে আয়তন ছিল এবং যতোটা স্থান জুড়ে ছিল, ইউরোপের সম্পূর্ণ রাজপ্রাসাদেরও ততোটা বিস্তৃতি ছিল না। আকারে, আয়তনে, বৈচিত্র্যে, ঐশ্বর্যে ও পরিকল্পনায় দিল্লীর রাজপ্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে গণ্য ছিল।—অনুবাদক।

১৯. আকবর চিতোর অবরোধ করে ১৫৬৮ সালে তা অধিকার করেছিলেন। এই মর্মরমূর্তি দুটির বিস্তৃত বিবরণ ও ইতিবৃত্ত কৌতূহলী পাঠকরা H.G.Keene-এর A Handbook for visitors to Delhi and Its Neighbourhood (৪র্থ গ্রন্থের মধ্যে (Appendix 'A') পাবেন। মর্মরমূর্তি দুটি এখন দিল্লীর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে এবং হাতি দুটির একটি সাধারণ উদ্যানে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয় হাতটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ১৮৬৩ সালে হাতিসহ এই মর্মরমূর্তি দুটি দুর্গের মধ্যস্থ আবর্জনাস্তূপের তলা থেকে খুঁড়ে বের করা হয়।—অনুবাদক।

দেশরক্ষার আর কোনো উপায় থাকে না, তখন তাঁরা তাঁদের জননীসহ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হননি। তবু তাঁরা ঔদ্ধত শত্রুর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। মাথা উঁচু করেই তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছিলেন। তাঁদের সেই অপূর্ব বীরত্বে মুগ্ধ হয়েই তাঁদের শত্রু মোগলরা এই মর্মরমূর্তি তৈরি করেছিলো। যখনই আমি দুটি হাতির পিঠে এই বীরের মর্মরমূর্তির দিকে চেয়ে দেখি তখন আমার মনে এমন এক অনুভূতির সৃষ্টি হয়, যা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না।

এই প্রবেশদ্বার দিয়ে নগরদুর্গের মধ্যে প্রবেশ করলে সামনে একটি সুদীর্ঘ প্রশস্ত রাজপথ দেখা যায়। রাজপথ বা রাস্তাটির (দিল্লীর প্রাচীন 'চাঁদনি চক্') মাঝখান দিয়ে একটি পানির খাল বয়ে গেছে। রাস্তার দু পাশে লম্বা উঁচু বাঁধ প্রায় পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু এবং চার ফুট চওড়া। বাঁধের পাশেই সারিবদ্ধ তোরণ রাস্তা বরাবর চলে গেছে। এই বাঁধের ওপরেই বাজারের রাজকর্মচারীরা তাদের খাজনা, শুল্ক ইত্যাদি আদায় করে এবং রাস্তার ওপর দিয়ে ঘোড়া, মানুষ ইত্যাদি চলাচল করে। মনবসদার ও নিম্নপদস্থ ওমরাহরা বাঁধের ওপর ঘোড়ায় চড়ে পাহারা দেয়।

খালের পানি বেগম মহলের অন্দর পর্যন্ত চলে গেছে। নানা জায়গার ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে গিয়ে খালের পানি দুর্গের বাইরের পরিখায় গিয়ে পড়েছে। খালটি দিল্লীর প্রায় পাঁচ-ছয় লীগ দূর যমুনা নদী থেকে বিশেষ যত্ন ও মেহনত করে কেটে আনা হয়েছে। কয়েকটি মাঠের ওপর দিয়ে পাথুরে মাটির বুক চিরে এসেছে খালটি।[২০]

অন্য দুর্গদ্বার দিয়ে ভেতরে ঢুকলে আরও একটি লম্বা-চওড়া রাস্তা দেখা যায়। তারও দুদিকে বেশ উঁচু ও প্রশস্ত বাঁধ দেয়া আছে। শুধু বাঁধের পাশে সারবন্দী তোরণের বদলে আছে দোকান।

রাস্তাটি আসলে একটি বাজারই বলা চলে। গ্রীষ্মে ও বর্ষায় বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় না, কারণ রাস্তাটির ওপরে ছাদ দেয়া আছে। আলো-বাতাসের অভাব নেই। আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য ছাদের মধ্যে যথেষ্ট বড় বড় ফাঁক আছে।

এই দুটি প্রধান রাস্তা ছাড়াও নগরদুর্গের মধ্যে ডাইনে-বামে আরোও অনেক ছোটখাটো রাস্তা আছে। সেইসব রাস্তা দিয়ে ওমরাহদের আবাসির

---

২০. দিল্লীর এই বিখ্যাত 'ক্যানাল' বা খালটি আলি মর্দান খান কাটিয়েছিলেন। আলি মর্দান খান সুদক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন এবং দক্ষতার জন্য তিনি কাবুল ও কাশ্মীরের গভর্নর হয়েছিলেন। জনকল্যাণকর কাজে তাঁর মতো উদ্‌যোগী শাসক তখন খুব অল্পই ছিলেন। অনেক কীর্তি তাঁর আছে, তার মধ্যে দিল্লীর এই খালটি একটি। ১৬৫৭ সালে তিনি মারা যান।–অনুবাদক।

অঞ্চলে যাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমে চব্বিশ ঘণ্টা করে ওমরাহরা প্রত্যেকে সেখানে পাহারা দেন, সপ্তাহে অন্তত একবার দায়িত্ব পড়ে প্রত্যেকের। যেখানে ওমরাহরা এভাবে পাহারা দেন সেই স্থানগুলো সত্যিই খুব মনোরম। নিজেরা খরচ করে তারা সেই স্থানগুলো সাজিয়ে তোলেন। প্রশস্ত উঁচু বাঁধ বা ঘরের মতো জায়গা, চারদিকে তার ফুলবাগান, ছোট ছোট পানির খাল, ঝরনা ইত্যাদি। যারা পাহারা দেন অর্থাৎ পাহারাদার ওমাহরা সম্রাটের কাছ থেকে খাবার পান। যথাসময়ে রাজপ্রাসাদ থেকে খাবার আসে এবং যথারীতি আদব-কায়দা সহকারে ওমরাহরা সেই খাদ্য ভোজনের জন্য গ্রহণ করেন। খাদ্যের থালার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপ্রসাদের দিকে মুখ করে তারা তিনবার সেলাম করেন এবং কুর্নিশের ভঙ্গিতে ওঠানামা করে খাদ্যের পাত্রটি বাহকের হাত পেতে গ্রহণ করেন।[২১]

এই রকম আরোও একটি বড় উঁচু বাঁধ ও তাঁবু আছে নগরের মধ্যে। সাধারণত ব্যবসা-বাণিজ্যের লেনদেন ও দাপ্তরিক কাজকর্মের স্থান হিসেবে সেগুলো ব্যবহার করা হয়।

কারখানার বর্ণনা

বড় বড় হলঘর অনেক জায়গায় দেখা যায়। তাকে কারখানা বলা হয়।[২২] কারিগরদের ওয়ার্কশপের নাম কারখানা। কোনো হলঘরে দেখা যায় সূচিশিল্পের কাজ চলছে, ওস্তাদ তদারক করছেন। কোনো হলঘরে স্বর্ণকাররা কাজ করছে, কোথাও চিত্রকররা ছবি এঁকে যাচ্ছেন। কোথাও বার্নিশ, পলিশ ও লাক্ষার কাজ হচ্ছে। কোথাও চর্মকার, দরজি ও সূত্রধররা কাজ করছে। কোথাও কাজ করছে রেশম-ব্রকেডের কারিগররা, কোথাও সূক্ষ্ম মসলিন ইত্যাদি কাপড় তৈরি হচ্ছে। তা দিয়ে শিরোপা, কোমরবন্ধ, কামিজ ইত্যাদি তৈরি হচ্ছে কোথাও, সোনালি ফুলের ঝালর দেয়া ও বিচিত্র কারুকাজ করা।

মেয়েদের পোশাক তৈরি হচ্ছে কোথাও তা এতো সূক্ষ্ম যে, একরাত্রির বেশি হয়তো ব্যবহার করা চলে না। এই ধরনের একরাত্রির পোশাক,

---

২১. মনসব, জায়গীর, খিলাত, হাতি, ঘোড়া ইত্যাদি যা কিছু হোক, সম্রাটের কাছ থেকে গ্রহণ করার সময় তিনবার সেলাম করা ছিল প্রথা (আইন-ই-আকবরী')।–অনুবাদক।

২২. মোগল যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানতে হলে এই কারখানাগুলো সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। বার্নিয়েরের মতো বিচক্ষণ পর্যটক স্বচক্ষে এসব কারখানার কাজকর্ম দেখেছিলেন এবং তাঁর বিবরণও অত্যন্ত মূল্যবান।
বার্নিয়ার ছাড়া টাভার্নিয়ার, মানুচ্চি প্রমুখ তাঁদের ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে এইসব কারখানার বিবরণ দিয়ে গেছেন। 'আইন-ই-আকবরী'তেও এইসব কারখানার বিস্তৃত বিবরণ আছে। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে ২৬টি প্রধান কারখানা স্বতন্ত্র বিবরণ ছাড়াও আরও ১০টি কারখানার উল্লেখ আছে– অর্থাৎ মোট ৩৬টি কারখানার কথা আছে।–অনুবাদক।

কয়েকঘণ্টার পোশাক, সূক্ষ্ম সুচের কারুকার্যের জন্য হয়তো দশ-বারো ক্রাউন পর্যন্ত দামে বিক্রি হতে পারে।

কারিগররা প্রতিদিন সকালে উঠে কারখানায় যায় এবং সারাদিন কাজ করে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আসে। এভাবে কারখানার নির্জন হলঘরের কোণে সকলের অগোচরে একাগ্রচিত্তে মেহনত করে তাদের জীবনের দিনগুলো কেটে যায়। জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা বলে কারো কোনো কিছু থাকে না এবং নিজেদের জীবনযাত্রার কোনোরকম উন্নতির জন্যও কেউ সচেষ্ট হয় না। যে অবস্থা ও পরিবেশের মধ্যে তারা জন্মায়, সেই অবস্থার মধ্যেই তারা সারাজীবন কাটিয়ে দেয়। সুচিশিল্পী যে, সে তার পুত্রকেও সুচিশিল্পের শিক্ষা দেয়; স্বর্ণকার যে, সে তার পুত্রকে করে স্বর্ণকার এবং শহরের বৈদ্য যে, সে তার পুত্রকেও বৈদ্যই বানাতে চায়।

সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যেই তাদের বিয়ে-শাদি সমাধা হয়। এই সামাজিক বিধি হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কারিগররা কঠোরভাবে মেনে চলে। এর ব্যতিক্রম আইনের চোখে পর্যন্ত নিষিদ্ধ। এই সামাজিক বিধানের ফলে অনেক সুন্দরী মেয়েদেরও আজীবন হয়তো কুমারী জীবন যাপন করতে হয়। কারণ সমধর্মী শিল্পীগোষ্ঠীর মধ্যে অনেক সময় ভালো পাত্র পাওয়া যায় না এবং সে ক্ষেত্রে ভিন্নধর্মী উচ্চ বা নিম্নস্তরের কোনো কারিগরগোষ্ঠীর সঙ্গে বিয়ে দেয়াও সম্ভবপর নয়।[২৩]

আমখাসের কথা

এবার 'আমখাসে'র কথা বলবো।

আমখাসের (যে দরবারকক্ষে সম্রাট প্রজাদের দর্শন দেন) কথা সত্যই ভোলা যায় না। এইসব রাস্তাঘাট, বাঁধ, তোরণ ইত্যাদি পার হয়ে অবশেষে আমখাসে এসে পৌঁছতে হয়। সুন্দর গঠন এই আমখাসের। স্থাপত্যের নির্দশন হিসাবে এটি চমৎকার। বিশাল চতুষ্কোণ চত্বর একটি, অনেকটা আমাদের 'প্লেস রয়ালে'র মতো, চারদিকে তার তোরণ দিয়ে ঘেরা। তোরণের ওপর কোনো ঘরবাড়ি নেই। তোরণের মধ্যে মধ্যে প্রাচীর ব্যবধান, কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যাতায়াত করার জন্য দরজা আছে।

প্রাঙ্গণের একদিকে মাঝখানে একটি খোলা উঁচু জায়গা আছে, তার ওপর নাকাড়াখানা। যেখান বসে বাদ্যকাররা নাকাড়া বাজায়, তাকে 'নাকাড়াখানা' বলে। নাকাড়াখানায় কাড়া-নাকাড়া, দন্দুভি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র থাকে এবং

---

২৩. পেশানুযায়ী কারিগররা বিভিন্ন 'গিল্ডে' বিভক্ত ছিল। 'গিল্ডে'র সামাজিক বিধিনিষেধ কতোকটা আদিম 'ক্ল্যানে'র (Clan) মতো ছিল– অর্থাৎ আধুনিক যুগে আমরা যে 'স্বজাতি' বা 'গোত্র' বলি তার মতো। এই গিল্ড মধ্যযুগীয় একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।–অনুবাদক।

বাদ্যকররা দিনরাত্রির নির্দিষ্ট ঘণ্টায় ঘণ্টায় নানারকম সংকেতধ্বনির জন্য সেগুলো বাজায়। বিদেশী ইউরোপবাসীর কাছে নাকাড়াখানার বাদ্যকরদের এই বাজনা বিচিত্র বলে মনে হয়। কারণ বিশ-পঁচিশজনের একত্রে বাজানো এই বাজনা শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। বড় বড় শানাই, কাড়া-নাকাড়া ও মন্দিরা যখন একত্রে বাজতে থাকে তখন বাস্তবিকই অদ্ভুত শোনায়।

শানাইয়ের আকার কিরকম? একটি শানাই দেখেছি, তার নাম 'কর্ণ'–বিশাল লম্বা এবং নিচের চাবিকাঠিগুলো প্রায় এক ফুট জুড়ে রয়েছে। কাঁসা ও লোহার মন্দিরাগুলো খুব বড়। আওয়াজ তার কিরকম হতে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায় এবং নাকাড়াখানা থেকে এসব বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত শব্দ যে কতোখানি জোরালো হতে পারে, তাও অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

আমি প্রথম দিন এই বাজনা শুনে রীতিমতো হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আমার কান এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এই কাড়া-নাকাড়া, শানাই-মন্দিরার ঐক্যবাদন আমার কাছে অপূর্ব শ্রুতিমধুর বলে মনে হয়। রাতে, বিশেষ করে যখন দূরে কোনো অট্টলিকা-শীর্ষের শয়নকক্ষে আমি শুয়ে থাকি তখন দূর থেকে ভেসে আসা নাকাড়াখানার সেই ঐকবাদন আমার কাছে সুন্দর, সুগম্ভীর ও সুরৈশ্বর্যময় বলে মনে হয়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই অবশ্য। কারণ বাদ্যকররা সকলে প্রায় বাল্যকাল থেকেই বাদ্যচর্চা ও সুরচর্চা করে, সুরের তাল তান, মীড়-মূর্ছনায় অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করে। সে জন্য এই সব বাদ্যযন্ত্রের বিচিত্র শব্দধ্বনি ও সুরের মিশ্রণে তারা চমৎকার শ্রুতিমধুর ঐকতান রচনা করতে পারে এবং দূর থেকে তা শুনতে এতো ভালো লাগে যে, প্রকাশ করা যায় না।

নাকাড়াখানা সম্রাটের প্রাসাদ থেকে দূরে তৈরি করা হয় এবং উঁচু মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সম্রাট বাজনার সুর শুনতে পান, অথচ তার তীব্রতা তাঁর কানে বিরক্তির সৃষ্টি না করে।

সম্রাট সন্দর্শনের প্রথা

সিংহদরজার উল্টো দিকে, চত্বর পার হয়ে সামনে বিরাট একটি হলঘর। হলঘরের মধ্যে সারবন্দী স্তম্ভ। ছাদ ও স্তম্ভ দুই-ই সুন্দরভাবে চিত্রিত। সোনার কাজ করা। অপূর্ব দেখতে। জমি থেকে বেশ উঁচুতে হলঘরটি তৈরি, প্রচুর আলো-বাতাস খেলে সেখানে। তিন দিক খোলা বাইরের চত্বরটির দিকে। মধ্যে একটি প্রাচীর, তার ওপাশে বেগম মহল।

প্রাচীরের মধ্যস্থলের কাছাকাছি মানুষের চেয়েও উঁচু একটি বেদীমঞ্চ এবং সেখানে জানালার মতো একটি বড় গবাক্ষ রয়েছে। সেখানে সম্রাটের সিংহাসন রাখা আছে। প্রতিদিন প্রায় মধ্যাহ্নকালে সম্রাট সেই সিংহাসনে

এসে বসেন, তাঁর ডানে ও বামে শাহজাদারা বসে থাকেন। খোজারা পাশে দাঁড়িয়ে ময়ূরের পাখা ও চামর দিয়ে বাতাস করে। কেউ কেউ বিনম্র ভঙ্গিতে দাসানুদাসের মতো সব সময় তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করে, কখন কি আদেশ হয় সে জন্যে।

রাজসিংহাসনের ঠিক নিচে একটি স্থান পদস্থ আমির-ওমরাহ, দেশীয় রাজা ও বিদেশী রাজদূতদের জন্য আলাদা করে রুপার রেলিং দিয়ে ঘেরা থাকে। নিচের দিকে চোখ নামিয়ে, ঘাড় হেঁট করে, হাত দুখানি সামনের দিকে ক্রস করে তারা সকলে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। আরও একটু দূরে মনসবদার ও সাধারণ ওমরাহরা দাঁড়িয়ে থাকেন, ঠিক ওই একই ভঙ্গিতে, নতশিরে। বাকি জায়গায়, হলঘরে ও চত্বরে, সব রকমের লোক থাকে, নানা স্তরের ও নানা শ্রেণির লোক,– পদস্থ ও সাধারণ ধনী ও নির্ধন সকলেরই সেখানে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ এই হলঘরেই মোগল সম্রাট প্রতিদিন একবার করে সকলকে দর্শন দেন– উচ্চ-নিচু ভেদাভেদ নির্বিশেষে। সে জন্যই এই হলঘরের নাম 'আমখাস' অর্থাৎ সর্বসাধারণের রাজদর্শনগৃহ।

রাজদর্শনের অনুষ্ঠানটি প্রায় দেড় ঘণ্টা ধরে চলতে থাকে। ঘোড়াশালার ভালো ভালো ঘোড়াগুলোকে সিংহাসনের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কারণ সম্রাট স্বচক্ষে দেখতে চান, তাদের কি অবস্থায় কেমন যত্নে রাখা হয়েছে না হয়েছে। ঘোড়াশালায় ঘোড়া আর পিলখানায় হাতিরা সিংহাসনের সামনে দিয়ে মন্থরগতিতে চলে যায়। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সব হাতি, কালো কুচকুচে রং করা, কপাল থেকে শুঁড়ের ডগা পর্যন্ত দুটি লাল রঙের রেখা অঙ্কিত। সুন্দর সব কারুকাজ করা নানা রঙের কাপড়চোপড় দিয়ে হাতিগুলো সাজানো। দুটি বড় রূপার ঘণ্টা পিঠের দু পাশে রূপার শিকল দিয়ে ঝোলানো থাকে এবং কানের দু পাশ তিব্বতী গরুর সাদা লেজ লম্বাকারে বাঁধা থাকে গুল্মের মতো। হাতিগুলো এক অপূর্ব দৃশ্য রচনা করে। দুটি ছোট ছোট হাতি তার মধ্যে সবচেয়ে জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সুশোভিত হয়ে অন্য সব বড় হাতির সামনে এমনভাবে নড়েচড়ে বেড়ায় যে দেখলে মনে হয় যেনো তারা বড় হাতির আজ্ঞাবহ ভৃত্য, প্রভুদের হুকুমের অপেক্ষা করছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ হাতিরই সবচেয়ে জমকালো এবং মনে হয় সে সম্বন্ধে যেনো তারা বেশ সচেতন। পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েই যেনো তারা নিজেদের দেমাগে হেলেদুলে হোমরা-চোমরাদের মতো চলতে থাকে। চলতে চলতে যেমন একে একে তারা সম্রাটের সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়ায়, অমনি মাহুত ডাঙ্গশের একটি ঘা মেরে, পিঠের ওপর শুয়ে পড়ে কানে কানে কি যেনো তাদের বলে দেয়। চুপ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে, একটি জানু বাঁকিয়ে নত হয়ে, কপালের দিকে শুঁড় উঁচতে তুলে গর্জন করে ওঠে হাতি। অর্থাৎ সম্রাটকে হাতিও সশ্রদ্ধ সেলাম জানায়।

হাতির পর অন্যান্য জন্তুদের পালা। পোষা হরিণের দল যায়, হরিণের লড়াই দেখার জন্য সম্রাট অনেক রকমের হরিণ পোষেণ। নীল গাই, গন্ডার সম্রাটের সামনে দিয়ে যায়। বাংলাদেশের বড় বড় মহিষ যায়, লম্বা লম্বা পাকানো তাদের শিং। এই শিং দিয়ে তারা বাঘ-সিংহের সঙ্গে লড়াই করে, সম্রাট দেখে আনন্দ পান। পোষা প্যান্থার ও চিতাবাঘ যায়, হরিণ শিকারের জন্য যত্ন করে পোষা। উজবেকিস্তানের সব ভালো ভালো খেলোয়াড় শিকারি কুকুর যায়, প্রত্যেকটি কুকুরের পায়ে একটি করে লাল রঙের কোর্তা জড়ানো। সবার শেষে নানা রকমের শিকারি পাখি ও বাজপাখি যায়। শুধু পাখি খরগোস ইত্যাদি শিকারেই যে তারা অভ্যস্ত তা নয়, হরিণ পর্যন্ত শিকারেও নাকি ওস্তাদ। বন্য হরিণের ঘাড়ের ওপর বিদ্যুৎবেগে ছোঁ দিয়ে পড়ে এবং হরিণের মাথাটি ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে ঘায়েল করে দেয়। বড় বড় ডানা ঝাপটে তাদের দিশাহারা করে দিয়ে ধারালো থাবায় আঁচড়ে ধরাশায়ী করে।[২৪]

জন্তুজানোয়ারের এই বিচিত্র শোভাযাত্রা ছাড়াও, দু-চারজন ওমরাহের অশ্বারোহী সেনারাও সামনে দিয়ে যায়। অশ্বারোহী সৈন্যরা ভালো ভালো পোশাক পরে থাকে এবং সেদিন ঘোড়াগুলোকে রঙিন সাজে সজ্জিত করা হয়।

আর একটি দৃশ্য দেখতে সম্রাট ভালোবাসেন– তলোয়ার দিয়ে মৃত মেষ কাটার দৃশ্য। মৃত মেষটির নাড়িভুঁড়ি ছাড়িয়ে, চার পা বেঁধে সম্রাটের সামনে নিয়ে আসা হয়। তরুণ ওমরাহ, মনবদার ও গুর্‌জ-বরদাররা নিজেদের পারদর্শিতা ও শক্তি দেখাবার জন্য মেষটিকে এক কোপে এফোঁড়-ওফোঁড় করার চেষ্টা করে।

এতো সব বিচিত্র অনুষ্ঠান গৌণ ব্যাপার মাত্র। আসল কাজ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সম্রাট তাঁর ঘোড়সওয়ার সেনাদের নিজে একবার দেখেন তো নিশ্চয়; গৃহযুদ্ধের অবসানের পর থেকে তিনি প্রত্যেক সৈনিকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হতে চান। নিজে সব স্বচক্ষে তদারক করেন এবং নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী কারো বেতন ও পদমর্যাদা বাড়িয়ে দেন, কারো বা কমিয়ে দেন; কাউকে আবার চাকরি থেকে বরখাস্তও করেন।

আমখাসে সমবেত প্রজাদের মধ্যে থেকে যে সব আর্‌জি-আবেদনপত্র পেশ করা হয় সেগুলো সম্রাটের কাছে এনে তাঁর সামনেই পড়া হয় যাতে তিনি শুনতে পান। তারপর আবেদনকারীদের প্রত্যেককে একে একে সম্রাটের সামনে ডাকা হয়, তিনি স্বচক্ষে তাদের দেখেন এবং সামনা-সামনি অনেক সময় অধিকাংশ ন্যায়-অন্যায় বিচার করেন। অন্যায়ের জন্য অপরাধীদের

---

২৪. নানারকম শিকারের শিকারি জন্তু ও শিকারি পাখির চমৎকার বিবরণ আছে আইন-ই-আকবরী'তে।–অনুবাদক।

সাজাও দেন। সপ্তাহে একদিন নিভৃতে বসে তিনি সাধারণ প্রজাদের ভেতর থেকে দশজনের আবেদনপত্র নিজে বিচার করেন। আদালতখানাতেও সপ্তাহে একদিন করে যান এবং সেখানে সাধারণত দুজন কাজীর সঙ্গে বসে আবেদন-অভিযোগের বিচার করেন।

সম্রাটের এই কাজগুলো দেখে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এশিয়ার সম্রাটদের বর্বরতা ও অবিচার সম্বন্ধে আমাদের মতো বিদেশীদের যে ধারণা আছে, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়।

মোসাহেবির নমুনা

আমখাসের অনুষ্ঠানাদির যে বিবরণ দিলাম তা নিন্দনীয় নিশ্চয় নয়। তার মধ্যে যুক্তি ও মহত্ত্বের পরিচয় যথেষ্ট আছে। কিন্তু এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে একটি ব্যাপার আমার কাছে অতি জঘন্য ও অসহ্য বলে মনে হয়েছে। এখানে তার উল্লেখ না করা অন্যায় হবে। সেটা হলো মোসাহেবি, স্তোকবাক্য ও প্রশস্তি। সম্রাটের মুখ দিয়ে যখনই কোনো একটি কথা বের হয়, তা সে যে কথা বা যতো নগণ্য কথাই হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে সমবেত লোকসভায় তার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হতে থাকে। প্রধান ওমরাহরা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে আসমানের দিকে হাত বাড়িয়ে, কাতরকণ্ঠে 'কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ' ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন– অর্থাৎ প্রভু কি কথাই বললেন। কেউ আর কোনোদিন এমন কথা বলেননি, বলবেনও না কোনোদিন। কি আশ্চর্য কথা! কি সুবিচার! কি দূরদৃষ্টি! আহা...

ইরানীদের পারস্য ভাষায় একটি লোকপ্রবাদ আছে তার অর্থ হলো : 'শাহ যদি বলেন দিনটাকে রাত, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যেরা বলবেন, আহা। কি সুন্দরই না চাঁদ উঠেছে আকাশে, কি চমৎকার তারার ঝিলিমিলি!' মোগল দরবারেও ঠিক তাই হয়ে থাকে।

স্তাবকতা মোসাহেবি যেনো সকলের অস্থিমজ্জায় মিশে রয়েছে, সর্বস্তরের লোকের মধ্যে। যদি কোনো মোগলের আমার কাছে কোনো কাজ থাকে, তাহলে তিনি আমার মতো ব্যক্তিকেও বলবেন: 'আপনি? আপনার মতো লোক আর দেখা যায় না। আপনি এ্যারিস্টটল, আপনি হিপোক্রেটিস, আপনিই বর্তমান যুগের ইবনে সিনা-উজ্জামান।'

প্রথম প্রথম আমি তো ঘাবড়েই যেতাম এবং আমার সহানুভূতি প্রার্থীদের বোঝাবার চেষ্টা করতাম যে, আমি কিছুই নই। আমি সামান্য একজন লোক মাত্র। আমার এমন কিছু বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা নেই যে ঐ সব মহান ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করা যেতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখলাম, আমার অনুনয়-বিনয়ে কোনো কাজ হয় না, বরং উল্টো ফল ফলে, এবং স্তাবকতা ক্রমে

বাড়তেই থাকে। সুতরাং কানটাকে ক্রমে অভ্যস্ত করে নেয়াই ঠিক করলাম এবং তাঁদের কোনো স্তোকবাক্যেই আর আমার মনে এখন কিছুই হয় না।

এখানে একটি ছোট্ট কাহিনী উল্লেখ করবো। বিশেষ ক্ষেত্রে না করে পারছি না। এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে আমি আমার আগা সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম। আগা সাহেবকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীরপুরুষের সঙ্গে তুলনা করে, নানা রকমের সব আজগুবি চাটুবাক্য বর্ষণ করে, পণ্ডিত মহাশয় শেষকালে তাঁকে বললেন : 'আপনি যখন আপনার ঘোড়সওয়ার সেনার আগে-আগে ঘোড়ার পিঠে জিনে পা লাগিয়ে চলতে থাকেন, তখন মনে হয় যেনো আপনার পায়ের তলায় পৃথিবী পর্যন্ত কেঁপে উঠছে। যে আটটি হাতির মাথার ওপর পৃথিবীটা অবস্থান করছে, তারা আর তখন আপনার ভার সইতে না পেরে মাথা নাড়তে থাকে এবং পৃথিবী টলমল করে ওঠে।'

পণ্ডিতের এই চাটুবাক্যের বর্ষণ শেষ হবার পর শ্রোতাদের মনে তার কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বুঝতেই পারছেন। আমি তো হো হো করে হেসে উঠলাম। আগা সাহেবকে আমি ঠাট্টা করে বললাম : 'আপনার উচিত আরেকটুকু সাবধানে ঘোড়ায় চড়া, কারণ আপনার ঘোড়ায় চড়ার জন্য যদি ভূমিকম্প শুরু হয়, তাহলে তো মারাত্মক ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে।'

আগা সাহেব বুদ্ধিমান ও রসিক ব্যক্তি। আমার কথার উত্তরে তিনি বললেন, 'তা তো বটেই, তা তো বটেই। সে জন্যই তো পারতপক্ষে আমি ভয়ে আর ঘোড়ায় চড়ি না, পালকিতেই চড়ে বেড়াই!'

গোসলখানার বর্ণনা

আমখাসের বিশাল হলঘরের ভেতর দিয়ে একটি নিভৃত ঘরে যাওয়া যায়, তার নাম 'গোসলখানা'।[২৫] গোসলখানা হাতমুখ ধোওয়া ও স্নানাদি করার ঘর বলা হয়। গোসলখানায় অবশ্য সকলের প্রবেশ নিষেধ এবং তার আয়তনও আমখাসের মতো বিশাল নয়। তা না হলেও ঘরটি বেশ বড় এবং চমৎকারভাবে রঙিন চিত্র ও নক্‌শা দিয়ে সুশোভিত। দেখতে খুব সুন্দর ও রুচিসম্মত। চার-পাঁচ ফুট উঁচু ভিতের ওপর নির্মিত, বড় চাতালের মতো। এই গোসলখানার নির্জন কক্ষে বসে সম্রাট আমির-ওমরাহ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজ্যের খবরাখবর অবগত হন, সঙ্গোপনে সলাপরামর্শ করেন এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেন। কখনো কখনো জরুরি আদেশনামা জারি করেন ।

---

২৫. গোসলখানা গোসল করা ও হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে নির্মিত ঘর হলেও এটি সম্রাটের গোপন সভাকক্ষ হিসেবেও ব্যবহার করা হতো। গোপনে ও নিভৃতে যে সব বিষয় রাজ-কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন, তা আমখাসের বদলে গোসলখানাতে বসেই করা হতো। এটি মোগল যুগে প্রচলিত রীতি ছিল তাই।—অনুবাদক।

সকালের দিকে আমখাসে যেমন ওমরাহরা উপস্থিত থাকেন, সন্ধ্যার দিকে গোসলখানায় তেমনি তাদের উপস্থিত থাকতে হয়। উভয় বেলা হাজিরা দিতে তারা বাধ্য। তা না হলে তাদের জরিমানা করা হয়। কারণ, রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে প্রতিদিন দুবেলা আমখাস ও গোসলখানায় হাজিরা দেয়া তাদের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। একজন শুধু দৈনন্দিনকার এই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্ত রয়েছেন, তিনি আমার মনিব আগা সাহেব দানেশমন্দ খান। তাঁকে এই ছাড় দেয়ার কারণ, সম্রাট আগা সাহেবকে তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে অন্যতম জ্ঞানী ব্যক্তি বলে মনে করেন। আর সে জন্যে তাঁকে দৈনন্দিন দরবারী রীতিনীতি মানতে বাধ্য করেন না। সেই সময়টা তাঁকে অধ্যয়নের জন্য ছুটি দেয়া হয়। শুধু সপ্তাহে একদিন, প্রতি বুধবার তাঁকে আমখাস ও গোসলখানায় গিয়ে হাজিরা দিতে হয়। সেই একই দিন তাঁর ওপর পাহারা দেয়ার ভার পড়ে।

প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় দুবার করে রাজসভাগৃহে হাজিরা দেয়ার এই প্রথা খুব প্রাচীন। কোনো আমির এই প্রথার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারেন না। কারণ সম্রাট নিজেও দুবেলা এভাবে নিয়মিত হাজিরা দেন এবং দেয়াটা তাঁর অন্যতম কর্তব্য বলে মনে করেন।[২৬] অসুখ-বিসুখ না হলে অথবা বিশেষ কোনো গুরুতর ব্যাপার না ঘটলে সম্রাট নিজে দুবেলা আমখাস ও গোসলখানায় নিয়মিত উপস্থিত হন। আওরঙ্গজেব যখন ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখনও তাঁকে প্রতিদিন অন্তত একবার অন্দরমহল থেকে আমখাস নয়তো গোসলখানায় বহন করে নিয়ে আসা হতো। তিনি নিজে প্রতিদিন সকলের সামনে দর্শন দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন। কারণ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা তখন খুবই নাজুক ছিল। তিনি একদিন দর্শন না দিলেই বাইরে তাঁর মৃত্যুর গুজব রটনা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। আর গুজব রটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণবিদ্রোহ ও ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

গোসলখানায় বসে সম্রাট রাজকার্য পরিচালনা করলেও যতোটা সম্ভব আমখাসের মতো আদব-কায়দা বজায় রাখা হয়। তবে দিনের শেষে কাজ শুরু হয় বলে এবং গোসলখানা সংলগ্ন কোনো মুক্ত চত্বর না থাকার কারণে ওমরাহদের পক্ষে ঘোড়সওয়ার সেনাদলের কুচকাওয়াজ দেখানো সম্ভব হয় না।

গোসলখানার সান্ধ্য সভায় একটি উৎসব বিশেষভাবে পালন করতে দেখেছি। যেসব মনসবদার পাহারায় থাকেন, তারা সম্রাটের সামনে দিয়ে একবার করে মহাসমারোহে সেলাম করে যান। তাদের হাতে থাকে নানা

---

২৬. প্রতিদিন দুবার করে সভাগৃহে সম্রাটের দর্শন দেয়ার এই রীতির কথা 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে।—অনুবাদক।

রকমের রুপার প্রতীক। এ দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য হয়। প্রতীকগুলো রুপার দণ্ডের ওপর বসানো থাকে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে দুটি মাছের মূর্তি, আজদাহা নামে দুটি বৃহদাকার জন্তুর মূর্তি, যেটি দেখতে অনেকটা ড্রাগনের মতো। এ ছাড়া দুটি সিংহের, দুটি হাতের পাঞ্জার, একজোড়া দাঁড়িপাল্লা এবং আরোও অনেক প্রতীক মূর্তি মনসবদাররা বহন করেন। সব প্রতীকেরই নাকি ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য রয়েছে।

মনসবাদের সঙ্গে গুর্জবদারারও থাকে, দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ সব। তাদের কাজ হলো সভাকালীন শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজাদেশ পালন করা এবং প্রয়োজন হলে সম্রাটের হুকুম বিদ্যুগতিতে তামিল করা।

হারেমের বর্ণনা

এবার আপনাকে মোগল সম্রাটের হারেম বা অন্দরমহলের সামান্য পরিচয় দেবো। কিন্তু অন্দরমহলের গৃহবিন্যাস বা স্থাপত্যাদি সম্বন্ধে নির্ভুল কিছু বলার ক্ষমতা আমার বা কোনো পর্যটকেরই নেই। সম্রাটের সেই হারেমের অন্দরমহল দেখার সৌভাগ্য আজ পর্যন্ত কারো হয়নি। কখনো কখনো সম্রাট যখন দিল্লী থেকে বাইরে চলে যেতেন, তখন আমি দু-একবার অনেক চেষ্টা করে হারেমের অন্দরমহলে ঢুকেছি এবং কিছুটা দেখেছি।

একবার সম্রাট বেশ কিছুদিনের জন্য দিল্লীতে অনুপস্থিত ছিলেন। সেই সময় হারেমের কোনো মহিলার কঠিন অসুখ হয়। যে কোনো কারণে বাইরে আসা তাঁদের নিষেধ ছিল। পর্দাপ্রথা সনাতন প্রথা। সুতরাং চিকিৎসক হিসেবে আমাকেই অন্দরমহলে যেতে হয়।

যেতে যখন বাধ্য হলাম তখন দু চোখ খুলে যাওয়া সম্ভব হলো না। একটি বড় কাশ্মিরী শাল দিয়ে আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে দেয়া হলো। অতঃপর একজন খোজা এসে আমাকে হাত ধরে অন্দরমহলে নিয়ে গেলো। অন্ধের মতো আমি বেগম মহলে প্রবেশ করলাম। কিছুই দেখতে পেলাম না। শুধু আমার পথপ্রদর্শক খোজার মুখে হারেমের বর্ণনা শুনে যা বুঝলাম তাই আপনাকে বলছি।

খোজা বলল– অন্দরমহলে সুন্দর সুন্দর সব কামরা আছে। বেশ বড় বড় কামরা। প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, এক কামরার সঙ্গে অন্য কামরার কোনো যোগাযোগ নেই। কামরার ভেতরে সৌন্দর্য ও বাইরে পরিপাটিও আছে যথেষ্ট। যেমন বেগম তেমনি তাঁর কামরা। যিনি উচ্চপদস্থ, যাঁর রোজগার বেশি, তাঁর কামরাটিও তেমনি সুন্দর। যিনি সে রকম মর্যাদার নন, তাঁর কামরারও তেমন সৌন্দর্য নেই।

অন্দরমহলের চারদিকেই বাগান আছে, সুন্দর সাজানো বাগান ও বাগিচা। প্রত্যেক কামরার দরজার কাছে একটি করে পানির চৌবাচ্চা আছে। সুন্দর

সুন্দর মনোরম রাস্তা, ছায়াঘেরা কুঞ্জবন, ঝরনা, ভূগর্ভস্থ কক্ষ, উঁচু মঞ্চ ও তোরণ ইত্যাদিও আছে। এমনভাবে সব ব্যবস্থা করা আছে যে, অন্দরমহলের সীমানার মধ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ কিছু বোঝা যায় না। সূর্যকে আড়াল করে আনন্দ করার মতো আরামকুঞ্জ আছে, আবার উচ্চ মঞ্চের ওপর শুয়ে-বসে চাঁদের আলো বা শীতল বাতাস উপভোগ করার মতো ব্যবস্থাও আছে।

নদীর সামনে একটি ছোট মিনার সম্পর্কে খোজাদের পঞ্চমুখে প্রশংসা করতে শুনেছি। মিনারটি নাকি সোনার পাত দিয়ে মোড়া, আগ্রার দুটি মিনারের মতো। তার কক্ষগুলোও স্বর্ণমণ্ডিত এবং নানা রকম রঙিন চিত্রে সুশোভিত। বড় বড় আয়নাও আছে দেয়ালের গায়ে (বার্নিয়ার 'খাসমহলে'র কথা বলেছেন)।

এবার রাজদুর্গ থেকে বিদায় নেয়ার আগে আরেকবার আমখাসের কথা মনে করিয়ে দিতে চাই। মনে করিয়ে দেয়ার বিশেষ কারণ আছে। আমখাসে আমি কতোগুলো বাৎসরিক পার্বণের উৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখেছি। বিশেষ করে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর যে অনুষ্ঠান হয়েছিলো, সমারোহ ও বৈচিত্র্যের দিক থেকে তার তুলনা হয় না। আমি অন্তত আর কোথাও অমন চমকপ্রদ অনুষ্ঠান দেখিনি।

আমখাসের উৎসব

আমখাসের হলঘরের প্রান্তে সিংহাসনের ওপর সম্রাট রাজপোশাক পরে উপবেশন করেন। সাদা ধবধবে সাটিনের মের্জাই গায়ে, তার ওপর রেশম ও সোনার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা। শিরস্ত্রাণও স্বর্ণখচিত কাপড়ের তৈরি, মাথার গোড়ায় নানা আকারে হীরে বসানো। মধ্যে একটি ওরিয়েন্টাল 'পুষ্পরাগ' বা পোখরাজ। সূর্য কিরণের মতো দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়ে আসে তার ভেতর থেকে। তার সৌন্দর্যের তুলনা হয় না।[২৭] গলায় একটি মুক্তার মালা, পেট পর্যন্ত লম্বা। ভারতের অন্যান্য ভদ্রলোকও এরকম মালা পরেন, প্রবালের মালা। সিংহাসনের দুটি পায়া একেবারে খাঁটি সোনায় তৈরি, তার ওপর হীরা, পান্না, চুনি তারার মতো ছড়ানো। কতো রকমের মণিমুক্তা এবং তার মূল্যই বা কতো, তা সঠিকভাবে আমি বলতে পারবো না। কারণ আমি জহুরী নই এবং সব রকমের মণিরত্ন সকলের পক্ষে চেনাও সম্ভব নয়। তবে আমার মনে হয় সিংহাসনটির মূল্য অন্তত চার কোটি টাকার কম হবে না। একশো হাজারে এক লাখ এবং

---

২৭. ১৬৬৫ সালের ২রা নভেম্বর এই রত্নটিই মনে হয় টাভার্নিয়ারকে (Tavernir) দেখানো হয়েছিলো (Tavernir : Travles, Vol.I.P.400) । টার্ভানিয়ার রত্নটির বর্ণনা করেছেন– 'of very high Colour, cut in eight panels' বলে। রত্নটির ওজন ব্রিটিশ ১৫২ ক্যারেটের কিছু বেশি বলে তিনি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে গোয়া থেকে এটি মোগল সম্রাটের জন্যে ১৮১,০০০ টাকায় কেনা হয়েছে।–অনুবাদক।

একশো লাখে এক কোটি হয়। সুতরাং সিংহাসনের মূল্য প্রায় চারশো লাখ টাকার সমান বলে আমার ধারণা।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পিতা শাহজাহান এই সিংহাসনটি তৈরি করিয়েছিলেন। নাম দিয়েছিলেন 'ময়ূর সিংহাসন।' দেশীয় রাজা ও পাঠান সুলতানদের কাছ থেকে নিয়ে আসা মণিমুক্তা, বাৎসরিক নজর ও উপঢৌকন হিসেবে পাওয়া রত্ন, বিশেষ বিশেষ উৎসবে আমির-ওমরাহদের কাছ থেকে উপহার পাওয়া মণিরত্ন রাজকোষে জমা ছিলো। সম্রাট শাহজাহান তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন এই সিংহানটি তৈরি করে।

সিংহাসন নির্মাণ-কৌশল বা কারিগরি দিকে তার মণিরত্নের উপাদানের তুলনায় তেমন আহামরি কিছু বলে মনে হয় না। শুধু মণিমুক্তাখচিত ময়ূর দুটি প্রশংসার যোগ্য। পরিকল্পনা ও কারিগরি দুই-ই প্রশংসাযোগ্য।[২৮] একজন খুব দক্ষ শিল্পী এই ময়ূর দুটি তৈরি করেছিলেন। তিনি ফরাসী শিল্পী, নাম...।[২৯] অদ্ভুত কৌশলে নকল মণিরত্ন দিয়ে ইউরোপের রাজাদের প্রতারণা করে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে এসে মোগল সম্রাটের দরবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মোগল দরবারে কাজ করে ফরাসী শিল্পীর ভাগ্য ফিরে গিয়েছিলো।

রাজসিংহাসনের পায়ের কাছে আমির-ওমরাহরা একটি উঁচু বেদীর ওপর জমকালো পোশাক-পরিচ্ছেদ পরে দাঁড়িয়ে থাকেন। বেদীটি একটি রুপার রেলিং দিয়ে ঘেরা, মাথায় সোনার ঝালর দেয়া চাঁদোয়া। হলঘরের স্তম্ভগুলোতে সোনার কাজ করা দামী ব্রকেড ঝোলানো থাকে। ফুলতোলা সাটিনের চাঁদোয়া আগাগোড়া টাঙানো, লাল রেশমী দড়ি দিয়ে বাঁধা এবং সেই বাঁধনের কাছ থেকে বড় বড় রেশমের ও সোনার সব ট্যাসেল ঝোলানো। মেঝেটি সিল্কের কার্পেট দিয়ে মোড়া। এতো বড় কার্পেট বা গালিচা কোথাও দেখা যায় না। একটি প্রকাণ্ড তাঁবু বাইরে খাটানো থাকে, হলঘরের চেয়েও বড়। তাঁবুর সঙ্গে হলঘরের যোগও থাকে। প্রাঙ্গণের প্রায় অর্ধেকটা জুড়ে তাঁবু খাটানো হয়, চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা, রুপার পাত দিয়ে মোড়া। তাঁবুর ভার বহন করে মোটা থামের মতো পোস্ট, কয়েকটা বেশ মোটা, বড় জাহাজের মাস্তুলের মতো। অন্যগুলো ছোট। তাঁবুর ওপরের দিকটা লাল

---

২৮. পর্যটক টাভার্নিয়ার এই সিংহাসনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর ভ্রমণ কাহিনীর মধ্যে (Travels, Vol.O.P 381-385)। তেহরান ট্রেজারিতে সিংহাসনটি রাখা আছে। ১৭৩৯ সালে নাদির শাহ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি ময়ূর সিংহানটি ইরানে নিয়ে যান।–অনুবাদক।

২৯. বার্নিয়ার শিল্পীর নামটি প্রকাশ করেননি কেনো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু বার্নিয়ারের ভ্রমণ কাহিনীর স্টুয়ার্ট সংস্করণ (কলিকাতা ১৮২৬)-এ শিল্পী হিসেবে 'La Grange' নামটি পাওয়া যায়। নামটি সঠিক কি ভুল, তা অবশ্য বলার উপায় নেই।–অনুবাদক।

রঙের, ভেতরের দিকটা চমৎকার মসলিন কাপড় দিয়ে সাজানো। কাপড়টিতে বড় বড় ফুল তোলা। নানা রঙের ফুল। এতো নিখুঁত দেখতে ফুলগুলো এবং এতো উজ্জ্বল রং যে, তাঁবুটি যেনো ফুলের বাগান দিয়ে ঘেরা মনে হয়!

চারদিকে যে সব গ্যালারি ও বারান্দা আছে, সেগুলো সাজাবার ভার পড়ে আমির-ওমরাহদের ওপর। এক-একজন একটি করে গ্যালারি সাজাবার দায়িত্ব নেন। তার জন্য প্রত্যেকেই চেষ্টা করেন যাতে তার গ্যালারিটি সবচেয়ে সুন্দর করে সাজানো হয় এবং সম্রাট দেখে বাহবা দেন। এমন প্রতিযোগিতার কারণে গ্যালারি সাজানো খুব চমৎকার হয় এবং প্রত্যেকটি বারান্দা ও গ্যালারি আগাগোড়া গালিচা ও ব্রকেড দিয়ে ঢাকা থাকে।

উৎসবের তৃতীয় দিনে সম্রাট ও সম্রাটের পরে তাঁর আমির-ওমরাহরা দাঁড়িপালায় নিজেদের ওজন করান। দাঁড়িপাল্লা ও বাটখারা দুই নীরেট সোনার তৈরি। আমার বেশ মনে আছে, যে বছরের কথা আমি বলছি সে বছর উৎসবের সময় সম্রাট আওরঙ্গজেবের ওজন নিয়ে যখন দেখা গেলো যে তার ওজন আগের বছরের তুলনায় দুই পাউন্ড বেড়েছে, তখন সবাই হাসিতে ফেটে পড়েছিলো।

এরকম উৎসব প্রত্যেক বছরই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু যে বছরের কথা আমি বলছি বা যা অনুষ্ঠান আমি দেখেছি, সে রকম জাঁকজমক ও সমারোহ কোনো বছর হয়নি। শোনা যায়, উৎসবের এই সমারোহের বিশেষ একটা কারণ ছিল। গৃহযুদ্ধের জন্য দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য, বিশেষ করে রেশম, ব্রকেড ইত্যাদি বিলাসদ্রব্যের কেনাবেচা এরকম ছিলই না বলা চলে। সম্রাট আওরঙ্গজেব এই উৎসবের মাধ্যমে বণিকদের কয়েক বছরের সঞ্চিত দ্রব্য বিক্রয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এই উৎসবে ওমরাহদের যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছিলো, তা কল্পনাতীত। কিছুটা এই অর্থের অংশ সাধারণ সেপাইদের ভাগ্যেও জুটেছিলো। কারণ সম্রাটের আদেশে ওমরাহরা সেপাইদের মের্জাই তৈরি করার জন্য ব্রকেড কিনতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এই বাৎসরিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বহুকালের একটি প্রচলিত প্রথাও পালন করা হয়ে থাকে। প্রথাটি ওমরাহদের কাছে খুব প্রীতিকর নয়। প্রথাটি হলো, বাৎসরিক উৎসবের সময় সম্রাটকে নিজ নিজ পদমর্যাদা ও বেতন অনুযায়ী প্রত্যেক ওমরাহের পক্ষ থেকে উপহার দেয়া হয়। কেউ কেউ অবশ্য এই সুযোগে বেশ মূল্যবান উপহার দিয়ে সম্রাটকে খুশি করারও সুযোগ পান। অনেক কারণে তারা এই সুযোগ খুঁজে বেড়ান। যেসব কর্মচারী কোনো অপকর্ম, অত্যাচার বা ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, সে সম্বন্ধে যাতে কোনো তদন্ত না হয়, অথবা সম্রাট কোনো কৈফিয়ত তলব না করেন, সে জন্যও কেউ কেউ বহু মূল্যবান উপহার নিয়ে সম্রাটের সামনে হাজির হন। কেউ কেউ আবার ভালো

সেলামী দেন নিজেদের পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধির জন্য। কেউ উপহার দেন বহু মূল্যবান মণিরত্ন, হীরে জহর পান্না চুনি ইত্যাদি। কেউ দেন সোনার পাত্র, রত্নখচিত; কেউ দেন সোনার মোহর।

একবার এই উৎসবের সময় সম্রাট আওরঙ্গজেব জাফর খানের কাছে গিয়েছিলেন, তবে উজীর বলে নয়– তাঁর আত্মীয় বলে। জাফর খান সম্রাটকে সোনার মোহর, সুন্দর সুন্দর মুক্তা, চুনি ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার ক্রাউন মূল্যের রত্ন উপহার দিয়েছিলেন। অবশ্য সম্রাট শাহজাহান নাকি এইসব রত্নের মূল্য আরও কম, মাত্র পঁচিশ হাজার ক্রাউন বলে ধার্য করেছিলেন। সে কথা শুনে অনেক বড় জহুরী পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কারণ তাঁরাও তার সঠিক মূল্য যাচাই করতে পারেননি।[৩০]

হারেমের মেলার বর্ণনা

এই উৎসবের সময় হারেমে বা অন্দরমহলে একটি অদ্ভুত ধরনের মেলা হয়।[৩১] মেলা পরিচালনার দায়িত্ব নেন আমির-ওমরাহদের পত্নীরা, সাধারণত তাদের মধ্যে সবচেয়ে রূপবতী স্ত্রী যারা, তারা। বড় বড় আমির-ওমরাহ ও মনসবদারদের সুন্দরী ভার্যারাই হারেমের এই বিচিত্র মেলার পরিচালিকা। যে সমস্ত দ্রব্য মেলায় সাজানো হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জরির ফুল, লতাপাতা-তোলা রেশমি কাপড়, ভালো ভালো সুচিশিল্প, সোনার কারুকাজ করা শিরস্ত্রাণ, দামী মসলিন জাতীয় বিলাসসামগ্রী। মেলার বিশেষত্ব হলো, সুন্দরী রমণীরা (আমির ও মনসবারদের স্ত্রী) বিচিত্র বেশবিন্যাস করে বেচাকেনার কাজ করেন। তারাই বিক্রেতা সাজেন। ক্রেতা হলেন সম্রাট, তাঁর বেগমরা এবং হারেমের নামজাদা মহিলারা। যদি কোনো আমির পত্নীর কোনো সুন্দরী কন্যা থাকে, তাহলে তিনি তাকেও সাজিয়ে গুজিয়ে সঙ্গে করে মেলায় নিয়ে যান, যাতে কন্যার দিকেও সম্রাট ও তাঁর বেগমদের নজর পড়ে এবং তার সঙ্গে তারা পরিচিত হন।

---

৩০. টার্ভানিয়ারের লেখা থেকে জানা যায়, সম্রাট আওরঙ্গজেব একবার শাজাহানের কাছে ওই সব মণিরত্নের মূল্য সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। কারণ মণিরত্নের ব্যাপারে শাহজাহান অভিজ্ঞ ছিলেন।–অনুবাদক।

৩১. প্রতি মাসের উৎসবের তৃতীয় দিন বিশ্বের সুন্দর সুন্দর সামগ্রীর বিষয়ে প্রশ্ন করার জন্য সম্রাট একটি করে সভা আহ্বান করতেন। বণিকরা তাতে যোগদান করতো এবং পণ্যদ্রব্যের পসরা সাজাতো। সম্রাটের হারেম সহ অন্য মহিলারা তাতে আমন্ত্রিত হতেন। একটা মেলার মতো সেখানে কেনাচেনা চলতো। সাধারণত দিনেই সম্রাট তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনতেন, নানা জিনিসের মূল্য ঠিক করে দিতেন। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য সম্পর্কে তিনি প্রত্যক্ষ জ্ঞানও অর্জন করতেন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ অবস্থা, দেশের কারখানাগুলোর ত্রুটি-বিচ্যুতি ইত্যাদি সব এই মেলায় ধরা পড়তো। এই মেলামেশা ও পণ্য বিনিময়ের দিনটিকে সম্রাট বলতেন 'খুশরোজ' অর্থৎ খুশির দিন। (আইন-ই-আকবরী)–অনুবাদক।

মেলার প্রধান আকর্ষণ হলো, কেনাবেচার চমৎকার হাস্যকর অভিনয়টি। সম্রাট নিজে ঘুরে ঘুরে সাজানো জিনিসপত্র দেখেন এবং সুন্দরী বিক্রেতা আমির-মনসবদার পত্নীদের সঙ্গে দরদস্তুরও করেন। দরদস্তুরের ভঙ্গিমাটি খুব মজার। অনেক সময় দু-চার পয়সা নিয়ে সম্রাট সুন্দরীদের সঙ্গে দর কষাকষি করেন এবং এমন ভাব দেখান যে তিনি তার চেয়ে এক কড়িও বেশি মূল্য দিতে রাজি নন।

সম্রাট বলেন– 'তোমরা বেশি দাম চাইছো, যেরকম জিনিস নয় তার চেয়ে বেশি। দাম যদি না কমাও তো রইলো তোমাদের জিনিস। আমি অন্য কারো কাছে চললাম, দেখি যদি ঐ দামে কেউ বিক্রি করে।'

এই রকমের অনেক কেনাবেচার কথাবার্তা হয়। সুন্দরীরাও তখন সম্রাটকে নানা ভঙ্গিতে জিনিস গছাবার চেষ্টা করেন এবং তাঁকে নিয়ে বেশ টানাটানি চলে। সম্রাটও সহজে ছাড়ার পাত্র নন। দুই পক্ষে যখন টানাটানি ও দর কষাকষির অভিনয় চলে তখন সম্রাট যদি কিছুতেই রাজি না হন, তাহলে সুন্দরী আমির-পত্নী ও মনবদার-পত্নীরাও মুখ ঘুরিয়ে বেশ জোর গলায় দু-চার কথা শোনাতে ছাড়েন না। তাঁরাও সম্রাটকে বলেন–'না নেবেন, না নেন। আপনি এসব জিনিসের কদর বুঝবেন কি করে? দেখেছেন কখনও এমন জিনিস? বেশ, না নেন যদি তাহলে দেখুন অন্য কোথাও সুবিধে পান কি না' ইত্যাদি। এভাবে মেলার মধ্যে কেনাবেচার একটা রং-তামাসা চলতে থাকে ।

সম্রাটের বেগমরা সস্তায় কেনার আগ্রহ আরোও বেশি করে দেখান এবং দর নিয়ে নানা রকম অভিনয় করেন। মধ্যে মধ্যে আমির পত্নী ও মনবদার-পত্নীদের সঙ্গে সম্রাট ও তাঁর বেগমদের দরাদরি ও তর্কবিতর্ক রীতিমতো কলরবে পরিণত হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটি মিলে একটি চমৎকার কৌতুকনাট্যের অভিনয় করা হয়। অবশেষে সুন্দরীরা সম্রাট ও বেগমদের কাছে জিনিস বিক্রি করতে রাজি হন। তখন সম্রাট ও তাঁর বেগমরা মেলা থেকে অনবরত জিনিস কিনতে থাকেন, এবং অনর্গল টাকা দিতে থাকেন। তারই ফাঁকে ফাঁকে হয়তো সম্রাট দাম ছাড়াও দু-চারটা সোনার মোহর সুন্দরী বিক্রেতা অথবা তাদের রূপসী কন্যাদের বিতরণ করেন পুরস্কার-স্বরূপ। 'সাধু-ব্যবসায়ী' বলে তিনি পুরস্কার দেন। গোপনেই সকলে পুরস্কারটি গ্রহণ করেন এবং হাসিঠাট্টা রঙ্গ-তামাসার মধ্যে এভাবে হারেমের মেলাটি শেষ হয়।*

---

* হারেমের উদ্যানে অনুষ্ঠিত এ মেলাটি 'নওরোজ' বা 'নতুন দিন' নামে পরিচিত ছিল।– অনুবাদক।

কাঞ্চনবালার কাহিনী

সম্রাট শাহজাহানের নারীর প্রতি অনুরাগ ছিল যথেষ্ট এবং তিনিই নাকি এইসব উৎসবে এই জাতীয় মেলার প্রবর্তন করেছিলেন। তার জন্য ওমরাহ্‌রা নাকি বিশেষ খুশি হতেন না।[৩২]

শাহজাহান তাঁর হারেমে বাইরের নাচনেওয়ালীদের প্রবেশাধিকার দিয়ে নিশ্চয়ই শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করেছিলেন বলতে হবে। তিনি নাচ করানোর জন্য তাঁর হারেমে বাইরের যে নতর্কীদের নিয়ে আসতেন, তাদের 'কাঞ্চনবালা' বলা হতো। কাঞ্চনবর্ণ রূপসী যুবতী মেয়ের দল তারা। বাইরে থেকে হারেমের মধ্যে তাদের সম্রাট নিয়ে আসতেন এবং রাতভোর আটকে রেখে দিতেন। তারা কিন্তু বাজারের বারাঙ্গনা নয়, গৃহস্থ ও ভদ্রঘরেরর মেয়েই বেশি। আমির-ওমরাহ ও মনসবদারদের বিবাহোৎসবে এরা নাচগান করার জন্যে আমন্ত্রিত হয়।

ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট সম্রাট শাহজাহান ও মমতাজ মহল

অধিকাংশ কাঞ্চনবালা বেশ সুন্দরী দেখতে, পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত এবং নৃত্যগীতকলায় রীতিমতো পারদর্শী। যেমন নাচিয়ে তেমনি গাইয়ে। দেহের গড়ন ও অঙ্গপ্রত্যক্ষ এমন নরম ও কোমল যে, নৃত্যের প্রতিটি ভঙ্গিমা

---

৩২. ধার্মিক মুসলমানরা সাধারণত এ ধরনের মেলার বিরোধী ছিলেন। বাদাউনি (Badaoni) ছিলেন সম্রাট আকবরের আমলের এক নির্ভীক ঐতিহাসিক। মেলা সম্বন্ধে তাঁর উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন: 'ইসলাম ধর্মের নীতিকে আঘাত করার জন্যই যেনো সম্রাট এই মেলায় (নববর্ষের সময়) বেগমদের, হারেমের মহিলাদের ও অন্যান্য বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের যোগদান করার ও পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করার আদেশ দিয়েছেন। এ ধরনের মেলায় সম্রাট নিজেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেন। তা ছাড়া হারেমের মহিলাদের অনেক গোপনীয় ব্যাপার, বিবাহাদির কথাবার্তা, যুবক-যুবতীদের প্রেমের সূত্রপাত, সবই এই মেলাতেই ঘটে থাকে।'—অনুবাদক।

অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যেন লীলায়িত হয়ে ওঠে। তাল ও মাত্রাজ্ঞানও চমৎকার। কণ্ঠের মিষ্টতাও অতুলনীয়। অথচ এই কাঞ্চনবালারা গৃহস্থঘরের মেয়ে।

সম্রাট শাহজাহান কাঞ্চনবালাদের যে শুধু মেলাতেই নিয়ে আসতেন তা নয়, প্রতি বুধবারে সম্রাটের সামনে আমখাসে তাদের হাজিরা দিতে হতো। এটা নাকি অনেক দিনের প্রাচীন প্রথা। সম্রাট শাহজাহান শুধু তাদের একবার চোখে দর্শন করেই মুক্তি দিতেন না। প্রায়ই তিনি সারারাত তাদের আটকে রাখতেন এবং রাজকর্মের শেষে তাদের নৃত্যগীত উপভোগ করতেন, তাদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটাতেন।

আওরঙ্গজেব তাঁর পিতার চেয়ে অনেক বেশি গোঁড়া ধর্মানুরাগী ও আত্মসংযত ছিলেন। তিনি কঞ্চনবালাদের হারেমে প্রবেশ করতে দিতেন না। তবে বহুকালের প্রথানুযায়ী প্রতি বুধবারে তাদেরকে একবার করে আমখাসে আসার হুকুম দিয়েছিলেন। আমখাসে এসে বহুদূর থেকে তারা সম্রাটকে সেলাম করে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে চলে যেতো।

বার্নার্ডের কথা

উৎসব অনুষ্ঠান, মেলা, কাঞ্চনবালা ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে বার্নার্ড (Bernard) নামে এক স্বধর্মীয় স্বদেশীয়ের কথা মনে পড়ছে। এখানে বার্নার্ড সংক্রান্ত একটি ছোট্ট কাহিনীর উল্লেখ না করে পারছি না। প্লুটার্ক ঠিকই বলেছিলেন– নগণ্য ঘটনা বা বিষয় কখনো উপেক্ষা বা গোপন করা উচিত নয়। কারণ বাইরে থেকে যা নগণ্য মনে হয়, ঐতিহাসিকের কাছে তার অসামান্য মূল থাকতে পারে। নগণ্য ব্যাপারের মধ্যে অনেক সময় লোকচরিত্র ও লোক-প্রতিভার বিশেষত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, অসামান্য ঘটনার মধ্যে সাধারণত তা পাওয়া যায় না। এদিক থেকে বিচার করলে বার্নার্ড কাহিনী যদিও হাস্যকর, তাহলেও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হতে পারে।

বার্নার্ড সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষদিকে তাঁর দরবারে থাকতেন । ভালো চিকিৎসক ও সার্জন বলে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। তিনি মোগল সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং প্রায়ই সম্রাটের সঙ্গে এক টেবিলে খানাপিনায় যোগদান করতেন।[৩৩] অনেক সময় তাঁরা দুজনেই খুব বেশি পরিমাণে সুরাপান করতেন। দুজনের রুচিও প্রায় একই রকমের ছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীর সর্বক্ষণ তাঁর নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা করতেন এবং রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বা দায়িত্ব যা কিছু তা সম্রাজ্ঞী

---

৩৩. কাট্রো (Catrou) জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে বলেছেন : 'আগ্রার ফিরিঙ্গীদের সম্রাটের কাছে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত আছে, কারো ওপর কোনো বিধিনিষেধ নেই। সম্রাট ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে মিশে মদ্যপান করেন। প্রধানত ইসলামী পরবের দিনেই তাঁর এই রাত্রিব্যাপী মদ্যপান ও ফুর্তি চলতে থাকে।'–অনুবাদক।

নূরজাহানের ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতেন। নূরজাহান বিদূষী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি রাজকার্য এমন নিখুঁতভাবে পরিচালনা করতেন যে, কোনোদিন কারো হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হতো না। নূরজাহানের স্বামী সম্রাট জাহাঙ্গীরও নূরজাহানের ওপর রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব চাপিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন।

বার্নার্ডের দৈনিক বেতন ছিল দশ ক্রাউন। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উপরি অর্থ তিনি রোজগার করতেন নিয়মিত হারেমের মহিলাদের ও ওমরাহদের চিকিৎসা করে। কঠিন অসুখ-বিসুখ সারিয়ে অনেক উপঢৌকনও তিনি পেতেন। হারেমের মহিলা ও আমির ওমরাহরা প্রতিযোগিতা করে ভালো ভালো উপহার দিয়ে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করতেন। সুতরাং চিকিৎসক বার্নার্ড সাহেবের অর্থের অভাব ছিল না। উপহার পাবার আরোও একটা কারণ হলো, সকলেই জানতেন যে তিনি সম্রাটের খুব প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাই সকলে তাঁকেও ভেট দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু টাকাপয়সার প্রতি বার্নার্ড সাহেবের বিশেষ লোভ ছিল না। তিনি যা পেতেন তার অনেকটাই আবার উপহার হিসেবে অন্যদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। সে জন্য সবাই তাঁকে আরোও ভালোবাসতো। বিশেষ করে নর্তকী কাঞ্চনবালাদের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। কারণ তাঁর অর্থের বেশি ভাগ তিনি তাদের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর গৃহে কাঞ্চনবালারা নিয়মিত আসতো এবং নৃত্যগীত করে তাঁকে খুশি করতো।

এভাবে বার্নার্ডের দিন কেটে যাচ্ছিলো। কিন্তু এর মধ্যে একটি কাণ্ড ঘটে গেলো– বার্নার্ড একটি কাঞ্চনবালার প্রেমের পড়ে গেলেন। দুর্বার প্রেম বলতে যা বোঝায়, তাই। কাঞ্চনের নৃত্যভঙ্গিমায় বার্নার্ড বিমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বলাবাহুল্য, বার্নার্ড সেই কাঞ্চনের পাণিপ্রার্থী হলেন। কিন্তু কাঞ্চনবালারা সাধারণত কুমারীই থাকে, তাদের বাপ-মায়েরা তাদের বিয়ে দিতে চান না। কারণ বিয়ে দিলে তাদের রূপযৌবন বেশিদিন স্থায়ী হবে না। অর্থোপার্জনে বিঘ্ন ঘটবে, এই তাদের ধারণা। সুতরাং বার্নার্ড-প্রেয়সীর জননী যখন বুঝতে পারলেন যে বার্নার্ড সাহেব তার কন্যার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন, তখন থেকে তিনি কন্যাটির ওপর খুব সর্তক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন, যাতে কোনোরকম অঘটন না ঘটে।

বার্নার্ডের কাকুতি-মিনতি দিনের পর দিন। প্রত্যাখান করে কাঞ্চনবাল ঘরে ফিরে যায়। বার্নার্ডের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে এবং ক্রমেই তিনি হতাশ হয়ে ভেঙে পড়েন। এমন সময় একদিন হঠাৎ আমখাসে সকলের সামনে সম্রাট জাহাঙ্গীর ঘোষণা করলেন যে, বার্নার্ডের সুচিকিৎসার জন্য তিনি তাঁকে পুরস্কৃত করবেন। হারেমে কোনো মহিলার দুরারোগ্য ব্যাধির সার্থক চিকিৎসা করেছিলেন বলে সম্রাট তাঁকে পুরস্কার দিতে চেয়েছেন।

আমখাসে সকলের সামনে এই ঘোষণা শোনার পর বানার্ড উঠে বলেন : 'মহামান্য সম্রাট! মার্জনা করবেন। আমি আপনার মূল্যবান উপহার গ্রহণ

করতে অক্ষম। তবে আমার বিনীত নিবেদন, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে কোনো উপহার দিতেই ইচ্ছুক হোন, তাহলে কাঞ্চনবালাদের মধ্যে ওই যে আপনাকে সালাম করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, ওকে উপহার দিন।'

সভায় সমস্ত লোকজন বার্নার্ড সাহেবের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। সম্রাটের উপহার প্রত্যাখান করার ধৃষ্টতা এবং খ্রিস্টান হয়ে মুসলমান কন্যাকে উপহার চাওয়ার স্পর্ধা তাদের কাছে হাস্যকরই মনে হবার কথা। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের কোনোদিনই ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। বার্নার্ডের প্রস্তাব শুনে তিনি নিজেও হাসলেন এবং হেসে কাঞ্চনকন্যাকে তৎক্ষণাৎ ডাক্তার সাহেবকে দান করে দিতে হুকুম দিলেন। সম্রাট বললেন : মেয়েটিকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে ডাক্তারের কাঁধে বসিয়ে দাও এবং তাকে কাঁধে বসিয়ে ডাক্তারকে চলে যেতে বলো।'

যেমন বলা তেমনি কাজ। বলামাত্রই সভাসুদ্ধ লোকজন মেয়েটিকে চ্যাংদোলা করে তুলে এনে বার্নার্ডের কাঁধে বসিয়ে দিলো এবং বার্নার্ড সাহেবও কোনোদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বিজয়ী বীরের মতো কাঞ্চনবালাকে নিয়ে হলঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

হাতির লড়াই

উৎসবের শেষে একরকমের ক্রীড়া হয় যা ভারত ছাড়া ইউরোপের কোথাও দেখা যায় না। ক্রীড়াটি হলো– হাতির লড়াই। নদীর তীরে বালুভূমির ওপর সকলের সামনে এই হাতির লড়াই হয়। সম্রাট নিজে, হারেমের বেগমরা, আমির-ওমরাহ প্রত্যেকে যে যার স্বতন্ত্র গবাক্ষ থেকে এই হাতির লড়াই দেখেন ও রীতিমতো উপভোগ করেন।

তিন-চার ফুট চওড়া এবং পাঁচ-ছয় ফুট উঁচু একটি মাটির দেয়াল তৈরি করা হয়। দুটি বৃহদাকার হাতি দেয়ালের দুদিক থেকে মন্থরগতিতে এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়। প্রত্যেক হাতির পিঠে দুজন করে মাহুত থাকে। প্রথম মাহুতটি, যে কাঁধের ওপর বসে লোহার ডাঙ্কুস নিয়ে হাতি চালায়, সে যদি কোনোরকমে বেকায়দায় পড়ে যায় তাহলে যাতে পিছনের দ্বিতীয় মাহুতটি তৎক্ষণাৎ এসে তার স্থানটি দখল করে কাজ চালিয়ে নিতে পারে, সে জন্য এই জোড়া মাহুতের ব্যবস্থা।

মাহুতরা হয় আদর করে মিষ্টি কথা বলে, নয়তো নানারকম সাঙ্কেতিক ভাষায় গালাগালি দিয়ে, কাপুরুষ ইত্যাদি বলে হাতিদের সম্মুখসমরে প্ররোচিত করে। পা-দানিতে পা চেপেও তারা হাতিকে উৎসাহিত করে। অবশেষে ঐ মাটির দেয়ালের দুদিকে দুটি হাতি এসে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

প্রথম আঘাতটি মারাত্মক। দেখলে অবাক হতে হয় ভেবে যে, কি করে তারা পরস্পরের গজদন্ত, মাথা ও শুঁড়ের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করে বেঁচে থাকে। লড়াই একটানা চলে না, মধ্যে মধ্যে উভয়-পক্ষই বিশ্রাম নেয়, আবার প্রচণ্ড ভাবে পুনরাক্রমণ হয়। ক্রমে মাটির দেয়ালটি মাটিতে মিশে যায় এবং বেশি দুর্ধর্ষ হাতিটি অন্য হাতিটিকে তাড়া করে নিয়ে গিয়ে মাটির সঙ্গে শুঁড় বা দাঁত দিয়ে চেপে ধরে। এমন ভয়ঙ্করভাবে চেপে ধরে যে, কোনোভাবে আর দুজনকে ছাড়াবার উপায় থাকে না। তখন নিরুপায় হয়ে চর্‌কি জ্বালিয়ে বাজি ফুটিয়ে তাদের ভয় দেখাবার চেষ্টা করা হয়। কারণ এই একটি মাত্র অস্ত্র যা হাতিরা যমের মতো ভয় করে। আগুন তারা সহ্য করতে পারে না, এবং পটকা বা বোমার আওয়াজ শুনলে ভয়ানক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। এ জন্য আগ্নেয়াস্ত্র যুগে যুদ্ধক্ষেত্রে হাতির ব্যবহার একেবারে অচল হয়ে গেছে। যুদ্ধে আর হাতির তেমন কদর নেই।

মোগল আমলে অনুষ্ঠিত দুর্ধর্ষ হাতির লড়াইয়ের দৃশ্য

সিংহলের হাতি সবচেয়ে দুর্ধর্ষ ও সাহসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের ট্রেনিং না দিয়ে আগে কখনো যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় না। বছরের পর বছর কানের কাছে বন্দুকের আওয়াজ করে এবং পায়ের কাছে পটকা বোমার শব্দ করে তাদের অভ্যস্ত করে তোলা হয়, ট্রেনিং দেয়া হয়। তারপর তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে নামানো হয়, তার আগে নয়।

এই হাতির লড়াই দেখতে হলে অনেক সময় খুব নিষ্ঠুরের মতো দেখতে হয়। কারণ মাহুতদের কেউ কেউ মাঝেমধ্যে হাতির পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে পদতলে পৃষ্ট হয়ে মারা যায়। হাতির লড়াইয়ে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। দুই পক্ষের হাতিই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হাতির পিঠ থেকে মাহুতকে ফেলে দেয়ার চেষ্টা করে এবং তার জন্য অনেক সময় শুঁড় দিয়ে মাহুতকে জড়িয়ে ধরতে যায়। এ ভয় সব সময় থাকে। তাই হাতির লড়াইয়ের দিনে যে মাহুতদের ওপর

হাতিতে চড়ার পালা পড়ে, তারা তাদের স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে শেষবিদায় নিয়ে আসে। যেনো মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামী, ফাঁসির মঞ্চারোহণ করতে যাচ্ছে বলে মনে হয়। তাদের একমাত্র সান্ত্বনা হলো এই যে, যদি তারা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরতে পারে এবং হাতির লড়াই দেখে সম্রাট খুশি হন, তাহলে তাদের মাসিক বেতন বৃদ্ধি পাবে এবং তারা এক থলে পয়সা (পঞ্চাশ ফ্রাঙ্ক সমপরিমাণ) পুরস্কার পাবে। হাতির পিঠ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে ঐ পয়সার থলেটি তাদের পুরস্কার দেয়া হয়।[৩৪]

মাহুতদের আরোও একটা মস্তবড় সান্ত্বনা এই, যদি তাদের মৃত্যু হয় তাহলে বিধবা পত্নীরা তাদের বেতন ভাতা হিসেবে পাবে এবং তাদের যোগ্য পুত্র থাকলে সে চাকরিতে বহাল হবে।

কিন্তু হাতির লড়াইয়ের মর্মান্তিক ঘটনার শেষ হয়নি এখনও। আরো কিছুটা বাকি আছে, বলা হয়নি। প্রায়ই দেখা যায় হাতির লড়াইয়ের সময় মাহুতরাই যে মরে তা নয়, দর্শকদের মধ্যেও কেউ কেউ বেকসুর প্রাণটা হারায়। উন্মত্ত হাতিরা মাঝেমধ্যে দর্শকদের ভিড়ের মধ্যে ছুটে চলে এসে আতঙ্কের সঞ্চায় করে। তখন ঘোড়া, মানুষ, যে যেখানে থাকে ভয়ে প্রাণপণে ছুটতে থাকে এবং কেউ হাতির পায়ের তলায় পড়ে, কেউ বা ভিড়ের চাপে পড়ে মারা যায়। এতো প্রচণ্ডভাবে ঠেলাঠেলি ছোটোছুটি আরম্ভ হয় যে, কারো কোনো দিক্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। দ্বিতীয়বার আমি যখন এই হাতির লড়াই দেখেছিলাম তখন আমিও কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম শুধু আমার দুরন্ত ঘোড়া এবং অনুচর ভৃত্যটির প্রাণপণ চেষ্টার ফলে।

দিল্লীর মসজিদ ও সরাই

এবার দুর্গ ত্যাগ করে আবার শহরে ফিরে যাই। কারণ দিল্লী শহরে দুটি নয়নাভিরাম স্থাপত্যের নিদর্শনের কথা বলতে ভুলে গেছি।* তার মধ্যে একটি হলো জুম্মা

---

৩৪. প্রতিটি হাতির লড়াইয়ের জন্য একজন করে নির্বাচিত প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে। সম্রাটের হুকুম পেলেই তাদের লড়াইয়ের জন্য বাইরে আনা হয়। লড়াইয়ের সময় কৃতী মাহুতদের পুরস্কার দেয়ার জন্য থলে ভর্তি পয়সা থাকে। প্রায় এক হাজার 'দাম' বা পয়সার এক-একটি থলে ('দাম' ও পয়সা ঠিক এক নয়) আনুমানিক পঁচিশ টাকার বেশি পুরস্কারের মূল্য নয়।–অনুবাদক।

* 'দিল্লী' ও 'আগ্রা' সম্বন্ধে চিঠির বাকি অংশটুকুতে বার্নিয়ার জুম্মা মসজিদ, বেগমসরাই ও তাজমহলের বর্ণনা দিয়েছেন। মোগল যুগে ভারতে খ্রিস্ট ধর্মের বিস্তারের কাহিনীটুকু ছাড়া, এই অংশে সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ তেমন নেই। এ কারণে এই অধ্যায় থেকে কিছু নির্বাচিত অংশ মর্মানুবাদ করা হয়েছে। তবে খ্রিস্টান পাদ্‌রীদের কার্যকলাপ প্রসঙ্গে বার্নিয়ারের বক্তব্য যথাযথ অনুবাদ করা হয়েছে।–অনুবাদক।

মসজিদ।[৩৫] শহরের মধ্যে একটি উঁচু টিলার ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে মসজিদটিকে দূর থেকে অপূর্ব দেখায়। টিলার ওপরটা আগে সমতল করে নেয়া হয়েছিলো এবং তার আশেপাশের অনেকটা জায়গা পরিষ্কার করে স্কোয়ারের মতো করা হয়েছিলো। এখানে চারটি বড় রাস্তা এসে চারদিক থেকে মসজিদের ঠিক চারদিকে মিলিত হয়েছে। মসজিদের প্রধান ফটকের ঠিক সামনে একটি, পেছন দিকে একটি, দু পাশে দুটি আর ফটকের সামনে আর দুটি রাস্তা। তিন দিকের তিনটি ফটকে উঠতে হলে পঁচিশ থেকে ত্রিশটি করে সিঁড়ি পার হতে হয়। পেছন দিকটি একেবারে টিলার সঙ্গে লাগানো, যেনো একসঙ্গে গেঁথে তোলা। তিনটি ফটকই শ্বেতপাথরের তৈরি, দেখতে অতি সুন্দর এবং তার দরজাগুলোতে তামার পাত বসানো। প্রধান ফটকটি অন্যান্য ফটকের তুলনায় দেখতে অনেক বেশি জমকালো এবং তার ওপর ছোট ছোট কয়েকটি সাদা মিনার আছে। দেখতে অপূর্ব সুন্দর।

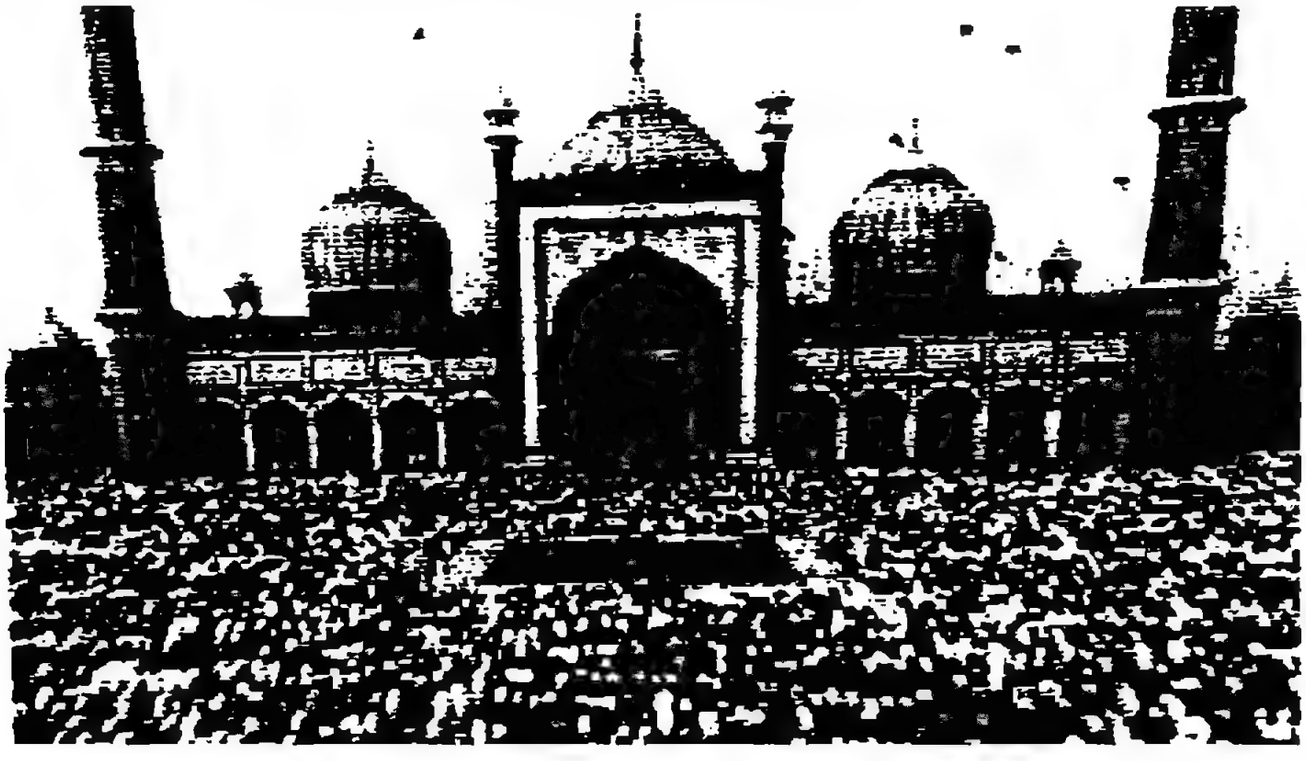

দিল্লীর জুম্মা মসজিদে ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা নামাজ আদায় করছেন

মসজিদের পেছনে বড় বড় তিনটি গম্বুজ আছে, তার মাঝখানের গম্বুজটি সবচেয়ে বড় ও উঁচু। গম্বুজগুলোও শ্বেতপাথরের তৈরি। প্রধান ফটক ও তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী স্থানটি উন্মুক্ত। প্রচণ্ড গরম আবহাওয়ার জন্য এই উন্মুক্ততার প্রয়োজন রয়েছে। বড় বড় শ্বেতপাথরের চাঁই বসানো মাঝখানে। আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, মসজিদটি স্থাপত্যবিদ্যার সূত্র অনুযায়ী নিখুঁতভাবে নির্মাণ করা হয়নি। সেদিক দিয়ে

---

৩৫. ১৬৫০ সালে সম্রাট শাহজাহান জুম্মা মসজিদের নির্মাণকাজ শুরু করেন এবং ছয় বছরে কাজ শেষ হয়। এ মসজিদ সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ববিদ ফার্গুসন বলেছেন—it is one of the mosques either in india or elsewhere, that is designed to produce a pleasing effect extenally: (History of Indian and Eastern Architecture, 2nd Ed. Vol.II.p.318)—অনুবাদক।

বিচার করলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি যে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবু মসজিদের গড়নের মধ্যে কোথাও রুচিসম্মত নয়, এমন কোনো ত্রুটি নেই। প্রত্যেকটি অংশ তার নিখুঁতভাবে তৈরি। সমতা ও সামঞ্জস্যবোধ তার মধ্যে সুপরিস্ফুট। আমি অন্তত মনে করি যে, এই মসজিদের মতো যদি প্যারিসে কোনো গির্জা থাকতো, তাহলে স্থাপত্যের নিদর্শনরূপে তা সকলের কাছে প্রশংসা অর্জন করতো। গম্বুজ আর মিনারগুলো শুধু শ্বেতপাথরের তৈরি। এ ছাড়া বাকি অংশ লাল বেলেপাথরের।

প্রতি শুক্রবার নামাজ আদায় করার জন্য সম্রাট মসজিদে যান। আমাদের যেমন রবিবার, মুসলমানদের তেমনি শুক্রবার। যে রাস্তা দিয়ে মসজিদে যান, সেই রাস্তায় ধুলো ও উত্তাপ কমানোর জন্য আগে থেকে পানি ছিটানো হয়। দুর্গের ফটকের কাছ থেকে মসজিদের ফটক পর্যন্ত রাস্তার দুদিকে সারবন্দী হয়ে বন্দুকধারী সৈন্যরা দাঁড়িয়ে থাকে। পাঁচ-ছয়জন ঘোড়সওয়ার সামনে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে যায় এবং তারা অনেকটা সামনে এগিয়ে থাকে, পাছে তাদের চলার পথের ধুলো সম্রাটের বিরক্তির কারণ হয়, তাই। এভাবে সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হয়ে গেলে সম্রাট মসজিদের পথে যাত্রা করেন। হয় সুজজ্জিত হাতির পিঠে চড়ে যান, আর তা না হলে আটজন বাহকের কাঁধে সিংহাসনে চড়ে যান। নানা রকমের রং-বেরঙের কাপড়, বনাত ইত্যাদি দিয়ে হাতির হাওদা ও সিংহাসন সাজানো থাকে। সম্রাটের অনুগমন করেন একদল ওমরাহ, কেউ ঘোড়ায় চড়ে কেউ বা পাল্‌কিতে চড়ে। ওমরাহদের সঙ্গে অনেক মনসবদারকেও দেখা যায়। অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির সময় যেরকম জমকালো শোভাযাত্রা হয়, মসজিদে প্রার্থনা করতে যাবার সময় ঠিক সেরকম কিছু না হলেও, যা হয় তাও কম রাজকীয় নয়।

জুম্মা মসজিদের পর উল্লেখযোগ্য হলো দিল্লীর বেগমসরাই। সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠা কন্যা শাহজাদী জাহান আরা এই সরাইটি তৈরি করেছিলেন বলে এর নাম বেগমসরাই। শুধু শাহজাদী জাহান আরা নন, ওমরাহরাও এভাবে স্থাপনা নির্মাণ করে শহরের শ্রীবৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন।

বেগমসরাই অনেকটা খোলা স্কোয়ারের মতো, চারদিকে তোরণপথ। তোরণগুলো রাজপ্রাসাদের তোরণের মতো, শুধু পৃথকভাবে পার্টিশন দেয়া। ভেতরে ছোট ছোট অনেক কামরা আছে। ধনী ইরানী, উজবেক ও অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বিশ্রামের জন্য এই সরাই। কামরা খুলে তারা সরাইয়ে স্বচ্ছন্দে নিরাপদে থাকতে পারেন, কারণ রাতে প্রধান ফটকটি বন্ধ করে দিলে ভেতরে প্রবেশ করা যায় না।

চমৎকার ব্যবস্থা রয়েছে অতিথিদের জন্য। প্যারিসে যদি এই ধরনের কয়েকটা সরাই থাকতো, তাহলে মদ্যশালার যাত্রীদের বিশেষ অসুবিধা হতো

না। তারা প্যারিসে এসে প্রথম কয়েক দিন এই সরাইয়ে থেকে ধীরেসুস্থে অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করতে পারতেন।

দিল্লীর মানুষজন

দিল্লীর বিবরণ শেষ করার আগে আমি আরও দু-একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। আমি জানি, এই প্রশ্ন হয়তো আপনার মনে জাগবে। দিল্লীর লোকসংখ্যা কতো এবং তার মধ্য ভদ্রশ্রেণির সংখ্যাই বা কতো? ফ্রান্সের রাজধানীর সঙ্গে তার তুলনা হয় কি না– ইত্যাদি ইত্যাদি।

প্যারিসের কথা যখন ভাবি তখন মনে হয় তিন-চারটি শহরের সমাবেশ হয়েছে একসঙ্গে। তার আগাগোড়া অট্টালিকা ও মানুষজনে পরিপূর্ণ। গাড়ি-ঘোড়ার অন্ত নেই। কিন্তু সেই অনুপাতে খোলা জায়গা, স্কোয়ার, বাগান-বাগিচা ইত্যাদি নেই। দেখলে মনে হয় প্যারিস পৃথিবীর নার্সারী এবং দিল্লীর জনসংখ্যা প্যারিসের সমান। আবার দিল্লী শহরটির বিশাল আয়তন এবং অসংখ্য দোকানপাটের কথা ভাবলে অন্য রকম মনে হয়। তার সঙ্গে দিল্লীর জনসংখ্যার কথা ভাবলেও অবাক না হয়ে পারা যায় না। আমির-ওমরাহ ছাড়াও দিল্লী শহরে প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার সৈন্য ও বহু দাসদাসী থাকে, তাদের প্রভুরা থাকে। প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কোঠায় বাস করে, স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে। এমন কোনো গৃহ নেই যা স্ত্রী-পুত্র ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ নয়।

বাইরের গ্রীষ্মের উত্তাপ যখন একটু কমে যায়, যখন মানুষজন রাস্তায় চলাফেরা করার জন্য বেরিয়ে আসে তখনও দিল্লীর পথের দৃশ্য দেখে মনে হয় না যে দিল্লীর জনসংখ্যা কম। গাড়ি-ঘোড়ার ভিড় রাস্তায় বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও মানুষেরর ভিড়ে প্রায় পথ চলা যায় না। সুতরাং জনসংখ্যার দিক থেকে দিল্লী ও প্যারিসের তুলনামূলক আলোচনা করার আগে এসব কথা বিবেচনায় রাখা উচিত। বিবেচনা করলে মনে হয় যে প্যারিসের সমান জনসংখ্যা না হলেও, দিল্লীর জনসংখ্যা প্যারিসের চেয়ে খুব কম হবে না।

অবস্থাপন্ন ও ভদ্র শ্রেণির লোকের কথা ধরলে অবশ্য অন্যরকম মত প্রকাশ করতে হয়। প্যারিসে এই শ্রেণির জনসংখ্যা দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশি। প্যারিসের প্রতি দশজন লোকের মধ্যে অন্তত সাত-আটজন ভদ্রবেশী, পোশাক-পরিচ্ছদ দেখলে মনে হয় মোটামুটি অবস্থাপন্ন কিন্তু দিল্লী শহরে ঠিক বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। প্রতি দশজনের মধ্যে সাত-আটজন দরিদ্র ও জীর্ণবেশী, আর দু-একজন মাত্র ভদ্রবেশী। এসব দরিদ্র মানুষ শহরে আসে সৈন্যবাহিনীতে চাকরি নেয়ার লোভে। অবশ্য আমি যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি এবং সাধারণত যাদের সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হয় তারা অধিকাংশই অবস্থাপন্ন। তারা খুব মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ ব্যবহার করেন এবং সবসময় খুব ফিট্‌ফাট থাকেন।

আমির-ওমরাহ, রাজ-রাজড়া ও মনসবদাররা যখন আমখাসে বা অন্য কোনো সময় রাজদরবারে যাওয়ার জন্য দুর্গের সামনে সমবেত হন, তখন সত্যিই উপভোগ করার মতো দৃশ্য হয়। মনসবদাররা চারদিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে দৌড়ে আসেন, চারজন করে ভৃত্য সঙ্গে নিয়ে এবং প্রভুদের জন্য পথ পরিষ্কার করতে থাকেন। তারপর ওমরাহ ও রাজারা কেউ ঘোড়ার পিঠে, কেউ বা হাতির পিঠে চড়ে দরবার অভিমুখে যাত্রা করেন। অধিকাংশই অবশ্য ছয় বেহারার সুসজ্জিত পালকিতে চড়ে মখমলের গদিতে হেলান দিয়ে পান চিবুতে চিবুতে যান। পান খাওয়ার উদ্দেশ্য হলো মুখে সুগন্ধ ছড়ানো এবং ঠোঁট দুটো টুকটুকে লাল দেখানো। আমিরী ভঙ্গিতে পাল্‌কিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে ওমরাহ ও রাজারা সুগন্ধি পান চিবুতে থাকেন এবং পাল্‌কির সঙ্গে একজন ভৃত্য পিকদান নিয়ে দৌড়াতে থাকে। পোর্সেলিন বা রুপোর পিকদান। ওমরাহ ও রাজারা পিকদানে পিক ফেলতে ফেলতে যান। পাল্‌কির একদিকে এভাবে পিকদান হাতে ভৃত্য দৌড়াতে থাকে আর একদিকে আরও দুজন ভৃত্য ময়ূরপুচ্ছের পাখা নিয়ে মাছি তাড়াতে তাড়াতে ও ধুলা ঝাড়তে ঝাড়তে যায়। তিন-চারজন চাকর পাল্‌কির সামনে পথের লোকজন ও জন্তু-জানোয়ার হটাতে হটাতে দৌড়াতে থাকে এবং কয়েকজন বাছাই করা দুরন্ত ঘোড়সওয়ার পাল্‌কির পিছনে ছুটতে থাকে।

দিল্লীর পাশের অঞ্চলগুলো খুব উর্বর বলে মনে হয়। নানা রকমের ফসল উৎপন্ন হয় এইসব অঞ্চলে। চিনি, নীল, চাল, তিন-চার রকমের ডাল প্রচুর পরিমাণে হয়। দিল্লী শহর থেকে কয়েক মাইল দূরে একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ আছে, কুতুবউদ্দীনের নামের সঙ্গে জড়িত। আর একদিকে কয়েক মাইল দূরে সম্রাটের বাগানবাড়ি, নাম 'শালিমার'।[৩৬] দিল্লী ও আগ্রার মধ্যে আর বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোনো ভালো শহর নেই। সমস্ত পথটা একঘেয়ে ও বিরক্তিকর, দেখার মতো কোথাও কিছু নেই। শুধু মথুরা শহরটি উল্লেখযোগ্য, কারণ এই প্রাচীন শহরটিতে অনেক সুন্দর সুন্দর দেবালয়, পান্থশালা ইত্যাদি রয়েছে। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

রাস্তার দুপাশে বড় বড় গাছ সারবন্দী করে বসানো, পথচারীদের ছায়াদানের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে এইসব গাছ রোপন করা হয়েছিলো। এক ক্রোশ অন্তর একটি করে উঁচু মিনার, পথের নির্দেশক বা নিশানারূপে নির্মিত। এগুলোকে 'ক্রোশ-মিনার' বলা হতো।[৩৭] পথের মধ্যে

---

৩৬. 'শালিমার' উদ্যান সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বের চতুর্থ বছর, ১৬৩২ সালে নির্মিত হয়। কাট্টো বলেন, উদ্যানের পরিকল্পনাটি নাকি একজন ভেনিসবাসী তৈরি করেছিলেন।

৩৭. প্রায় ১৬৮টি এইরকম ক্রোশ-মিনারের সন্ধান পাওয়া গেছে, তার মধ্যে ১০৫টি হলো রাজপুতানায়। দিল্লীর কাছাকাছি ক্রোশ-মিনার কয়েকটি মেপে দেখা গেছে যে তাদের দূরত্ব প্রায় ২ মাইল ৪ ফার্লং ১৫৮ গজের মতো।—অনুবাদক।

মধ্যে পথিকের পিপাসা নিবারণের জন্য এবং গাছপালায় জলসেচনের জন্য কুয়ো আছে।

আগ্রার কথা

দিল্লী শহরের যে বর্ণনা দিয়েছি তা থেকে যমুনার তীরে গড়ে তোলা আগ্রা শহরের অবস্থান, রাজপ্রসাদ ও বিভিন্ন দুর্গ এবং বড় বড় অট্টালিকা সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা করতে পারবেন। কিন্তু আগ্রা শহর দিল্লীর চাইতেও প্রাচীন– এটি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে তৈরি। সেই জন্য আগ্রার প্রাচীন নাম ছিল আকবরাবাদ। দিল্লীর চাইতে অনেক বড় শহর, আমির ওমরাহ রাজ-রাজড়াদের বাড়িঘরও অনেক বেশি। পাকা বাড়ি, ইটপাথরের বাড়ির সংখ্যা দিল্লীর চাইতেও আগ্রায় বেশি, ক্যারাভান সরাইয়ের সংখ্যাও বেশি।

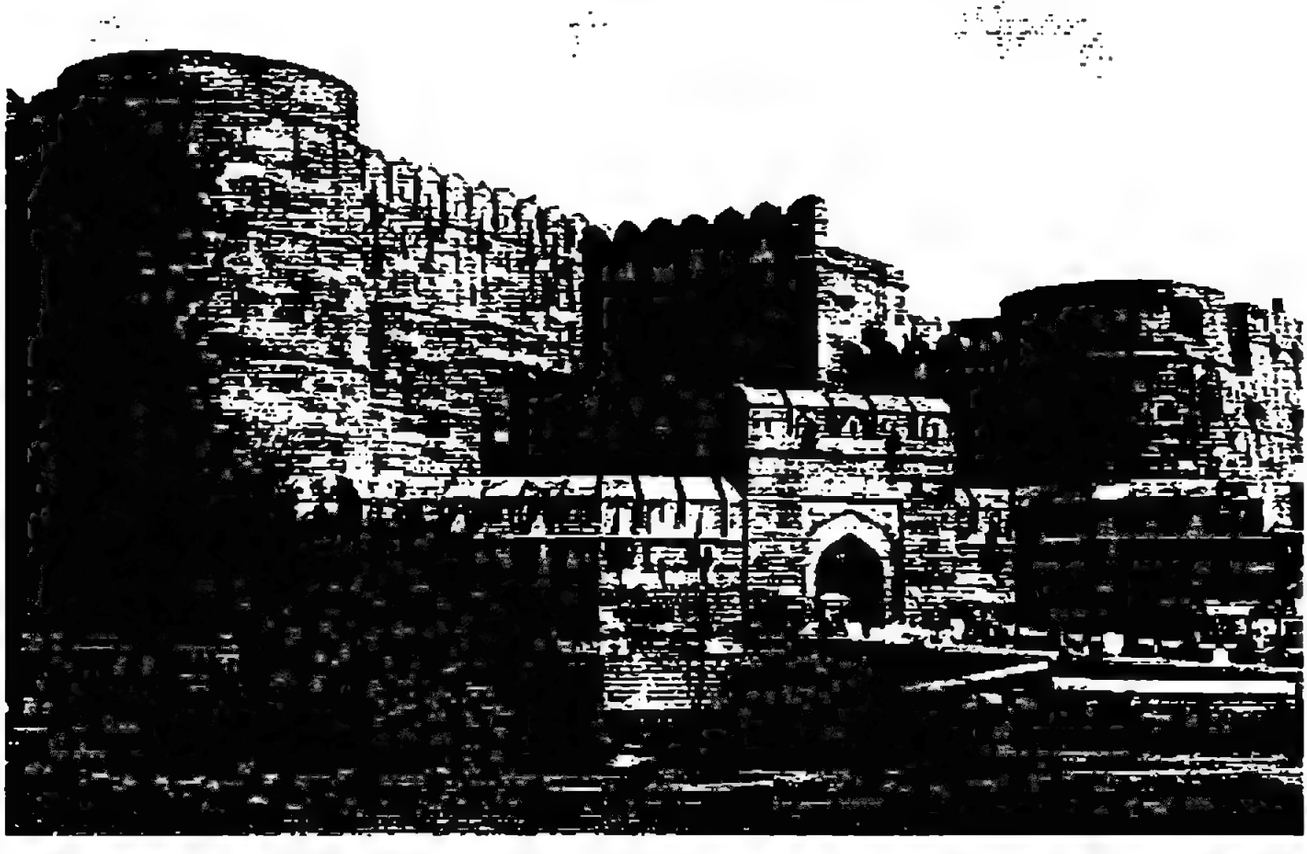

সম্রাট আকবরের তত্ত্বাবধানে ১৫৬৫ সালে শুরু হয়ে ১৫৭৩ সালে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়া আগ্রা দুর্গ। দুর্গটি যমুনা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত।

দুটি বিখ্যাত কীর্তিস্তম্ভের জন্য আগ্রার এতো খ্যাতি। আগ্রার রাস্তাঘাট অবশ্য দিল্লীর মতো সুপরিকল্পিত নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র চার-পাঁচটি রাস্তা মোটামুটি সুন্দর, বাড়িঘরও মন্দ নয়, তা ছাড়া বাকি রাস্তা এতো সঙ্কীর্ণ, ঘিঞ্জি ও আঁকাবাঁকা যে, বর্ণনা করা সহজ নয়। দিল্লীর তুলনায় এদিক দিয়ে আগ্রাকে অনেকটা মফঃস্বল শহরের মতো মনে হয়।

আমির-ওমরাহ, রাজ-রাজড়াদের ঘরবাড়ি অনেকটা বাগানবাড়ির মতো উদ্যান পরিবেষ্টিত। তার মধ্যে ধনী হিন্দু সওদাগর ও ব্যবসায়ীদের বাড়িগুলো ঠিক প্রাচীন দুর্গের মতো দেখায়। প্রাকৃতিক পরিবেশের দিক থেকে বিচার

করলে আগ্রা শহর দিল্লীর তুলনায় অনেক বেশি মনোরম। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সবুজের সমারোহ যে কতো মনোমুগ্ধকর, তা বর্ণনা করা যায় না। ফ্রান্সে বা প্যারিসে যে এরকম প্রাকৃতিক পরিবেশর অভাব আছে তা নয়।

আগ্রার পাদ্‌রী

আগ্রা শহরে জেসুইটদের একটি গির্জা আছে। একটি প্রতিষ্ঠানও আছে পৃথক বাড়িতে, তাকে 'কলেজ' বলা হয়। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি খ্রিস্টান পরিবারের অল্পবয়স্ক মেয়েমেয়েদের এখানে খ্রিস্টধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেয়া হয়। কোথা থেকে কিভাবে এই খ্রিস্টান পরিবারগুলো এখানে এসে জুটেছে, তা জানি না। এটুকু জানি, জেসুইটদের আর্থিক দানের লোভেই তারা এখানে এসেছে এবং তার ওপর নির্ভর করেই তারা বসবাস করছে।

এই পাদ্‌রী সাহেবরা সম্রাট আকবরের আমলে আমন্ত্রিত হয়ে এখানে এসেছিলেন। ভারতবর্ষে পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি ছিল যখন খুব বেশি, তখন সম্রাট আকবর এই ধর্মযাজকদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এনেছিলেন। সম্রাট আকবর এই পাদ্‌রীদের একটা বাৎসরিক আয়েরই যে শুধু ব্যবস্থা করেছিলেন তা নয়, আগ্রা ও লাহোরে তাদের গির্জা নির্মাণ করার অনুমতি পর্যন্ত দিয়েছিলেন।

জেসুইট পাদ্‌রীরা অবশ্য আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে আরোও বেশি সহযোগিতা ও সমর্থন পান। কিন্তু সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র সাজাহানের কাছ থেকে তারা পান প্রচণ্ড বিরোধিতা ও শত্রুতা। সম্রাট শাহজাহান পাদ্‌রী-সাহেবদের ভাতা বন্ধ করে দেন এবং নানাদিক থেকে অত্যাচার করে তাদের নির্মূল করার চেষ্টা করেন। তিনি লাহোর ও আগ্রার গির্জাগুলো ধ্বংস করে ফেলেন। আগ্রার একটি বিখ্যাত গির্জার চুড়ো পর্যন্ত তিনি ধূলিসাৎ করে দেন। একসময় এই গির্জার ঘড়ির শব্দ সারা আগ্রা শহরে শোনা যেতো।

জাহাঙ্গীরের খ্রিস্টান প্রীতি

সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পাদ্‌রী সাহেবরা একরকম নিশ্চিন্ত ছিলেন এই ভেবে যে, মোগল সাম্রাজ্যে খ্রিস্ট ধর্মের অগ্রগতি কেউ রোধ করতে পারবে না। অবশ্য এ কথা ঠিক, জাহাঙ্গীরের মোটেই ধর্ম গোঁড়ামি ছিল না এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও তিনি বিশেষ কুরআনের ধার ধারতেন না। খ্রিস্টধর্মের প্রতি তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তিনি তাঁর দুজন ভ্রাতুষ্পুত্রকে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষা নিতে অনুমতি দিয়েছিলেন, এমনকি মির্জাকেও সম্মতি দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। কারণ তাঁর মতে, মির্জা খ্রিস্টান মাতার সন্তান। মির্জার মা ছিলেন আর্মেনিয়ান এবং তাকে হারেমে আনা হয়েছিল সম্রাটের ইচ্ছানুযায়ী।

জেসুইটরা বলেন, সম্রাট জাহাঙ্গীরের খ্রিস্টানপ্রীতি এতো অধিক ছিল যে, তিনি দরবারের সমস্ত পোশাক-পরিচ্ছদ ইউরোপীয়দের ধরনে পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তার জন্য তিনি অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসরও হয়েছিলেন এবং পোশাকও তৈরি করিয়ে ফেলেছিলেন।

সম্রাজ্ঞানী নূরজাহান যাঁর রূপ ও গুণের প্রশংসা ছিল বিশ্ব জুড়ে

একদিন ইউরোপীয় পোশাকে সেজেগুজে সম্রাট নিজে তাঁর একজন প্রিয় ওমারহকে ডেকে পাঠান এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে নতুন পোশাকে তাঁকে কেমন মানিয়েছে। ওমরাহ এ প্রশ্নের এমন জবাব দেন যে, সম্রাট সেদিন থেকে ইউরোপীয় পোশাক পরে দরবারে যাবার সমস্ত পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। সমস্ত ব্যাপারটার জন্য এতো লজ্জা পান যে, শেষপর্যন্ত ওমরাহদের কাছে বলতে

বাধ্য হন, মন থেকে নয়, তিনি এমনি কৌতুক করার জন্য কথাটা বলেছিলেন মাত্র।[৩৮]

জেসুইট সাহেবরা এমন কথাও বলেন যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর নাকি তাঁর মৃত্যুশয্যায় খ্রিস্টানরূপে মরবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং সে জন্য তিনি খ্রিস্টান যাজকদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছাবাণী বাইরে প্রকাশ করা হয়নি।

অনেকে বলেন, এ কাহিনীর কোনো ভিত্তি নেই। জাহাঙ্গীর কোনো বিশেষ ধর্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা বা শ্রদ্ধা নিয়ে মরেননি। তাঁর একান্ত বাসনা ছিল অনেকটা তাঁর পিতা আকবরের মতো নতুন কোনো ধর্ম প্রবর্তন করে মরবেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী আমাকে একজন মুসলমান ভদ্রলোক বলেছিলেন। এই ভদ্রলোকের পিতা ছিলেন জাহাঙ্গীরের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। কাহিনীটি এই :

একবার সম্রাট জাহাঙ্গীর মদ্যপানে বিভোর হয়ে কয়েকজন বিচক্ষণ মোল্লা ও একজন খ্রিস্টান পাদ্‌রী সাহেবকে ডেকে পাঠান। পাদ্‌রী সাহেবকে তিনি 'ফাদার আতশ' বলে ডাকতেন। 'আতশ' অর্থ আগুন। পাদ্‌রী সাহেবের মেজাজ খুব গরম ছিল বলে তিনি তাঁর এই নাম রেখেছিলেন।

ফাদার আতশ এসে প্রথমে ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা করেন, মোহাম্মদের (সা.) বিরুদ্ধে যা খুশি উক্তি করেন এবং নিজের খ্রিস্টধর্ম যীশু খ্রিস্টের (আ.) স্বপক্ষে অনেক বড় বড় কথা বলেন।

সম্রাট জাহাঙ্গীর আগাগোড়া সব শুনে সিদ্ধান্ত নেন যে, ধর্ম নিয়ে পাদ্‌রী ও মোল্লার এই বাক্‌যুদ্ধের একটা চূড়ান্ত নিস্পত্তি করা প্রয়োজন। তিনি হুকুম দেন: 'একটা গর্ত খোঁড়া হোক এবং তাতে আগুনে জ্বালিয়ে দেয়া হোক। ফাদার আতশ তাঁর বাইবেল হাতে করে এবং মোল্লা তাঁর কুরআন হাতে করে

---

৩৮. এ ঘটনার অন্যরকম বিবরণ দিয়েছেন কাট্রো (Catrou) । তিনি লিখেছেন : জাহাঙ্গীর কুরআনের বিধিনিষেধে ক্রমেই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন, বিশেষ করে পানাহারের ব্যাপারে। আহার্যের মধ্যে কয়েকটি জন্তুর মাংস ভক্ষণ করা পবিত্র কুরআনে নিষিদ্ধ। এই বিধিনিষেধে অতিষ্ঠ হয়ে সম্রাট একদিন জিজ্ঞেস করেন: 'এমন কোনো ধর্ম দুনিয়ায় আছে যাতে খাদ্যদ্রব্য সম্বন্ধে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই?' সকলে বলেন ' খ্রিস্টান ধর্মে এ রকম কোনো নিষেধ নেই। সম্রাট বলেন : 'তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের খ্রিস্টান হওয়া উচিত।' এই কথা বলে সম্রাট দরজিদের ডাকতে হুকুম দেন এবং বলেন যে, এখনই আমাদের যাবতীয় পোশাক-পরিচ্ছেদ খ্রিস্টান পোশাকে রূপান্তরিত করা হোক। মৌলবীরা সম্রাটের কথায় সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। ভয়ে তারা দিশাহারা হয়ে কাঁপতে থাকেন, কি করা যায় কিছুই ভেবে পান না। অবশেষে তারা অনেক ভেবেচিন্তে বলেন, কুরআন শরীফের বিধিনিষেধ সব সময় সম্রাটের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব সম্রাটের পানাহারের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।—অনুবাদক।

সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিন। আগুন যাঁকে দগ্ধ করতে পারবে না, আমি তাঁর ধর্মে দীক্ষা নেবো।' [৩৯]

কাহিনীটি সত্য-মিথ্যা যাই হোক, তাতে কিছু যায়-আসে না। এ কথা ঠিক যে জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দরবারে জেসুইটের বেশ প্রতিপত্তি ছিল এবং সম্রাটও তাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। সুতরাং পাদ্‌রী সাহেবরা যদি মনে করে থাকেন যে ভারতে খ্রিস্টান ধর্মের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর ভারতে যে সব ঘটনা ঘটেছে (দারার সঙ্গে পাদ্‌রী বুজির সম্পর্কে ঘটনা ছাড়া) তাতে মনে হয় না যে খ্রিস্টধর্মের এরকম সোনালি ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখার কোনো সার্থকতা আছে। যা হোক, পাদ্‌রী সাহেবদের সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গত বলে ফেলেছি। যখন বলে ফেলেছি তখন এ সম্বন্ধে আরও দু-চারটি দরকারি কথা এখানে না বলে পারছি না।

খ্রিস্টান ও ইসলাম ধর্ম

ধর্মপ্রচারের এই পরিকল্পনা আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি। যে পাদ্‌রী সাহেবরা ধর্মপ্রচারের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তারা যে প্রশংসা ও শ্রদ্ধার যোগ্য, তাও স্বীকার করি। বিশেষ করে কাপুচিন ও জেসুইটরা এতো নম্র ও সংযত ভাবে ধর্মকথা বলেন যে, তাদের শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। তাদের বক্তৃতাদির মধ্যে বিদ্বেষের কোনো ঝাঁজ নেই। ক্যাথলিক, গ্রীক, আর্মেনিয়ান, নেস্টরিয়ান, জেকোবিন প্রভৃতি সম্প্রদায়ের খ্রিস্টানদের প্রতি এই যাজকদের মনোভাব অত্যন্ত উদার ও সহনশীল। তারা সদাই পীড়িত ও ব্যথিতকে সান্ত্বনা দিতে পারেন ধর্মের বাণী শুনিয়ে এবং তাদের নিজের বিদ্যা ও চারিত্রিক গুণের জোরে তারা অজ্ঞ ম্লেচ্ছদের নানারকম কুসংস্কার ও গোঁড়ামির কথা স্মরণ করাতে পারেন। কিন্তু সকলের চরিত্র যে এরকম প্রশংসনীয় এবং পাদ্‌রী বলতেই যে শ্রদ্ধার যোগ্য, তা নয়। অনেকের স্বভাব-চরিত্র অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল এবং যাজক সম্প্রদায়ের উচিত তাদের চরিত্র সংশোধন করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা। ধর্মপ্রচারকের ছাপ মেরে তাদের বাইরে পাঠানো কোনোমতেই উচিত নয়। খ্রিস্টধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তারা কোনোরকম সাহায্য তো করেনই না, উপরন্তু ধর্মকে কলঙ্কিত করেন। অবশ্য সকলেই যে

---

৩৯. কাস্ট্রো বলেন, ফাদার আতশের আসল নাম ফাদার জোসেফ দ্য কস্টা। তিনি নাকি সম্রাটের অগ্নিপরীক্ষায় অবতীর্ন হতে রাজি হয়েছিলেন। ফাদার দ্য-কস্টা বলেছিলেনঃ 'আগুন জ্বালানো হোক এবং আগুনের মধ্যে ইসলাম ধর্মের ধারক মোল্লা কুরআন হাতে করে ঝাঁপ দিন, আর খ্রিস্টধর্মের প্রতিভূরূপে আমি বাইবেল হাতে ঝাঁপ দিই। তারপর দেখা যাক ঈশ্বর কার পক্ষে রায় দেন এবং যীশু ও হযরত মোহাম্মদের মধ্যে কাকে বড় বলে ঘোষণা দেন।' ফাদারের কথা শুনে সম্রাট পরীক্ষার দরকার নেই বলেন। সেই দিন থেকে ফাদার জোসেফকে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'ফাদার আতশ' বা 'আগুন বাবা' বলে ডাকতেন।—অনুবাদক।

এরকম অসংযত ও উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির, তা আমি বলছি না। যাজকতার বিরোধীও আমি নই। বরং আমি তার সমর্থক। ধর্মপ্রচারকের প্রয়োজন আছে, আমি তা স্বীকার করি। খ্রিস্টধর্মের প্রসারের জন্য পৃথিবীর সর্বত্র যে ধর্মপ্রচারক পাঠানো দরকার, তাও আমি স্বীকার করি। অবশ্য খ্রিস্ট আর তার ভক্তদের যুগ কেটে গেছে অনেকদিন আগে। এখন আর সেই সরল বিশ্বাসের যুগ নেই– এ কথাও মনে রাখা দরকার। তখন ধর্মপ্রচার করা ও মানুষকে ধর্মে দীক্ষা দেয়া যতোটা সহজ ছিল, এখন আর ততোটা সহজ নয়। আধুনিক যুগে মানুষকে ধর্মান্তরিত করা অত্যন্ত কঠিন।

দীর্ঘকাল ধরে আমি ম্লেচ্ছদের সম্পর্কে জড়িত, কিন্তু তবু তাদের প্রতি আমার সেরকম কোনো আস্থা নেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইসলামধর্মীদের ধর্মান্তরিত করায় আমার কোনো আশা-ভরসা নেই।

প্রাচ্যাঞ্চলের নানাস্থানে আমি ঘুরেছি। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলছি যে, হিন্দুদের দু-চারজনকে যদিও বা ধর্মান্তরিত করা সম্ভবপর, মুসলমানদের করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। দশ বছরের মধ্যে যদি একজন মুসলমানকে খ্রিস্টান করা সম্ভব হয়, তাহলে জানবেন যথেষ্ট হয়েছে। মুসলমানরা যে খ্রিস্টনদের বা খ্রিস্টধর্মকে শ্রদ্ধা করে না তা নয়। যীশু খ্রিস্টের নাম তারা শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে। তারা যীশুর পয়গম্বরত্বও বিশ্বাস করে। কিন্তু তাহলেও এ কথা কল্পনাও করবেন না যে, তারা নিজেদের ইসলামধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম বা অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ দেখাবে। প্রাণ থাকতে তারা তা করবে না। তবু খ্রিস্টধর্ম প্রচারকদের সর্বপ্রকার সাহায্য করা উচিত। মহান কাজে তাদের উৎসাহিত করাও উচিত। প্রধানত ইউরোপীয়দের উচিত এইসব প্রচারকের ব্যয়ভার বহন করা। অন্যদেশের জনসাধারণের কাঁধে সে ভার চাপানো উচিত নয়। প্রচুর পরিমাণে প্রচারকদের অর্থসাহায্য করা উচিত এবং অর্থের ব্যাপারে কোনো কার্পণ্য করা ঠিক নয়। কারণ অর্থাভাবেও অনেক সময় পাদ্‌রীরা হীন কাজ করতে বাধ্য হন। সুতরাং প্রত্যেক খ্রিস্টান রাষ্ট্রের কর্তব্য, ধর্মপ্রচারকদের মুক্তহস্তে অর্থ সাহায্য করা।

মুসলমান বা ইসলামধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ধারণা খুব পরিষ্কার নয়। আমরা কল্পনা করতে পারি না, সাধারণ মুসলমানদের ওপর ইসলামধর্মের প্রভাব কতখানি গভীর। ধর্মের প্রতি মুসলমানদের গোঁড়ামি ও অন্ধ উন্মত্ততা যে কতো তীব্র, তা বাস্তবিকই খ্রিস্টানদের পক্ষে ধারণা করা সহজ নয়। কারণ খ্রিস্টধর্মে অন্ধ উন্মত্ততার বিশেষ কোনো স্থান নেই বা প্রকাশের সুযোগ নেই।

আমার নিজের ধারণা– ইসলামধর্মের ভিত্তি মারাত্মক ও ভয়াবহ। অস্ত্রবলের জোরে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে যেমন–তেমনি সেই অস্ত্রের জোরেই তার প্রচার ও প্রসার হয়েছে। সহনশীলতা বা উদারতার কোনো স্থান নেই তার

মধ্যে।* খ্রিস্টানদের উচিত কৌশলে মুসলমানদের ধর্মগোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। চীন ও জাপানের দৃষ্টান্ত দেখে আমরা শিখতে পারি। এবং জাহাঙ্গীরের জীবন থেকে শিক্ষণীয় অনেক কিছু আছে।

পাদ্‌রী সাহেবদের আরোও একটি বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে। গির্জার মধ্যে প্রার্থনার বেদীর সামনে দাঁড়িয় খ্রিস্টানরা যে লঘুচিত্ততার পরিচয় দেন, তা নিন্দনীয়। মসজিদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার সময় মুসলমানরা একটি বার ঘাড় পর্যন্ত বাঁকায় না, কিন্তু পাদ্‌রীরা নানা রকম অঙ্গভঙ্গি করেন। ইসলামধর্মীদের একাগ্রতা, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা বাস্তবিকই অনুকরণীয়।

ডাচ্ বণিকদের কথা

আগ্রায় ডাচ্‌দের একটি কুঠি আছে। প্রায় চার-পাঁচজন লোক থাকে সেই কুঠিতে। আগে ডাচ্ বণিকরা আগ্রা শহরে কাপড়, নানা আকৃতির আয়না, নানান ধরনের সোনা-রুপার কাজ করা ফিতা, লোহা-লক্কড় ইত্যাদির ব্যবসা করতো। তা ছাড়া আগ্রার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে তারা নীল কিনতো এবং সেই নীলের ব্যবসা করতো। কাপড়ের ব্যবসাতেও তাদের বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। জালালপুর ও লক্ষ্ণৌ শহর থেকে তারা কাপড় কিনে আনতো। প্রতি বছর তারা লক্ষ্ণৌতে কয়েকজন ফ্যাক্টর বা কর্মচারী পাঠাতো কাপড় কেনাকাটার জন্য। এখন মনে হয় এই ব্যবসায়ীদের অবস্থা তেমন ভালো নয়। আর্মেনিয়ান বণিকদের প্রতিযোগিতার জন্য এবং আগ্রা থেকে সুরাটের দূরত্বের জন্য ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিয়েছে। পথে বিভিন্নভাবে ক্যারাভানের দুর্গতি ঘটে এবং বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয়। দুর্গম পথ ও পাহাড়-পবর্ত এড়িয়ে যাবার জন্য তারা গোয়ালিয়র থেকে বহরমপুরের সোজা পথ ধরে যায় না। তার বদলে আহমেদাবাদ দিয়ে ঘুরে বিভিন্ন রাজার রাজ্যের ভেতর দিয়ে তাদের যাতায়াত করতে হতো। তবে যতো অসুবিধা ও বাধাবিপত্তি থাকুক না কেন, আমার মনে হয় না যে ডার্চ বণিকরা ইংরেজ কুঠিয়ালদের মতো আগ্রার কুঠি ছেড়ে চলে যাবে। এখানেও ডাচ্ বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধা পায় এবং দরবার-সংশ্লিষ্ট লোকজনদের অনুনয়-বিনয় করে বাংলাদেশ, পাটনা, সুরাট, আহমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানে তাদের বাণিজ্যকুঠি পরিচালনার সুযোগ তৈরি করে নেয়। প্রাদেশিক শাসকদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে প্রতিকার করারও অসুবিধা হয় তাদের ।

---

* বার্নিয়ারের এ ধারণা গ্রহণযোগ্য নয়। অস্ত্রবলে ইসলাম ধর্ম প্রচার করা হয়নি। বরং অস্ত্রবলে নতুন কোনো দেশ জয় করার পর সেই বিজিত দেশে ইসলাম প্রচর করা হয়েছে। এবং এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, ইসলাম উদারতা ও শান্তির ধর্ম।—অনুবাদক।

তাজমহল

এবার আগ্রার দুটি প্রধান কীর্তিস্তম্ভের কথার উল্লেখ করে 'দিল্লী ও আগ্রা' সম্বন্ধে এই চিঠি শেষ করবো। আগ্রার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো এই স্তম্ভ দুটি। একটি সম্রাট জাহাঙ্গীরের তৈরি সম্রাট আকবরের স্মৃতিস্তম্ভ। আর একটি সম্রাট শাহজাহানের তৈরি বেগম মমতাজের স্মৃতিসৌধ 'তাজমহল'। সম্রাট আকবরের সমাধি সম্বন্ধে এখানে বিশেষ কিছু বলবো না, কারণ তার যা সৌন্দর্য তা তাজমহলের মধ্যে আরোও চমৎকারভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।*

তাজমহল বাস্তবিকই বিস্ময়কর কীর্তি। হয়তো বলবেন যে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে থাকার কারণে আমার রুচি অনেকটা ভারতীয় ধাঁচের হয়ে গেছে। কিন্তু তা নয়, আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখেছি যে, মিসরীয় পিরামিড আগ্রার তাজমহলের তুলনায় এমন কিছু আশ্চর্য কীর্তির নির্দশন নয়। মিসরের পিরামিডের কথা অনেক শুনেছি এবং দু-দুবার নিজ চোখে দেখেও যে আমি ব্যক্তিগতভাবে আনন্দ পাইনি, এ কথা স্বীকার করতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই। নিরাকার পাথরের স্তূপ ছাড়া মিসরীয় পিরামিড আমার কাছে আর কিছু মনে হয়নি। বিশাল বিশাল পাথরের চাঁই স্তরে স্তরে সাজিয়ে একটি কিমাকার কিছু গড়ে তুললেই বিস্ময়কর কীর্তি হয়ে যায় না। তার মধ্যে মানুষের কল্পনা বা কারিগরির নিদর্শন কিছু নেই, কিন্তু আগ্রার তাজমহলের মধ্যে তা আছে।

তাজমহল শুধু দৃষ্টিনন্দন একটি স্থাপনাই নয়, তাজমহলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার দৃষ্টান্তহীন উদাহরণ। মোগল সম্রাট শাহজাহান তাঁর স্ত্রীকে হারিয়ে কতোটা ব্যাকুল হয়েছিলেন, তার ভালোবাসা কতোটা প্রগাঢ় ছিল, তাই মূর্ত হয়ে উঠেছে তাজমহলের মধ্য দিয়ে।

যাঁর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য তাজমহল নির্মাণ করা হয়েছে তাঁর নাম ছিল আরজুমান্দ বানু। ইরানের শাহজাদী ছিলেন তিনি। ১৬২২ সালে মহান সম্রাট আকবরের পৌত্র এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের পর শাহজাহান অনিন্দ্যসুন্দরী এই নারীর নাম রাখেন মমতাজ মহল।

মমতাজ মহলের অন্তিম ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্যেই সম্রাট শাহজাহানের আবেগাপ্লুত এ আন্তরিক প্রয়াস, তাজমহল নির্মাণ। যে ব্যক্তি তাঁর হৃদয়ের অন্তঃস্থলে প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর প্রতি গভীর ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ

---

* তাজমহলের বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন বার্নিয়ার, প্রায় চার পৃষ্ঠাব্যাপী। তার সম্পূর্ণ অনুবাদ করা হয়নি। কারণ 'তাজমহলে'র রূপবর্ণনা এদেশের পাঠকরা অনেক পড়েছেন। তাই চিঠির এই অংশটুকু থেকে বার্নিয়ারের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্তব্যের (তাজমহল সম্বন্ধে) অনুবাদ করে বাকি অংশটুকু বাদ দেয়া হয়েছে।—অনুবাদক।

অপূর্ব সুন্দর এক মহান স্মৃতি উপহার দিয়ে বিশ্বের কোটি কোটি অশ্রুসজল প্রেমিক প্রেমিকার অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন, তিনি সম্রাট শাহজাহান।

শাহজাহানের চিরসাথী ও জীবনসঙ্গিনী মমতাজ মহল ১৬৩১ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মমতাজ মহলের মৃত্যুর পর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য শাহজাহান তাঁর সমাধির ওপর জাঁকজকমপূর্ণ যে চমকপ্রদ স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন, তারই নাম তাজমহল।

তাজমহল খ্যাতিমান ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এক অভূতপূর্ব স্মৃতিসৌধ। এ স্মৃতিসৌধ মোগল স্থাপত্যশিল্পের সাথে এক হয়ে মিশে আছে। এভাবেই সম্রাট শাহজাহান হয়েছেন এক বিস্ময়কর দেশের রূপকথার রূপকার।

সমাধিক্ষেত্রের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত তাজমহল ঝিকমিক করা সাদা মার্বেল পাথরে প্রস্তুত, যা প্রতিফলিত চন্দ্র ও সূর্য কিরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে রং পরিবর্তন করে ভিন্ন ভিন্ন রঙে জ্বলতে থাকে। তাজমহল এক অফুরন্ত ভালোবাসার প্রতীক, যা শাহজাহান তাঁর স্ত্রীর স্মৃতির স্মরণে নির্মাণ করেছেন। শাহজাহানের শাসনামলে সরকারি ইতিহাসে আব্দুল হামিদ লাহোরীর লেখা বই বাদশাহনামায় তাজমহলকে রওজা-ই-মনোয়ারা বা আলোকিত কবর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোগল রূপকথা ও রীতি অনুযায়ী এবং ইরানের প্রভাবের ছোঁয়ায় প্রস্তুতকৃত কমনীয় নক্শা সমাধি সৌধকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। প্রধান ভবন তৈরি হয়েছিলো ১৬৪৮ সালে। যা হোক, পরিবেষ্টনকারী স্থাপত্যশৈলী সংগঠিত করতে সময় লেগেছিলো পাঁচ বছর। সমাধি সম্পর্কিত উক্ত কমনীয় এলাকায় আছে সৌন্দর্যমণ্ডিত বাগান, ঝরনাসমূহ, প্রাকৃতিকভাবে নির্মিত ক্ষুদ্র জলাশয়, যেখানে তাজমহলের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

তাজমহলের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিলো পাথর কাটার (Cutter), নকশা প্রণয়নকারী, ভাস্কর্য শিল্পী, চিত্রকর, চারু ও কারুশিল্পী, গম্বুজ নির্মাণকারী শিল্পী ও কলাকুশলীবৃন্দ দ্বারা। এই শিল্পীদেরকে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা যথা– মধ্য এশিয়া ও ইরান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিলো। চারুশিল্পী আমানত খান সিরাজীর নাম তাজমহলের এক গেটে খোদাই করে লেখা আছে। কবি গিয়াসউদ্দিনের লেখা কবিতা সমাধির প্রস্তরখণ্ডে ছন্দাকারে লিপিবদ্ধ আছে। তুরস্কের অধিবাসী ইসমাইল খান আফ্রিদী গম্বুজ নির্মাণ করেন। মুহাম্মদ হানিফ ছিলেন রাজমিস্ত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক। তাজমহলের সার্বিক নকশা প্রস্তুতকারী ছিলেন ওস্তাদ লাহোরী। বৃহৎ কেন্দ্রীয় গম্বুজের উচ্চতা ১৮৭ ফুট।

ভারতের বিভিন্ন এলাকা এবং মধ্য এশিয়া থেকে কাঁচামাল, পাথর ও নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের জন্য ১০০০ হাতী নিয়োগ করে হয়েছিল। ২২ হাজার শ্রমিক ২২ বছরেরও অধিক সময় ব্যয় করে প্রয়োজনীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন

করে। তাজমহলের সম্পূর্ণ কাজ সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি। এ মার্বেল পাথর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মূল্য তৎকালীন মুদ্রায় তিন কোটি বিশ লাখ রুপী অর্থাৎ ৬৮০০০ মার্কিন ডলার। সর্বশেষ ১৬৫৩ সালে তাজমহলের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

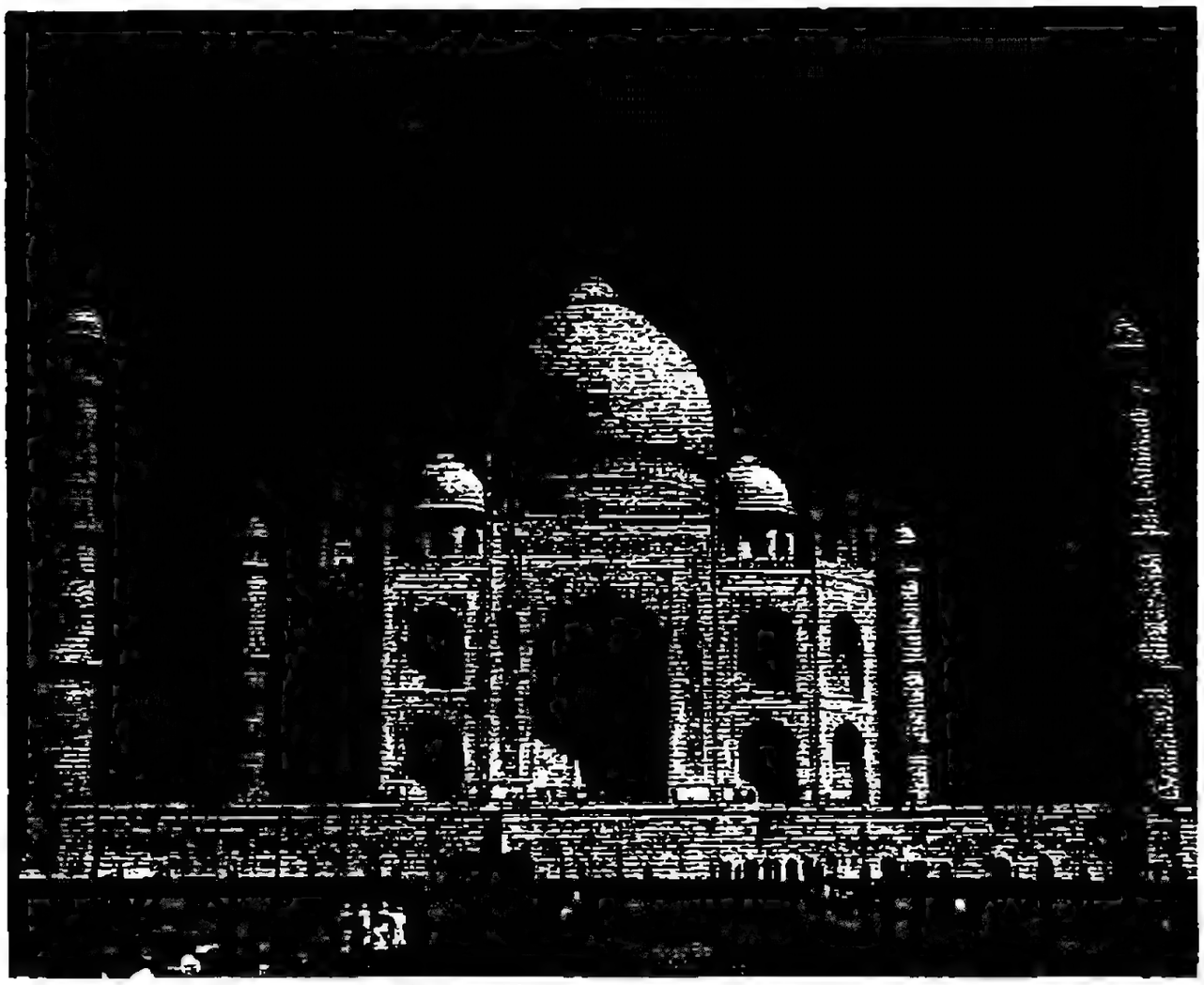

সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের স্মরণে নির্মিত তাজমহল

তাজমহল নির্মাণে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় লাল বালুকণা ফতেহপুর সিক্রি হতে, হলুদ বা বাদামী রঙের মধ্যমানের পাথর পাঞ্জাব হতে, কঠিন সাদা বা সবুজ পাথর সংগ্রহ করা হয়েছিলো চীন থেকে, সবুজ নীলরত্ন বা ইন্দ্রনীল নীলকান্ত মণি সিংহল (শ্রীলংকা) থেকে, কয়লা ও রক্তিম খয়েরি অথবা সাদা রঙের মূল্যবান পাথর, রত্নপাথর ও হীরকখণ্ড, পান্না বিভিন্ন দেশ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৮ প্রকার দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান ও মহামূল্যবান প্রস্তরখণ্ড ও রত্নসম্ভার তাজমহলের গম্বুজ ও প্রাচীরগাত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। সাদা মার্বেল পাথর রাজস্থানের নাগপুর জেলার মাকরান উপকূলের কোয়েরী থেকে আহরণ করা হয়েছে।

তাজমহল নির্মাণে প্রতিদিন বাইশ হাজার শ্রমিক ২২ বছর কর্তব্য কাজে নিয়োজিত ছিল। তাদের বাসস্থানের জন্য তাজমহলের নিকটে একটি উপ-শহর গড়ে উঠেছিলো, মমতাজ মহলের নামানুসারে এর নাম রাখা হয় মমতাজাবাদ। বর্তমানে এর নিকটবর্তী জায়গার নাম রাখা হয়েছে তাজগঞ্জ।

স্মৃতিসৌধ নির্মাণ সমাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যে সম্রাট শাহজাহানের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেবের ইচ্ছানুযায়ী তাজমহলের ভেতর মমতাজ মহলের কবরের পাশে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সাদা রঙের সমাধি একটি বর্গাকৃতি বেদিকা বা চতুষ্কোণ ভিত্তির ওপর উপস্থাপিত একটি প্রতিসম ভবনের অন্তর্গত। ধনুকাকৃতি দরজাপথে একটি বৃহৎ গম্বুজ শীর্ষ ও ফিনিয়াল মুকুটের ন্যায় পরিহিত। সমাধিশীর্ষে পারস্য ও ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের মিলিত নকশা অনুযায়ী পদ্মের ন্যায় অলংকৃত করা হয়েছে। উদ্ভাবিত খচিত কাজ এবং বিস্তারিত কারিগরি দক্ষতা ক্যালিওগ্রাফির সাথে একত্রিত হয়ে সর্বোতভাবে আকৃষ্ট করে। বাইরে মহামূল্যবান রত্ন ও ভেতরে কম মূল্যবান রত্ন খচিত করার জন্য শাহজাহান নির্দেশ দিয়েছিলেন। মিনারের উচ্চতা ৪০ মিটারের অধিক নয়, তবে চিরাচরিত মসজিদের ঐতিহ্যের দিকে খেয়াল রাখা হয়। মিনার নির্মিত হয়েছিলো কিছুটা বেদিকার (Plinth) বাইরে, কোনো কারণে মিনার পড়ে গেলে বড় ধরনের ক্ষতি যেনো এড়ানো যায়।

সম্পূর্ণ সমাধি চত্বরের চারপাশের দেয়ালে পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহ ক্যালিওগ্রাফি করে খচিত করা হয়েছিল। এ আয়াতগুলো শেষবিচারের দিনের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে।

[১৮৫৭ সালে ভারত জুড়ে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশ সেনা ও সরকারি কর্মচারীরা তাজমহলের দেয়ালে খচিত মহামূল্যবান মনিমুক্তা ও অন্যান্য রত্নাবলী বাটালী দ্বারা খোদাই করে তুলে নিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে স্মৃতিসৌধের চতুপার্শ্বে খচিত মূল্যবান রত্নসম্ভার ও নীলকান্তমণির শূন্যতায় চন্দ্রালোক ও সূর্যালোকে প্রতিফলিত আলোকে তাজমহল আর জ্বলজ্বল করে জ্বলতো না। এতে স্মৃতিসৌধের চতুষ্পার্শ্ব এবং গম্বুজগাত্রের চারদিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে যায়। এ কারণে সাধারণভাবে তাজমহল প্রায় দর্শকশূন্য হয়ে পড়ে। দেশী-বিদেশী পর্যটকদের দৃষ্টিতে বাহ্যিকভাবে তাজমহল সৌন্দর্যহীন হয়ে পড়ে। (বাহ্যিক ত্রুটি ও নৈতিক কলঙ্কের দায়মুক্তির প্রেরণা থেকে ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড কার্জন উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে সার্বিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক প্রকল্প গ্রহণ করেন। প্রকল্পটি ১৯০৮ সালে সমাপ্ত হয়।

বহু শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর এই অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যে, ভালোবাসার স্মৃতিসৌধ অবহেলা ও অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বিস্ময়কর স্থাপনাটির প্রয়োজনীয় মেরামত ও পুনরায় নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল। বর্তমানে এ সৌধটি অত্যধিক পরিবেশ

দূষণের কারণে বিপদগ্রস্থ। সরকার কর্তৃক পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়া ধীরগতি সম্পন্ন।

তাজমহল ভারতের সর্বজনস্বীকৃত পবিত্র প্রতিচ্ছবি হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এর কমনীয় মিনার সাবলীল এবং বক্র ধনুকাকৃতি প্রবেশদ্বার এবং আইসক্রিম স্কুপ (Scoop) সমৃদ্ধ গম্বুজ তীর্থ যাত্রীদের গমনপথে এর মহিমা ঘোষণা করে। তাজমহলের বিস্ময় এর গঠনশৈলীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এখানে যে ভবনটি দাঁড়িয়ে আছে তা ঐতিহাসিকভাবে যেমন সমৃদ্ধ, তেমনি বিত্তে। এর ইতিহাস আরও ভালোভাবে উদ্ভাবন করতে তাজমহল সংক্রান্ত আরও আকর্ষণীয় তথ্যাবলী সংক্ষেপে নিম্নে দেয়া হলো :

১. সম্রাটের প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজ মহলের স্মরণে তাজমহল নির্মিত হয়েছিলো।

২. বলা হয়ে থাকে সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুতে সম্রাট মানসিকভাবে এমন বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁর সম্পূর্ণ দাঁড়ি মোবারক এবং মাথার চুল মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বরফের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।

৩. তাজমহলের চতুর্দিকে অভিন্ন রূপ সৃষ্টি করে এক বিস্ময়কর আয়নার প্রতিবিম্বে প্রত্যেক পাশে তাক লাগানো জ্যামিতিক সূত্র প্রয়োগ করে প্রতিসম স্থাপত্যকলার সৃষ্টি করেছে।

৪. তাজমহল অর্থপূর্ণভাবে বাগান এবং কিছু সংখ্যক ভবন, একটি মসজিদ, অতিথিশালা ইত্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত, যা ১৭ হেক্টর ভূমিসহ কমপ্লেক্সের প্রাচীরের ভেতরে স্থাপিত।

৫. তাজমহলের সর্বাধিক উচ্চতা ১৭১ মিটার (৫৬১ ফুট)।

৬. এ মনোমুগ্ধকর ভবন নির্মাণে ২২ হাজারেরও অধিক লোকের মধ্যে শ্রমিক, চিত্রশিল্পী, পাথর কর্তনকারী, নকসা শিল্পী এবং আরও অনেক লোক কর্তব্যরত ছিলেন।

৭. কথিত আছে এবং বিশ্বাসযোগ্য যে, সম্রাট শাহজাহান কালো মার্বেল পাথর দ্বারা আরো একটি তাজমহল যমুনা নদীর অপর তীরে নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু ছেলেদের মধ্যে গোলযোগের কারণে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। এ কারণেই মৃত্যুর পর শাহজাহানকে তাজমহলের অভ্যন্তরে মমতাজের কবরের পাশে কবর দেয়া হয়।

৮. তাজমহল দিনের বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন রঙ ধারণ করতো। সকালে সূর্যোদয়ের পর গোলাপী রং, বিকালে দুগ্ধধবল সাদা এবং রাতে চাঁদের আলোতে সোনালী রং জ্বলজ্বল করতো। বলা হয়ে থাকে, এই পরিবর্তন মহিলাদের ক্ষণে ক্ষণে মনের অবস্থা পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; বিশেষ করে সম্রাজ্ঞীদের বেলায় এ পরিবর্তন প্রযোজ্য।– অনুবাদক]।

ভারতের হিন্দুদের কথা

ফ্রান্সের কবি জ্যঁ শাপলাকে এক চিঠিতে বার্নিয়ার ভারতবর্ষের হিন্দুদের ধর্ম, ধ্যান-ধারণা, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কথা লিখেছিলেন। নিজের চোখে যা তিনি দেখেছিলেন এবং নিজের কানে শুনেছিলেন, তাই তিনি লিখেছিলেন বলে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে তার মূল্য রয়েছে।—অনুবাদক।

ফরাসী ও ভারতীয় সূর্যগ্রহণ

জীবনে আমি দুটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি, যা কোনোদিন ভুলতে পারবো বলে মনে হয় না। তার মধ্যে একটি সূর্যগ্রহণ দেখেছি ফ্রান্সে ১৬৫৪ সালে, আর একটি দেখেছি দিল্লীতে ১৬৬৬ সালে। প্রথম গ্রহণের সময় ফরাসী জনসাধারণের এমন সব যুক্তিহীন ও অর্থহীন আচরণ স্বচক্ষে দেখেছি, যা আমার মনে চিরদিনের মতো গেঁথে রয়েছে। তারা এমন ভয়াবহভাবে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত আতঙ্কিত হয়ে উঠলো যে, অনেকে গ্রহণ লাগার আগে আত্মরক্ষার জন্য ওষুধপত্র কিনে খেতে আরম্ভ করলো। অনেকে ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে সারাদিন বন্দী হয়ে চুপ করে বসে রইলো। এমনভাবে তারা চারদিক বন্ধ করে বসে ছিল, যাতে আলো পর্যন্ত ঘরে প্রবেশ করতে না পারে। অন্ধকার কুঠরি খুঁজে তার মধ্যে ঢুকে বসে রইলো অনেকে। দলে দলে হাজার হাজার মানুষ প্রার্থনা করার জন্য গির্জার দিকে চললো। কেউ কেউ আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলো– কি জানি কি দুর্ঘটনা ঘটে, এই ভেবে। অনেকে ভাবলো পৃথিবীর ও মানুষের অন্তিমকাল ঘনিয়ে এসেছে। গ্রহণ লাগলে পৃথিবীর ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠে হয়তো সব ধ্বংস হয়ে যাবে। এই ধরনের আজগুবি সব ধারণা ও বিশ্বাস ছিল আমাদের দেশবাসীর। গ্যাসেন্ডী, রোবারভ্যাল ও অন্যান্য বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ্‌দের ব্যাখা সত্ত্বেও গ্রহণ সম্পর্কে মানুষজনের আতঙ্ক ও ভুল ধারণার সীমা ছিল না।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গ্রহণ লাগলে ভয়ের কোনো কারণ নেই। কারো কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের ভয় গেলো না! কিছু মতলববাজ জ্যোতিষীর অপপ্রচার ও মিথ্যা কল্পনার ফলে সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে ভুল ধারণা তাদের বদ্ধমূল রইলো।

১৬৬৬ সালে ভারতের দিল্লী শহর থেকে আমি যে সূর্যগ্রহণ দেখেছি তার কথাও আমার বিশেষভাবে মনে আছে। গ্রহণ সম্পর্কে ঐ একই হাস্যকর ধারণা ও কুসংস্কার দেখলাম ভারতীয়দের মাঝেও আছে।

যে সময় গ্রহণ লাগবার কথা, সেই সময় আমি আমার বাড়ির উপরে একটি খোলা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। যমুনার তীরেই আমার বাড়ি ছিল, সুতরাং সমস্ত দৃশ্যটি দেখারও আমার সুযোগ হয়েছিল। দেখলাম, যমুনার তীরে অসংখ্য লোকের ভিড় জমেছে। কোমর সমান পানিতে নেমে তারা ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছে– সেই মুহূর্তটির অপেক্ষায় যখন গ্রহণ লাগবে। গ্রহণ লাগলেই তারা পানিতে ডুব দিয়ে গোসল করবে।

ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সকলেই উলঙ্গ; পুরুষদের অধিকাংশের পরনে গামছা; বিবাহিতা ও ছয়-সাত বছর বয়সী মেয়েদের পরনে শাড়ি। বড় বড় রাজা-মহারাজা ও ধনী লোকেরা, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্কার ও জুয়েলাররা সপরিবারে যমুনা নদীর তীরে এসে তাঁবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থা করেছেন। যুমনার পানিতে চারদিকে পর্দা টাঙ্গিয়ে জনতার চক্ষুর অন্তরালে তাদের পরিবারবর্গের গোসলের ব্যবস্থা হয়েছে।

যে মুহূর্তে গ্রহণ লাগার সংবাদ রটলো, অমনি যমুনা বক্ষ থেকে হাজার হাজার কণ্ঠের একটা সম্মিলিত ধ্বনি উঠলো এবং সকলে বারবার পানিতে ডুব দিতে লাগলো। ডুব দিয়ে তারা পানিতে দাঁড়িয়ে, হাতজোড় করে সূর্যের দিকে চেয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলো এবং মধ্যে মধ্যে পানির ভেতর হাত ডুবিয়ে সূর্যের দিকে পানি ছিটাতে লাগলো। কখনো মাথা হেঁট করে, কখনো হাত নেড়ে তারা কতো রকম ভঙ্গি করতে আরম্ভ করলো, তার ঠিক নেই। গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত জনতা এভাবে অনবরত ডুব দিতে আর মন্ত্র পড়তে থাকলো। গোসল করে উঠে এসে যমুনার পানিতে টাকাপয়সা ছুঁড়তে লাগলো এবং ব্রাহ্মণদের দান করতে লাগলো। ব্রাহ্মণরাও বেশ বুদ্ধিমান, দিনক্ষণ বুঝে দানের লোভে অনেকে এসে হাজির হয়েছিলো সেখানে। গোসল শেষে সকলেই নুতন কাপড় পরে পুরনো কাপড় ফেলে দিলো।

এভাবে আমার ঘরের বারান্দা থেকে চোখের সামনে আমি যমুনার ওপর গ্রহণের অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। শুধু যমুনায় নয়, সিন্ধু থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এবং অন্যান্য নদ-নদীতে এভাবে সমারোহে গ্রহণপূর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। তাদের ধারণা, গ্রহণের দিন নদীর পানি অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি পবিত্র হয় এবং তাতে গোসল করলে পুণ্যসঞ্চয়ও হয় বেশি।

মোগল সম্রাট মুসলমান হলেও হিন্দুদের এ ধরনের ধর্মকর্মে, আহার-অনুষ্ঠানে কখনও বাধা দিতেন না। শুধু এই জাতীয় কোনো সামাজিক পার্বণ বা

উৎসব-অনুষ্ঠানের সময় দেখেছি ব্রাহ্মণরা প্রায় লাখখানেক টাকা সম্রাটকে ভেট দেন। সম্রাট তার পরিবর্তে তাদের একটা হাতি আর কয়েকটা ভেস্ট খেলাৎ দেন।

সূর্যগ্রহণ সম্পর্কে কেন হিন্দুদের এই ধারণা এবং কেন এই অনুষ্ঠানের আয়োজন, সে কথা এবার বলবো।

হিন্দুরা বলে, তাদের চারটি 'বেদ' আছে– পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ব্রাহ্মণের মাধ্যমে ভগবান জগতে এই বেদ প্রচার করেছেন। বেদে নাকি কথিত আছে, কোনো এক ভয়ঙ্কর কৃষ্ণবর্ণ দানবীয় দেবতা সূর্যের ওপর ভর করে তার জ্যোতি ম্লান করে দেয় এবং তার জন্যই সূর্যগ্রহণ হয়। দানব সূর্য দেবতাকে গ্রাস করে ফেলে। সূর্য মঙ্গলময়, করুণাময় দেবতা। তিনি জীবন দান করেন। সুতরাং গ্রাসাচ্ছাদিত অবস্থায় যখন সূর্যদেব যন্ত্রণা ভোগ করেন তখন প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য তাঁকে সেই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়া। প্রার্থনা করা, পূজার্চনা করে, দানধ্যান করেই একমাত্র তা করা সম্ভবপর। সূর্যগ্রহণের সময় এ জন্য এইসব কাজের গুরুত্ব বেশি এবং কাজ করলে পুণ্যার্জনও করা যায় বেশি। গ্রহণের সময় দান করলে যা পুণ্য হয়, অন্য সময় তার একশোভাগের একভাগও হয় না। এতোই যখন লাভ, তখন কে তার সুযোগ ছাড়বে, বলুন?*

মোটামুটি এই হলো ভারতের সূর্যগ্রহণ। এই গ্রহণ কি কখনো ভুলতে পারা যায়? মানুষজনের এই কল্পনা, ধারণা ও বিচিত্র বিশ্বাস নিয়ে আমি আর কিছু মন্তব্য করতে অক্ষম। বাকিটা আপনি ভেবে নেবেন।

পুরীর জগন্নাথ

বঙ্গোপসাগরের কূলে জগন্নাথ দেবতার নামে একটি শহর আছে। জগন্নাথের মন্দিরও আছে সেখানে, বিখ্যাত মন্দির। প্রত্যেক বছর জগন্নাথের যে বিরাট উৎসব হয় তা প্রায় আট-নয় দিন ধরে চলে। উৎসবের সময় ভারতবর্ষের প্রতিটি অঞ্চল থেকে অসংখ্য মানুষের সমাগম হয়, আগে যেমন হনুমানের মন্দিরে হতো এবং কয়েকশো বছর ধরে হচ্ছে মুসলমানদের পবিত্র নগরী মক্কায়।

শুনেছি, সমাগত লোকসংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। বিশাল একটি কাঠের রথ। (বার্নিয়ার 'কাষ্ঠযন্ত্র' বলেছেন) তৈরি করা হয় এবং তাতে নানারকমের সব কিম্ভূতকিমাকার জীব ও মূর্তি বসানো থাকে– এরা দেখতে যেমন ভয়ংকর তেমনি কদর্য। চৌদ্দটি বা ষোলটি চাকার ওপর রথটিকে বসানো হয়, যেমন

---

* বলাবাহুল্য, বার্নিয়ারের মতো বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা এর চেয়ে সঠিকভাবে করা সম্ভব নয়। হিন্দুধর্ম, দেবতা, ব্রাহ্মণ প্রমুখ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য যথাযথ না হলেও প্রণিধানযোগ্য।–অনুবাদক।

কামানগাড়ির ওপর কামান বসানো হয়, তেমন। ওটা বসানোর পর প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন লোক টানতে থাকে। জগন্নাথের মূর্তিটি মধ্যখানে বসানো হয়, রীতিমতো সাজিয়ে এবং তাকে টানতে টানতে এক মন্দির থেকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়।

উৎসবের প্রথম দিন যেদিন মন্দিরে জগন্নাথের দর্শনের জন্য দরজা খোলা হয়, সেদিন এমন প্রচণ্ড ভিড় হয় যে ভিড়ের চাপে দর্শনার্থীদের প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে ওঠে এবং অনেকের মৃত্যু হয়।

বহু দূর থেকে দর্শনার্থীরা জগন্নাথ দর্শনের জন্য হেঁটে হেঁটে আসে এবং পথের ক্লান্তিতে প্রায় মরণাপন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং তাদের ভিড়ের চাপ সহ্য করার মতো ক্ষমতা থাকে না। যাদের মৃত্যু হয়, হাজার হাজার যাত্রীর কাছে তারা সবচেয়ে বেশি পুণাত্মা বলে সম্মান পায় এবং সকলেই তাদের সশরীরে স্বর্গযাত্রার জন্য 'ধন্য ধন্য' করে। অতঃপর যখন সেই জগন্নাথের রথ ঘর্ঘর করে চলতে থাকে তখন সমবেত দর্শক-যাত্রীদের মধ্যে এমন এক বন্য উদ্দামতার সঞ্চার হয় যে, তার তাড়নায় অনেকেই সেই চলন্ত রথের চাকার তলায় শুয়ে পড়ে এবং পথের ওপর নিষ্পেষিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

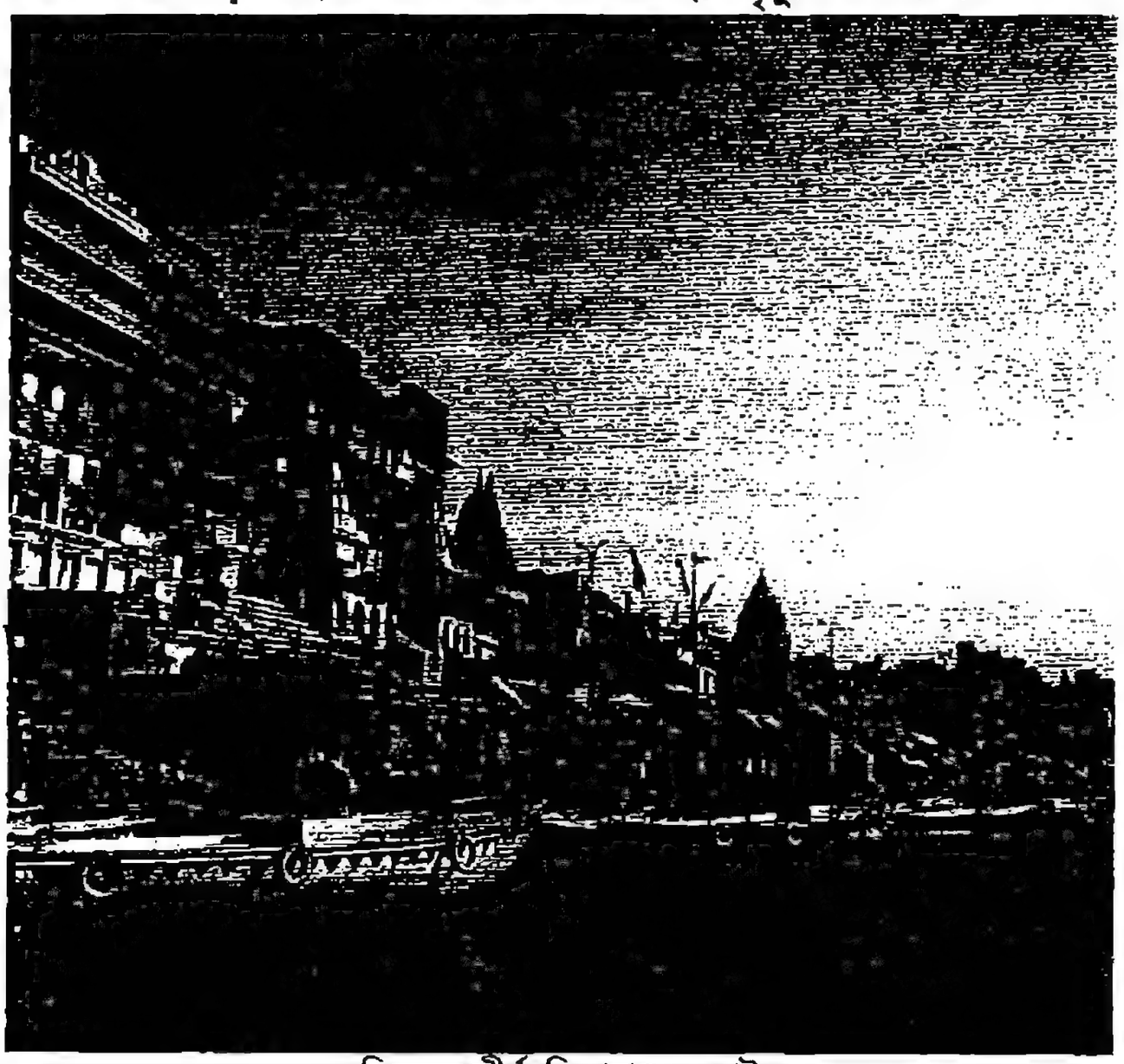

হিন্দুদের তীর্থভূমি বানারসের ঘাট

দর্শকদের মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার হয় বটে, কিন্তু সকলেই উচ্চকণ্ঠে বাহবা ধ্বনি দিতে থাকে। এর চেয়ে মহত্তর আত্মত্যাগ ও বীরত্বের নির্দশন আর কিছু নেই, তাদের মতো আত্মত্যাগী বীরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারলে তারা তৎক্ষণাৎ স্বর্গে চলে যাবে এবং সেখানে দেবতা তাদের পুত্রবৎ স্নেহ করবেন এবং পালনও করবেন। সংসারে দুঃখ বা জ্বালা-যন্ত্রণা বলে কিছু থাকবে না। মহাসুখে তারা স্বর্গে দেবতাদের সঙ্গে বসবাস করতে পারবেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে এসব ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার জন্য প্রধানত ভারতের ব্রাহ্মণরাই দায়ী। নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যই ব্রাহ্মণরা এই জাতীয় ধর্মকর্মও ও কুসংস্কারের প্রেরণা দিয়ে থাকে।

রথের সময় দেখেছি, একটি সুন্দরী মেয়েকে সাজিয়ে-গুজিয়ে জগন্নাথের 'কনে' বলে পরিচয় দেয়া হয় এবং জগন্নাথের পাশে বসিয়ে মহাসমারোহে তাকে অন্য মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে মেয়েটি জগন্নাথের সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, জগন্নাথ ঠাকুর মেয়েটিকে ভার্যার মতো মনে করবেন এবং সেভাবে তার সঙ্গে আচরণও করবেন। মেয়েটিকে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়– যেমন, এ বছরটি কেমন যাবে, মঙ্গল হবে কি হবে না ইত্যাদি। প্রশ্নের উত্তরের জন্য মুক্তহস্তে দানধ্যান করা হয়, মানত করা হয়। তার পরদিন রথ যখন ফিরে যায় তখন পুরোহিত তাকে রাত্রে কানে-কানে যা বলে দেয়, সেই সব কথা সে সাক্ষাৎ জগন্নাথের উক্তি মনে করে দর্শকদের চেঁচিয়ে বলতে থাকে। দর্শকরাও মেয়েটির মুখের প্রত্যেকটি কথা বিশ্বাস করে।

জগন্নাথের রথের সামনে ও মন্দির প্রাঙ্গণে বারাঙ্গনারা নানারকম দৃষ্টিকটু ভঙ্গি করে নৃত্যরত থাকে (বার্নিয়ার 'দেবদাসী' নৃত্যের কথা বলেছেন)। এতে কেউ কোনো আপত্তি করে না। এরকম অনেক সুন্দরী মেয়ে আমি জগন্নাথধামে স্বচক্ষে দেখেছি। 'বারাঙ্গনা' বলতে যা বোঝায়, তারা ঠিক তা নয়। হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টানই হোক, কাউকেই তারা সংস্পর্শে আসতে দেয় না, এবং কারো কাছ থেকে তারা কোনো টাকাপয়সা বা উপহারও গ্রহণ করে না। তারা মনে করে দেবতার উদ্দেশে তাদের জীবন উৎসর্গ করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত বা পুণ্যাত্মা সাধু ছাড়া তাদের ছায়া মারাবার পর্যন্ত অধিকার কারো নেই।

ভালো কথা, সাধু-সন্ন্যাসীদের কথা তো বলাই হলো না। মন্দিরের সীমানার মধ্যে চারদিকে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখা যায়। মাথায় বড় বড় জটা, মুখে দাড়ি, গায়ে ভস্ম মাখা অবস্থায় সকলেই প্রায় নগ্ন হয়ে বসে থাকে ।

সতীদাহ ও সহমরণ

সতীদাহ ও সহমরণ প্রথা সম্পর্কে অনেক পর্যটক অনেক কথা বলেছেন। নতুন করে কিছু বলার নেই। অনেকে অবশ্য সতীদাহের যথেষ্ট অতিরঞ্জিত বিবরণও দিয়েছেন। ক্রমেই সতীদাহের সংখ্যা কমে আসছে বলে মনে হয়। এবং আগের তুলনায় এখন অনেক কমে গেছে। মুসলমান রাজত্বকালে সম্রাটরা নানাভাবে হিন্দুদের সহমরণ প্রথা নিবারণ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু কখনো তাঁরা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করেননি। তা ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে বিধিনিষেধ জারি করে সতীদাহ বন্ধ করারও চেষ্টা করেননি। নানারকম কৌশলে তাঁরা এই অমানুষিক দাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন। প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবাদারের অনুমতি ছাড়া কেউ সহমরণ বরণ করতে পারবে না বলে সম্রাট এক আদেশ জারি করে দিয়েছিলেন। আদেশে বলা হয়েছে, সহমরণের জন্য সুবাদারের অনুমতি নিতে হবে এবং তার কাছে আবেদন করতে হবে।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত সতীদাহের দৃশ্য অংকিত একটি সমসাময়িক তৈলচিত্র

আবেদন করলে সুবাদার সহজে অনুমতি দিতেন না। নানাভাবে আবেদনকারীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাঁচাবার জন্য চেষ্টা করতেন। নানারকম যুক্তি দিয়ে আশার কথা বলে সুবাদার নিজে যখন ব্যর্থ হতেন, তখন তিনি সহমরণ প্রার্থিনীকে অন্দরমহলে মহিলাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সুবাদারের পরিবারের মহিলারা তাকে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হলে এবং বাইরে থেকে কোনো প্ররোচনা দেয়া হচ্ছে না বলে সুবাদারের বিশ্বাস জন্মালে, তবে তিনি সহমরণের অনুমতি দিতেন।

এতো চেষ্টা সত্ত্বেও সহমৃতার সংখ্যা ভারতে খুব বেশি বলা চলে। বিশেষ করে, প্রায় স্বাধীন হিন্দু দেশীয় রাজ্যের মধ্যে সতীদাহের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি

দেখা যায়। মুসলমান শাসকরা এসব রাজ্যের মধ্যে কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না। হিন্দু রাজারা সতীদাহ শাস্ত্রসম্মত বলে মনে করেন, সুতরাং তাঁদের রাজ্যে অবাধে সতীদাহ চলতে থাকে।

যতোগুলো সতীদাহ আমি স্বচক্ষে দেখেছি তার বিস্তৃত বিবরণ এখানে দেবো না। শুধু দু-তিনটি ঘটনার কথা উল্লেখ করবো। প্রত্যেটি সহমরণের সময় আমি নিজে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থেকে দেখেছি। প্রথম এমন একটি সতীদাহের বিবরণ দিয়ে আরম্ভ করবো, যার সঙ্গে আমি জড়িত ছিলাম। অর্থাৎ সহমরণ প্রার্থিনীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য আমাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত আমি কৃতকার্য হয়েছিলাম।

আগা দানেশমন্দ খানের বেণীদাস নামে এক কেরানী ছিলেন। বেণীদাস আমারও বন্ধু ছিলেন। প্রায় দু'বছর কঠিন অসুখে ভুগে তিনি মারা যান। আমি তার চিকিৎসা করেছিলাম। তার মৃত্যুর পর তার স্ত্রী স্বামীর সহমৃতা হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। আগার কাছে বেণীদাসের কয়েকজন বন্ধুও চাকরি করতেন। আগা তাদের বললেন, কোনো রকমে বুঝিয়ে বেণীদাসের পত্নীকে সহমরণের সংকল্প থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে। আপনারা সেই চেষ্টা করুন।

বেণীদাসের বন্ধুরা আগার কথায় উৎসাহিত হয়ে বেণীদাসের পত্নীকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। তারা বললেন, সহমরণের সংকল্প খুবই সাধু সংকল্প। পুণ্যাত্মা স্ত্রী ছাড়া এরকম সংকল্প কেউ করতে পারে না। এতে তার কুলগৌরব বাড়বে এবং তিনি দেবীর মতো পূজিত হবেন। তবু তারা তাকে অনুরোধ করছেন কয়েকটা কথা ভেবে দেখআর জন্যে। তিনি কয়েকটি শিশু সন্তানের জননী। তার অবর্তমানে এদের কে দেখবে? মায়ের মতো কে স্নেহ করবে? সন্তানদের এরকম অনাথ ও অসহায় অবস্থার ফেলে যাওয়া কি তার উচিত হবে? তারা তো ধর্ম-পুণ্য বোঝে না। অন্তত তাদের মুখের দিকে চেয়ে তার উচিত সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করা। পতিপ্রেমের চেয়ে অসহায় সন্তানদের কল্যাণচিন্তা তার কাছে বড় হওয়া উচিত।

এতো অনুনয়-বিনয়, কাকুতি-মিনতি করেও কোনো ফল হলো না। বেণীদাসের পত্নী সহমরণের সংকল্পে অবিচলিত রইলেন। অবশেষে শেষ চেষ্টা করার জন্য খান সাহেব আমাকে ডেকে বললেন: 'বার্নিয়ার সাহেব! আপনি তো বেণীদাসের একজন পুরনো বন্ধু। চিকিৎসক হিসেবে তার পরিবারের সঙ্গেও পরিচিত। আপনি একবার শেষ চেষ্টা করে দেখুন কেরানীবাবুর স্ত্রীকে বাঁচানো যায় কি না।'

আমি রাজি হলাম এবং কেরানীবাবুর গৃহাভিমুখে যাত্রা করলাম।

বাড়ি গিয়ে যা দেখলাম তা বর্ণনা করা যায় না। মৃত বেণীদাসকে ঘিরে সাত-আটজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ দাঁড়িয়ে আছেন। সকলেই

মাঝেমধ্যে প্রাণপণ চিৎকার করে উঠছেন, একটা বীভৎস আর্তনাদের মতো এবং সজোরে হাত চাপড়াচ্ছেন। মনে হলো যেনো নরকে ভূতপ্রেতের রাজ্যে ঢুকেছি। মৃত স্বামীর পায়ের কাছে বিধবা পত্নী বসে আছেন, চুল আলুথালু, মুখ শুকনো। চোখের পানি শুকিয়ে গিয়ে চোখ আগুনের মতো দপপদ করে জ্বলছে। ব্রাহ্মণরা যখন বিকটভাবে আর্তনাদ করে উঠছেন তখন তিনিও তাদের সঙ্গে চিৎকার করছেন এবং তাদের সঙ্গে তাল দিয়ে মাথা চাপড়াচ্ছেন।

চিৎকার ও মাথা চাপড়ানি খানিকটা কমে এলে আমি তাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে কেরানীবাবুর স্ত্রীকে বললাম: 'আগা খান নিজে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আপনি যদি সহমরণের সংকল্প ত্যাগ করেন, তবে আপনার দুই পুত্রের জন্য তিনি মাসিক দুই ক্রাউন করে ভাতা দেয়ার বন্দোবস্ত করবেন। আপনি জানেন আপনার ছেলেদের মানুষ করার জন্যে, তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্যে আপনার বেঁচে থাকা প্রয়োজন। আমরা ইচ্ছা করলে জোর করে আপনার সহমরণ বন্ধ করতে পারি। শুধু তাই নয়, যেসব মতলবাজ আপানাকে এভাবে সহমরণের জন্য প্ররোচিত করছে, তাদেরকেও শাস্তি দিতে জানি। তা আমরা করতে চাই না। আপনার সুবুদ্ধির কাছেই আমরা আবেদন করতে চাই। আপনার আত্মীয়স্বজন সকলেই চান যে অন্তত সন্ত ানদের মুখের দিকে চেয়ে আপনি বেঁচে থাকুন। আপনি সন্তানের জননী, সুতরাং নিঃসন্তান তরুণী বিধবাদের বেঁচে থেকে যে রকম লাঞ্ছনা, অপবাদ সহ্য করতে হয়, আপনাকে তা করতে হবে না।'

এ কথা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আমি বহুবার বললাম, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখ থেকে কোনো উত্তর শুনতে পেলাম না। মুখ বুজে তিনি সব শুনলেন। অবশেষে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন : 'আমাকে যদি সহমরণে বাধা দেয়া হয়, তাহলে আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে মরবো।'

আমি আর সহ্য করতে না পেরে বললাম: 'মনে হয় আপনার কাঁধে অপদেবতা ভর করেছে। তা না হলে মা হয়ে এরকম কথা আপনি বলতে পারেন, কল্পনা করা যায় না! বেশ, মরতে চান মরবেন। কিন্তু তার আগে ছেলেদের ডেকে নিজের হাতে তাদের কেটে স্বামীর চিতার ওপর শুইয়ে দিন। এ কাজ আপনাকে করতেই হবে। যদি না করেন, তা হলে তারা অনাহারে মরবে এবং এখনই আমি খান সাহেবের কাছে গিয়ে তাদের ভাতা নামঞ্জুর করার ব্যবস্থা করবো।'

অত্যন্ত সংযত ও সুদৃঢ় কণ্ঠে কথাগুলো বললাম। বেণীপত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ কথায় কিছুটা কাজ হয়েছে। একটি কথাও আর না বলে দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে তিনি বসে রইলেন। দেখলাম, ঘরের বৃদ্ধরা ও ব্রাহ্মণরা একে একে চম্পট দিচ্ছেন। মুখের ওপর তাদের ক্রোধ ও বিরক্তির

ভাব সুস্পষ্ট। যা হোক, আমি তারপর তাকে তার আত্মীয়স্বজনদের কাছে রেখে ঘোড়ায় চড়ে ঘরমুখো হলাম।

সন্ধ্যার সময় যখন আগা সাহেবের কাছে আমার প্রচেষ্টার ফলাফল জানাতে যাচ্ছি, তখন বেণীদাসের একজন আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা হলে সে জানালো, বেণীপত্নী সহসমরণের সংকল্প ত্যাগ করেছেন। নিশ্চিন্ত হলাম শুনে।

মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে মরতে এক স্ত্রীলোককে দেখেছি যে সহমরণ নিয়ে আমার মনে রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। সতীদাহের বীভৎসর দৃশ্য স্বচক্ষে দেখার মতো শক্তিও আর আমার নেই, এমন কি তার বিবরণ দেয়ারও ইচ্ছা নেই। তবু চেষ্টা করবো যতোদূর সম্ভব সঠিক বিবরণ দিতে। যা স্বচক্ষে দেখছি তাই বলবো। এ ধরনের ভয়াবহ মর্মান্তিক দৃশ্যের নিখুঁত বিবরণ দেয়া যে কতো কষ্টকর, তা বুঝিয়ে বলতে পারবো না। লিখিত বিবরণ পড়ে সতীদাহ বা সহমরণ সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়। স্বচক্ষে না দেখলে এর মর্মান্তিকতা বিশ্বাস করা যায় না।

আহমেদাবাদ থেকে আগ্রা যাবার সময় অনেক দেশীয় নৃপতির রাজ্য অতিক্রম করে যেতে হয়। পথে একটি বাগানের মধ্যে আমাদের ক্যারাভান যখন বিশ্রামের জন্য থামলো তখন আমরা খবর পেলাম, কাছেই একটি সতীদাহের আয়োজন করা হয়েছে এবং মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দেয়ার জন্য স্ত্রী প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছেন।

শুনেই আমি সেখানে দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম, শুকনো একটি ডোবার তলায় বেশ বড় করে গর্ত কেটে চিতা তৈরি করা হয়েছে। চিতার ওপর কাঠ সাজানো। তার ওপর মৃত ব্যক্তিকে সটান শুইয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার জীবন্ত স্ত্রীও সেই চিতার ওপর বসে আছেন। চার-পাঁচজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত চিতার চারদিকে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। পরিপাটি করে পোশাক-পরিচ্ছদ পরে পাঁচজন মধ্যবয়স্কা মহিলা পরস্পর হাত ধরাধরি করে চিতার চারদিকে ঘুরে-ফিরে নাচছে আর গাইছে। পুরুষ ও মহিলা দর্শকরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

চিতার ওপর প্রচুর পরিমাণে তেল-ঘি ঢালা হয়েছিলো। সুতরাং অগ্নিসংযোগ করতে না করতেই ওটা দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। স্ত্রীলোকটির পরনের কাপড়ে আগুন ধরে গেলো। সুগন্ধ তেল ও চন্দন তার গায়ে আগেই লেপে দেয়া হয়েছিলো। তাই সারা গায়ে আগুন ধরে গেলো। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এতোটুকুও বিচলিত হতে দেখলাম না তাকে! কোনো বেদনা, যন্ত্রণা, এমন কি সামান্য অস্বস্তির ভাব পর্যন্ত তিনি প্রকাশ করলেন না! অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্থির হয়ে বসে বেশ স্পষ্টভাবে 'পাঁচ' 'দুই' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন।

পরে জেনেছি,'পাঁচে'র অর্থ, পূর্বজন্মে পাঁচবার তিনি তার এই স্বামীর সঙ্গে সহমরণ করেছেন। আর দুই জন্মে দু'বার করতে পারলেই সাতবার সম্পূর্ণ হবে এবং তিনি এই মানবজন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে স্বর্গলোকবাসিনী হতে পারবেন। সে এক বিচিত্র দৃশ্য। দেখলে মনে হয়, কোনো অদৃশ্য শক্তি সেই স্ত্রীলোকটির মনপ্রাণ একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

কিন্তু এ তো সবে শুরু। করুণ কাহিনীর আরোও অনেক বাকি ছিলো। আমি ভেবেছিলাম, যে পাঁচজন মহিলা চিতার চারদিকে ঘুরে নাচগান করছে, তারা কোনো শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করছে। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। চিতার লক্‌লকে আগুন তাদের মধ্যে একজনের কাপড়ে লেগে গেলো। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই মহিলাটিও চিতার অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দ্বিতীয়জনও দেখতে দেখতে তার অনুগমন করলো। বাকি তিনজন তখনো হাত ধরাধরি করে নাচছে-গাইছে, কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম না তাদের মধ্যে। কিছুক্ষণ পর তারাও একে-একে চিতার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

অতঃপর বুঝলাম, এই একাধিক সহমরণের কারণ কি? সেই পাঁচজন মহিলা ক্রীতদাসী। গৃহস্বামী যখন অসুস্থ হয়েছিলেন তখন গৃহকর্ত্রী তার সেবা-শুশ্রুষা করতেন এবং বলতেন যে তার মৃত্যু হলে তিনিও সহমৃতা হবেন। তা শুনে দাসীরাও স্থির করেছিলো, গৃহস্বামীর মৃত্যুতে যদি গৃহকর্ত্রী সহমৃতা হন, তাহলে তারাও তাদের জীবন উৎসর্গ করবে।

ভারতবর্ষের অনেক লোকের সঙ্গে এ বিষয়ে আমি আলাপ করেছি। তারা আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ভালোবাসার আধিক্যই সহমরণের অন্যতম কারণ। ভারতের মেয়েরা কোমল প্রকৃতি ও স্নেহপ্রবণ। সে জন্য স্বামীর মৃত্যু তারা সইতে পারে না এবং নিজেরাও স্বামীর সহমৃতা হয়।

এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। অনুসন্ধান করে আমি যেটুকু জানতে পেরেছি তাতে আমার অন্যরকম ধারণা হয়েছে। বাল্যকাল থেকে ভারতের মেয়েদের মনে নানা রকম কুসংস্কারের বীজ বপন করা হয়। প্রত্যেক মেয়েকে তার মা শিক্ষা দেন যে, স্বামীই হলেন একমাত্র দেবতা এবং মৃত স্বামীর ভস্মাবশেষের সঙ্গে নিজের দেহ মিশিয়ে দেয়ার চেয়ে জীবনের মহত্তর কর্তব্য আর কিছু হতে পারে না। এটাই হলো সনাতন প্রথা। কোনো নারী এ প্রথার বিরোধিতা করতে পারে না, করাটা পাপ।

আমার ধারণা, পুরুষরাই হলো এসব প্রথা ও সংস্কারের স্রষ্টা। মেয়েদের দাসীর মতো পদানত করে রাখার জন্য পুরুষরাই মাথা ঘামিয়ে এই সব প্রথার প্রচলন করেছে।

যা হোক, এরকম আরও দু-একটা মর্মান্তিক ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। একটি বিখ্যাত ঘটনার কথা বলছি যা আমি স্বচক্ষে দেখিনি, তবে এর গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি এবং যা উল্লেখ না করলে সহমরণ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি তাও যদি অন্যদের কাছে বলি, তাহলে কেউ তা বিশ্বাস করতে চাইবে না। এরকম ঘটনা এতোই অবিশ্বাস্য যে, নিজের চোখে না দেখলে তা বিশ্বাস করা যায় না। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তা আমি মর্মে মর্মে বুঝতে পারছি। তাই শোনা ঘটনা হলেও আমি সেটা অবিশ্বাস্য মনে করি না এবং উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করছি। একসময় ভারতবাসীর মুখে মুখে কাহিনীটি প্রচার হয়েছিলো। প্রত্যেকেই কাহিনীটি সত্য বলে বিশ্বাস করে। হয়তো ভারতের বাইরে ইউরোপেও এতোদিনে এই কাহিনী প্রচার হয়েছে। এবার কাহিনীটি বলছি :

কোনো এক হিন্দু মহিলা তার প্রতিবেশী এক তরুণ মুসলমান দর্জির প্রেমে পড়েছিলো। মুসলমান ছেলেটি খুব ভালো সেতার বাজাতে পারতো। মেয়েটি নিরুপায় হয়ে তার স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। তার বিশ্বাস ছিল যে মুসলমান ছেলেটি তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে। সে তার প্রেমিকের কাছে গিয়ে পতিহত্যার কাহিনী বলে এবং তাকে বিয়ে করার জন্য অনুরোধ করে। মেয়েটি বলে, এই শহর ছেড়ে এখনই তাদের পালাতে হবে। যেতে দেরি হলে মৃত্যু ভিন্ন অন্য কোনো পথ থাকবে না। স্বামীর শবদেহের সঙ্গে তাকেও সহমরণে যেতে হবে।

মুসলমান ছেলেটি আসন্ন বিপদের আশঙ্কা দেখে মেয়েটিকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে। মেয়েটি তখন সোজা তার আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে গিয়ে বলে যে তার স্বামীর আকস্মিত মৃত্যুতে সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছে এবং স্বামীর সহমৃতা হবার সংকল্প করেছে।

আত্মীয়স্বজনরা মেয়েটির সিদ্ধান্ত জানতে পেরে খুশি হয়। তারা বলে যে, তার মতো মহীয়সী নারী আর হয়নি, পরিবারের গৌরব সে।

অবশেষে চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হয়। মেয়েটি চিতার চারদিকে ঘুরে ঘুরে আত্মীস্বজনের কাছ থেকে বিদায় নিতে থাকে। বাদ্যকররাও চিতার পাশে উপস্থিত ছিল এবং তাদের মধ্যে সেই মুসলমান ছেলেটিও ছিল। মেয়েটি একে একে সকলে কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ধীরে ধীরে সেই ছেলেটির কাছে এগিয়ে যায় এবং হঠাৎ তাকে টানতে টানতে চিতার কাছে নিয়ে আসে। তারপর পুরো শক্তিতে এক ধাক্কা মেরে তাকে আগুনের ভেতর ফেলে দেয় এবং নিজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সুরাট থেকে ইরান যাত্রার সময় আমি আর এক বিধবা মহিলার পতিভক্তি ও সহমরণ দেখেছি। এ সময় শুধু আমি নই, একাধিক ইংরেজ ও ডাচ ভদ্রলোক এবং প্যারিসের মঁশিয়ে চারডিনও উপস্থিত ছিলেন।[১] এই সতীদাহের বিবরণ নিখুঁতভাবে বর্ণনা করার মতো ক্ষমতা আমার নেই। সহমরণের সময় মহিলার মুখে যে পৈশাচিক সাহস ও স্বচ্ছন্দতা আমি লক্ষ্য করেছি, তা ভাষায় প্রকাশ করা কি সম্ভব? কি নির্ভীক নির্বিকার তার ভঙ্গি! স্থিরভাবে তিনি সকলের সঙ্গে কথা বলছেন, আলাপ করছেন, কোনো দুর্ভাবনার ছাপ নেই কোথাও। কি অবিচলিত আত্মবিশ্বাস তার! কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই কিছুতে! সঙ্কোচ নেই, জড়তা নেই, অস্বস্তি নেই! বসে বসে নিবিষ্ট মনে চিতার কাঠখড় নেড়েচেড়ে দেখছেন। দেখার পর শান্তভাবে চিতার ওপর উঠে তিনি মৃত স্বামীর মাথাটি কোলের ওপর তুলে নিয়ে গম্ভীরভাবে বসলেন। তারপর একটি জ্বলন্ত মশাল নিয়ে নিজের হাতে চিতায় অগ্নিসংযোগ করলেন, বাইরে থেকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা আগুন জ্বেলে দিলেন। বর্ণনা করা যায় না সে দৃশ্য। ভাষায় জোর নেই আমার। ছবি এঁকে যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য চোখের সামনে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলবো, তেমন যোগ্যতা নেই। আগাগোড়া সতীদাহের এই দৃশ্যটি এমনভাবে আমার মনে ছাপ রেখে গেছে যে, আজও আমার মনে হয় আমি যেনো মাত্র কয়েকদিন আগে ঘটনাটি ঘটতে দেখেছি। সমস্ত দৃশ্যটি একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো মনে হয়।

অবশ্য আমি সতীদাহের এমন অনেক ঘটনাও দেখেছি যেখানে মৃত স্বামীর চিতার সামনে দাঁড়িয়ে বিধবা স্ত্রী ভয়ে শিউরে উঠেছেন এবং আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছেন। তখন আমার মনে হয়েছে, সতীদাহ থেকে আত্মরক্ষা করার যদি কোনো শাস্ত্রীয় বিধান থাকতো, তাহলে এই হতভাগ্য মহিলাদের মধ্যে অনেকে হয়তো সহমরণ না করে বেঁচে থাকতেন। কিন্তু পুরোহিতরা সে রকম কোনো বিধানের কথা বলেননি এবং সহমরণে অনিচ্ছুক ভীত ও সন্ত্রস্ত বিধবাদের তারা মৃত্যুবরণ করতে বাধ্য করেছেন।

অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি, ভীত আতঙ্কিত মহিলাদের জোর করে ঠেলে চিতার মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। চিতার কাছ থেকে পাঁচ-ছয় পা পিছিয়ে এসেছে ভয়ে, এরকম মহিলাদের জোর করে চিতার মধ্যে টেনে ফেলে দিতে

---

১. বিখ্যাত পর্যটক জন চারডিন (John Chardin) ১৬৪৩ সালে প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৭১৩ সালে লন্ডনে মারা যান। ১৬৬৫ সালে প্রথমে তিনি ইরান ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী। ১৬৭০ সালে চারডিন প্যারিস ফিরে যান এবং পুনরায় ১৬৭১ সালে ইরান ও ভারতে আসেন। ১৬৭৭ সালে উত্তমাশা অন্তরীপের পথে চারডিন ইউরোপ ফিরে যান। ১৬৬৭ এবং ১৬৭৫ সালে তিনি সুরাটে ছিলেন। ১৬৬৭ সালে বার্নিয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সতীদাহের দৃশ্য বার্নিয়ারের সঙ্গে চারডিনও দেখেছিলেন।–অনুবাদক

দেখেছি। চিতার ভেতর থেকে প্রাণপণে ছুটে পালিয়ে যাবার জন্য চেষ্টা করছে এবং বাইরে থেকে বাঁশের গোঁজা গিয়ে জোর করে তাকে চিতার মধ্যে চেপে ধরে রাখা হয়েছে, এরকম নিষ্ঠুর দৃশ্যও একাধিকবার দেখেছি।

কোনো কোনো সময় বিধবাদের পালাতেও দেখেছি। শবদাহের সময় চিতার কাছে ডোম-মুর্দাফরাসদের ভিড় হয়। যে সতী হবে বয়সে যদি সে তরুণী হয়, দেখতে সুন্দরী হয়, তাহলে অনেক সময় মুর্দাফরসরা মতলব করে তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। পলাতকা সতীকে তারা লুকিয়ে রাখে। যাদের আত্মীয়স্বজন তেমন নেই, সঙ্গতিহীন ও দরিদ্র, তাদেরই সাধারণত এভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়। কিন্তু এভাবে যারা পালিয়ে কোনোরকমে আত্মরক্ষা করতে পারে, এবং নিম্নশ্রেণির কাছে আশ্রয় পায়, তাদের জীবন শেষপর্যন্ত দুর্বিষহ হয়ে ওঠে এবং অভিশপ্ত হতভাগিনীর মতো তারা দিন কাটায়। কেউ তাদের শ্রদ্ধা করে না, স্নেহ করে না, ভালোবাসে না। সমাজের মধ্যে ভদ্রভাবে তারা আর জীবন কাটাতে পারে না। চিরজীবন তাকে পতিতা ও কলঙ্কিনীর অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। সুতরাং তার আশ্রয়দাতা যারা তারাও তার অসহায় অবস্থার জন্য তার প্রতি দুর্ব্যবহার করে। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টির ভয়ে পলাতকা কোনো সতীকে সসম্মানে আশ্রয় দিতে কোনো মোগল বা মুসলমানও চায় না। সতীর ধর্মদ্রোহিতা তাদের ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে অনেক হিন্দু বিধবাকে পর্তুগীজরা সতীদাহের কবল থেকে উদ্ধার করেছে। প্রধানত বন্দরের কাছাকাছি জায়গাতেই তারা উদ্ধার করেছে বেশি, কারণ পর্তুগীজদের বাস ছিল বেশি বন্দরের কাছেই।

সতীদাহের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমার নিজের যা মনে হয়েছে, তা ভাষায় ব্যক্ত করতে পারবো না। মনে হয়েছে, যে পুরোহিতরা সমাজে এই শাস্ত্রীয় বিধানের প্রবর্তন করেছে, তাদের আগে সমূলে উচ্ছেদ করা উচিত।

লাহোরে একবার একটি সুন্দরী বালিকার সহমরণের দৃশ্য দেখেছিলাম। সে দৃশ্য কোনোদিন ভুলবো না। বছর বারোর বেশি বয়স হবে না মেয়েটির। চিতার সামনে মেয়েটিকে যখন নিয়ে আসা হলো তখন ভয়ে সে আধমরা হয়ে গেছে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে না দেখলে বর্ণনা করে বোঝানো যায় না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো মেয়েটি। কিন্তু সমবেত আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বা দর্শকদের মধ্যে এ নিয়ে কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেলো না। এক বৃদ্ধা মেয়েটির হাত ধরলো এবং পাঁচজন পুরোহিত মিলে তাকে নিয়ে মৃত স্বামীর চিতার ওপর বসিয়ে দিলো। তার হাত-পা সব বেঁধে দেয়া হলো– পাছে সে উঠে পালায়, সেই ভয়ে! তারপর চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হলো এবং বালিকাটিকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হলো।

এরকম কোনো ঘটনার সামনে আমার পক্ষে আত্মসংবরণ করা যে কঠিন হতে পারে তা বুঝতেই পারছেন। মনে হলো চিৎকার করে প্রতিবাদ করি। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলাম। কারণ প্রতিবাদ করে লাভ নেই। আগামেমনন্ নিজের কন্যা ইফিজিনিয়াকে যখন ডায়ানার কাছে উৎসর্গ করেছিলেন, তখন কবি লুক্রেসিয়াস এই ধর্মের নামে অধর্মাচরণ সম্বন্ধে দুঃখ করে যা বলেছিলেন, সেই কথা আমার মনে পড়লো।

এখনও তো এই কুসংস্কার সম্বন্ধে, এই নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধে সব বলা হয়নি। ভারতের সর্বত্র যে এই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত, তা নয়। কোনো কোনো অঞ্চলে বিধবা স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় দাহ না করে তাকে টুঁটি টিপে হত্যা করা হয়। দু-তিনজন হঠাৎ বিধবাটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার টুঁটি চেপে ধরে এবং তাকে হত্যা করে। তারপর তার মৃতদেহ মাটিচাপা দিয়ে পদদলিত করে চলে যায়।

অধিকাংশ হিন্দু অবশ্য শবদাহ করে। কেউ কেউ দেখেছি নদীর ধারে মৃতদেহ নিয়ে গিয়ে কোনো উঁচু জায়গা থেকে পানির মধ্যে ছুড়ে ফেলে দেয়। গঙ্গানদীর ধারে এরকম মৃতের সৎকার আমি একাধিকবার দেখেছি। কাক, চিল শকুন, কুমির, হাঙরের খাদ্য হয় সে সব মৃতদেহ।

কেউ কেউ রুগ্না ব্যক্তিকে মৃত্যুর আগমুহূর্তে নদীর ধারে বহন করে নিয়ে যায় এবং পা থেকে গলা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে রাখে। ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে পানিতে চুবিয়ে দেয়া হয় এবং সেইভাবে পানির মধ্যে রেখে, খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে, চিৎকার করে উঠে, সকলে ফিরে যায়। এভাবে সৎকার করার উদ্দেশ্য কি, এ কথা আমি জিজ্ঞেস করেছি। তার উত্তরে শবযাত্রীরা বলেছে : মৃত্যুর সময় আত্মা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায় তখন যদি গঙ্গাজলে তাকে গোসল করানো হয়, তাহলে কলুষিত আত্মার সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং নিষ্কলঙ্ক আত্মায় স্বর্গযাত্রা ত্বরান্বিত হয়।

জানি না হয় কি না। তবে এ বিশ্বাস শুধু যে অশিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়। রীতিমতো শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও আমি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তর্ক করতে দেখেছি।

সাধু-সন্ন্যাসী ও ফকিরদের কথা

ভারতে সাধু-সন্ন্যাসী, ফকির-দরবেশ প্রভৃতির সংখ্যা ও বৈচিত্র্য এতো বেশি যে তা বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আশ্রমে বাস করেন এবং সেখানে গুরুর আদেশ পালন করে চলেন। আশ্রমে তাদের সহজ সরল জীবনযাত্রা, ব্রহ্মচর্য, গুরুভক্তি ইত্যাদি আদর্শ মেনে চলতে হয়। এতো রকমের বিচিত্র জীবন এই সব ফকির ও সাধু-সন্ন্যাসী যাপন করেন যে, তার সঠিক বর্ণনা দেয়া সত্যিই কঠিন।

একশ্রেণির সাধু আছেন যাদেরকে 'যোগী' বলা হয়। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগের পন্থা যারা জানেন, অথবা যাদের যোগসূত্র আছে, তারাই হলেন যোগী। কতো যে যোগী ভারতে আছেন তার হিসেব নেই। নগ্নদেহে ভস্ম মেখে তারা ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকেন। কখনো কোনো গাছতলায়, কখনো কোনো নদ-নদীর ধারে বা দেবালয়ের আশেপাশে তাদের যোগাসনে বসে থাকতে দেখা যায়। মাথায় আজানুলম্বিত কেশ, জট পাকানো, মুখে দাড়ি। কেউ একটি বা দুটি হাত উর্ধ্বে তুলে বসে থাকেন। হাতের নখ লম্বা– মেপে দেখেছি, প্রায় অর্ধেক আঙুলের সমান লম্বা। হাতগুলো শীর্ণ, অনাহারক্লিষ্ট রোগীর মতো।

সাধুরা প্রায় অনাহারেই থাকেন বলে তাদের দেহ শীর্ণ হয়ে যায়। পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেছে বলে মনে হয়, শিরাগুলো পাকিয়ে গেছে এমন আকার ধারণ করে। সাধারণ লোক এই শীর্ণকায় সাধুদের দেবতার মতো ভক্তি করে এবং তাদেরকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন মহাপুরুষ বলে মনে করে। দলে দলে তারা সাধুদের কাছে এসে ভিড় করে।

আমি বলবো, যোগাসনে উপবিষ্ট দীর্ঘজটাজুট শ্মশ্রু সম্বলিত, লম্বা নখবিশিষ্ট নগ্নদেহী এই যোগীদের দেখলে যতোটা না শ্রদ্ধা জাগে, তারচে বেশি মনে ভয় জাগে।

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে দেখেছি, নগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (নাগা সন্ন্যাসীদের কথা বলেছেন বার্নিয়ার– অনুবাদক)। ভয়াবহ দৃশ্য! কারো হাত উর্ধ্বে প্রসারিত; মাথার জট বৃত্তাকারে চূড়া করে বাঁধা; হাতে লাঠি, লোহার রড ও ত্রিশূল; কারো পরনে বা কাঁধে বাঘের ছাল। ঠিক এভাবে আমি তাদের দল বেঁধে সারা শহরে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। কোনো পরোয়া নেই, সঙ্কোচ নেই। স্ত্রী-পুরুষ দর্শক সকলে মিলে তাদের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, ভয়ে বিহ্বল হয়ে, ভক্তিতে গদগদ হয়ে। মহিলারা তাদের মহাপুরুষ মনে করে দানধ্যান করে। সাধু-সন্ন্যাসীদের দানধ্যান করলে পুণ্য হয়, স্বর্গবাস হয়– এ বিশ্বাস সাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে।

দিল্লী শহরের মধ্যে এরকম একজন ঔদ্ধত্য উলঙ্গ সাধুর আচরণে আমি রীতিমতো বিরক্তি বোধ করতাম। সারা শহরের মধ্যে, পথেঘাটে সাধুটি উলঙ্গ হয়ে নির্বিকারচিত্তে ঘুরে বেড়াতো, বাচ্চা খোকাদের মতো। কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই, ভয়-ডর নেই। লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ঘোরাঘুরি করতো সে।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের অনুরোধ ও হুমকি– দুই-ই সে উপেক্ষা করে চলতো, অগ্রাহ্য করতো। বহুবার তাকে কাপড় পরে ভদ্রবেশে থাকার জন্য অনুরোধও করেছেন সম্রাট, শেষে শাস্তি দেবেন বলে ভয়ও দেখিয়েছেন। কিন্তু কিছুই সে গ্রাহ্য করেনি। অবশেষে সম্রাটের আদেশে দিল্লী শহর থেকে বাইরে নিয়ে গিয়ে এই ঔদ্ধত্যের জন্য সাধুটির শিরচ্ছেদ করা হয়।

দৈহিক কষ্ট সহ্য করেও তপস্যারত এক সন্ন্যাসী (ছবিটি বর্তমান সময়কার)।

মাঝেমধ্যে এই সাধু-সন্ন্যাসীরা দল বেঁধে দূরদেশে তীর্থযাত্রা করে। শুধু নগ্নদেহ নয়, বড় বড় লোহার শিকলাদি সঙ্গে নিয়ে। হাতির পা-বাঁধা শিকলের মতো মোটা মোটা লোহার শিকল। অনেক সাধুকে দেখেছি, সাত-আটদিন ধরে সমানে রাতদিন সোজা হয়ে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে। সাত-আটদিন ধরে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য পা ফুলে যায়। কাউকে কাউকে দেখেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাতের ওপর ভর দিয়ে, মাথা নিচু করে, পা দু'খানা উপরে তুলে অবস্থান করতে। এরকম আরও নানা রকমের দৈহিক কসরতের দৃশ্য দেখেছি, যা এতো কষ্টকর যে, সাধারণ লোকের পক্ষে অনুকরণ করা সম্ভব নয়। এসব করা হয় একটা অলৌকিক শক্তির নিদর্শন রূপে।

প্রথমে যখন আমি ভারতে যাই, তখন এই সব কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের নিদর্শন দেখে আমার মনে রীতিমতো অবজ্ঞার ভাব এসেছিল– এ কথা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই। তা ছাড়া আর কি ভাবা যেতে পারে এসব সম্বন্ধে, আমি জানতাম না।

কখনো কখনো আমার মনে হতো এই সাধুরা একদল নৈরাশ্যবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। কোনো শিক্ষা-দীক্ষা নেই, যুক্তি বা বুদ্ধিসম্মত বিচারের ক্ষমতা নেই তাদের। মধ্যে মধ্যে অবশ্য এমনও মনে হতো, হয়তো তারা সত্যিই সাধু প্রকৃতির লোক, সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এরকম আচরণ

করছে। কিন্তু সাধুতার বিশেষ কোনো চিহ্ন তাদের মধ্যে কোনোদিন খুঁজে পাইনি। অনেক সময় মনে হয়েছে হয়তো এরকম একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন, অলস, অকর্মণ্য, ভ্রাম্যমাণ জীবনের প্রতি তাদের একটা বিশেষ আকর্ষণ আছে বলেই তারা সাধু হয়েছে। আবার এ কথাও মনে হয়েছে, সাধু হিসেবে তাদের একটা অহমিকাবোধ আছে এবং সেই বোধ থেকেই তারা এইসব আচরণ করে থাকে। সাধুদের সম্পর্কে এরকম অনেক কথা আমার মনে হয়েছে।

সাধুরা যে এতো কষ্ট সহ্য করে এবং আত্মপীড়ন করে, তার কারণ তারা মনে করে পরবর্তী জীবনে তাদেরকে রাজা করে দেয়া হবে। অর্থাৎ, এমন এক জীবন লাভ করবে, যার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি রাজকীয় জীবনের চেয়ে অনেক বেশি। পরবর্তী জীবনে ইহজীবনের রাজাদের চেয়েও তারা বেশি সুখী হবে– প্রধানত এই ধরনের বিশ্বাস থেকেই তারা আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করে।

অনেক সময় আমি সাধু-সন্ন্যাসীদের বলেছি, পরজীবনে কি হবে না হবে তার জন্য ইহজীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দিয়ে এতো দুঃখ-কষ্ট ভোগ করা, কি কারণে তারা যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করেন? আমি বুঝতে চেয়েছি, বোঝাতে চেয়েছি, কিন্তু তারা বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ আমাকে বোঝানো খুব সহজ নয়। আমি বলেছি, অতি সহজ যুক্তিতে আমি ঐ সব পরলোকের স্বর্গসুখ বা রাজকীয় সুখের কথা বলতে রাজি নই। নির্বুদ্ধি না হলে কেউ পরলোকের সুখের ভরসায় ইহলোকে স্বেচ্ছায় এরকম দুঃখকষ্ট ভোগ করে না।

সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কেউ উচ্চস্তরের সাধু বলে জনসমাজে পরিচিত। একেবারে সিদ্ধ যোগীপুরুষ তারা, ভগবানের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ। সকলের ধারণা, পার্থিবজীবন থেকে তারা একেবারে বিচ্ছিন্ন, সংসারত্যাগী ও গৃহত্যাগী। দূরে কোনো অরণ্যমধ্যে নির্জন নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে তারা, সাধারণত জনপদের দিকে যায় না। কেউ যদি খাবার-দাবার ভক্তিভরে এনে দেয়, তারা তা গ্রহণ করে, আর যদি কেউ না আনে, তাহলে তারা অনাহারেই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। সৃষ্টিকর্তা তাদের বাঁচিয়ে রাখেন। দীর্ঘকাল অনশন উপবাসে অভ্যস্ত বলে তাদের বিশেষ কোনো কষ্ট হয় না। প্রায়ই দেখা যায়, এই ধর্মাত্ম যোগীপুরুষ ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকেন। তারা বলেন যে, এভাবে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অক্লেশে থাকতে পারেন। কারণ তাদের আত্মা এই সময়ে একটি অতীন্দ্রিয় আনন্দে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে থাকে; তাদের বাহ্যজ্ঞান লোপ পায়, ইন্দ্রিয়ের বোধশক্তি বলে তখন আর কিছু থাকে না। যোগীরা ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভ করেন। আলোকের মতো জ্যোতির্ময় মূর্তিতে সৃষ্টিকর্তা তাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন। তখন তারা এক অলৌকিক আনন্দের শিহরণ অনুভব করেন এবং ইহলোক, সংসার, পৃথিবীর সব তাদের কাছে তখন অতি তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়।

আমার একজন বিখ্যাত যোগীপুরুষের সঙ্গে পরিচয় ছিল। তিনি বলতেন যে, এরকম ধ্যানস্থ হয়ে যতোক্ষণ ইচ্ছা তিনি থাকতে পারেন। সাধারণ মানুষ যারা যোগীপুরুষদের সান্নিধ্য কামনা করে তারা এই যোগসাধনা ও দেবতাদর্শন ইত্যাদি গভীরভাবে বিশ্বাস করে। আমার মনে হয়, এ ধরনের যোগসাধনা ও যোগবলে ঈশ্বরদর্শনাদির অলৌকিক ব্যাপারের মধ্যে কিছুটা সত্য হয়তো নির্হিত আছে। নিঃসঙ্গ নির্জন জীবনযাত্রা, দীর্ঘ উপবাস ও আত্মনিগ্রহের ফলে মানুষের কল্পনাশক্তি অনেক উগ্র রূপ ধারণ করে এবং তখন মানুষের পক্ষে নানান রকমের অলৌকিকতাকেও বাস্তব সত্য বলে মনে হয়। অবশ ও ক্লান্ত দেহের মধ্যে ঘুমন্ত, মূর্ছিত মন বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখে। সাধুসন্ন্যাসীরা যেভাবে আত্মনিগ্রহ অভ্যাস করেন, তাতে এরকম কাণ্ডবাণ্ড অসম্ভব বলে মনে হয় না। ইন্দ্রিয়গুলোকে তারা ক্রমে নিজেদের আয়ত্তে আনেন এবং তখন ইচ্ছা মতো ধ্যানস্থ হয়ে অলৌকিক স্বপ্ন দর্শন করতে তাদের কোনো কষ্ট হয় না।

সাধুরা বলেন– কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে একাকী ধ্যানস্থ হতে হবে। প্রথমে উর্ধ্বনেত্র হয়ে আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে, পূর্ণ উপবাস করতে হবে, পানি পর্যন্ত স্পর্শ করা চলবে না; উর্ধ্বনেত্রে যোগাসনে বসে, চোখ দুটি ধীরে ধীরে আনত করে নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ করতে হবে; নাসিকাগ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে কিছুকাল অবস্থান করার পর দেবতা জ্যোতির্ময় আলোকরূপে যোগীর সামনে অবতীর্ণ হবেন। এই ভাবোন্মত্ততাই হলো যোগীদের অলৌকিক রহস্যবাদের মূল কথা।

যোগীদের মতো চালচলন সুফীদের মধ্যেও দেখা যায়। আমি এটা রহস্যবাদ বলছি, কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই তাদের কাছে গুহ্য ব্যাপার। কিছুই তারা বাইরে প্রকাশ করেন না, করতে চান না। তাদের যোগসাধনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এই গোপনীয়তা। হয়তো বলবেন, তাহলে আমি এতো সব কথা জানতে পারলাম কোথা থেকে? একজন পণ্ডিতের সাহায্যেই আমি এই সব কথা জানতে পেরেছি। আমার মনিব আগা দানেশমন্দ খান শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য একজন হিন্দু পণ্ডিতকে বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন। পণ্ডিত মশাই আমাদের কাছে কিছুই গোপন করতেন না। আর সুফীদের সম্বন্ধে দানেশমন্দ খানের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল।

আমার নিজের বিশ্বাস, দারিদ্র, অনশন ও আত্মনিপীড়ন– এই তিনের প্রভাবে মানুষের পক্ষে এই ধরনের আত্মজ্ঞানহীন অবস্থায় পৌছানো সম্ভব হয়। আমাদের দেশের (ইউরোপের) ধর্মযাজক ও সাধুপুরুষরা এদিক দিয়ে যে এশিয়া বা ভারতবর্ষের যোগীপুরুষদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তা নয়। বরং এদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আর্মেনীয়ান, কেল্ট, গ্রীক, নেস্টোরিয়ান, জেকোবিন ও

মেরোনইটরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করলে ইউরোপীয় সাধুদের শিক্ষানবীশ বলে মনে হয়। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, অনশন ও উপবাসের কষ্ট ভারতের তুলনায় শীতপ্রধান ইউরোপে অনেক বেশি।

এবার অন্য আর একশ্রেণির ফকিরের কথা বলবো যারা ঠিক যোগীদের মতো নয়, অথচ যাদের প্রতিপত্তি যোগীদের তুলনায় কোনো অংশেই কম নয়। প্রায় সব সময়ই তারা ভ্রাম্যমাণ জীবন যাপন করে, চারদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়, উদাসীন ভাব দেখায় আর অনেক গুহ্য ব্যাপার জানে বলে প্রচার করে।

সাধারণ লোক মনে করে যে, এই ফকিরবেশী সাধুরা জানে না এমন কোনো জিনিস নেই এবং তাদের এমন ঐশ্বরিক শক্তি আছে যে, তারা যে কোনো পদার্থকে সোনায় পরিবর্তন করতে পারে। অভ্রজাতীয় এমন এক পদার্থ তারা তৈরি করে– যা সামান্য দু-একটা দানা প্রতিদিন সকালে গলাধঃকরণ করলে যে কোনো অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে যায়, দুর্বল শরীরে শক্তিসঞ্চার হয়। যা খাওয়া যায় তাই তৎক্ষণাৎ হজম হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, যদি এই শ্রেণির দুজন সাধুপুরুষ দৈবক্রমে হঠাৎ কোথাও মিলিত হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে অলৌকিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলতে থাকে। তখন দুজনেই এমন সব জাদুবিদ্যার খেলা দেখাতে থাকে যে, সাধারণ মানুষের বিস্ময়ের আর অবধি থাকে না। কে কি মনে মনে চিন্তা করেছে তা তারা অনর্গল গড়গড় করে বলে দেয়, পত্রপুষ্পহীন শুকনো গাছের ডালে বিড়বিড় করে ফুল ফুটিয়ে দেয়। ফল ফলিয়ে দেয়। এক ঘণ্টার মধ্যে, পনেরো মিনিটের মধ্যে বুকের ভেতর ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়। এবং শুধু বাচ্চা নয়, যে কোনো পাখির বাচ্চা ফোটায়, তাকে ঘরের মধ্যে উড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ে ক্ষান্ত হয়। এরকম আরও অনেক অবাক হবার মতো কাজ তারা করে, জাদুবলে ও মন্ত্রবলে যার রহস্য কারো পক্ষেই ভেদ করা সম্ভব হয় না।

এই শ্রেণির ফকিরের সম্বন্ধে লোকমুখে যা শুনেছি তা সত্য কি মিথ্যা, যাচাই করে দেখার সময় হয়নি। আমার আগা (দানেশমন্দ খান) একবার এরকম একজন সবজান্তা ফকিরকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন এবং তাকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাঁর মনের কথা সব ঠিক ঠিক বলে দিতে পারেন, তাহলে আগা তাকে তিনশো টাকা পুরস্কার দেবেন। আগা বলেছিলেন যে আগে থেকে তিনি একটি কাগজে তাঁর মনের কথা লিখে রেখে দেবেন, যাতে ফকিরের মনে সত্য-মিথ্যা নিয়ে কোনো সন্দেহ না হয়।

এ সময় আমিও ফকিরকে বলেছিলাম যে আমিও তাকে পাঁচশো টাকা পুরস্কার দেবো যদি আমার মনের কথা তিনি বলে দিতে পারেন। আশ্চর্য! সাধুবাবা তারপর আর আমাদের বাড়িমুখো হয়নি!

আর একবার আমার ইচ্ছা হলো, এই সাধুবাবারা কি করে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায় তা দেখতে হবে। তাও স্বচক্ষে দেখা কোনোদিন সম্ভব হয়নি। ব্যক্তিগতভাবে এতো আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোনোদিন সাধুবাবার তাজ্জব কাণ্ড দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দু-এক জায়গায় যখনই আমি উপস্থিত হয়েছি এবং দেখেছি যে জনতার মধ্যে রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমি নানারকম প্রশ্ন করে দেখেছি যে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই হলো চালাকি ও ধাপ্পাবাজি। কোনো অলৌকিক শক্তির চিহ্ন নেই কোথাও।

একবার আমার আগা সাহেবের টাকা চুরি গিয়েছিল এবং সাধুবাবা বাটি চালান দিয়ে চোর ধরার কৌশল দেখাচ্ছিলেন। আমি সেই চালাচালির চালাকিটা ফাঁস করে দিয়েছিলাম।

আর এক শ্রেণির ফকির আছে যাদের চালচলন অন্যরকম। তারা বাইরে বিশেষ কোনো ভড়ং দেখায় না, পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যেও তেমন কোনো জাঁকজমক নেই এবং ভক্তির আতিশয্যও তাদের কম। সাধারণত খালি পায়ে তারা চলাফেরা করে, মাথাতেও কোনো পাগড়ি-টাগড়ি পরে না। একটা লম্বা আজানুলম্বিত আলখাল্লা পরে, তার ওপর ওড়নার মতো একটা সাদা চাদর হাতের তলা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে জড়িয়ে, তারা ঘুরে বেড়ায়। এমনিতে তারা খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, অন্যদের মতো অপরিচ্ছন্ন নয়। দুজন দুজন করে চলাফেরা করে, একা নয়। চলাফেরার ভঙ্গিও খুব নম্রসম্র। এক হাতে কমণ্ডলুর মতো একটি ভিক্ষার পাত্র থাকে। সাধারণত তারা অন্যান্য সাধু-ফকিরদের মতো দোকানে দোকানে ঘুরে ভিক্ষা করে না। ভদ্রলোকের বাড়িতে যায় এবং যাওয়া মাত্রই আপ্যায়িত হয়। গৃহস্থরা তাদের আগমনে কৃতার্থ বোধ করে, প্রাণ খুলে অতিথিসৎকার করতেও কুণ্ঠিত হয় না। হিন্দু গৃহস্থরা মনে করে এই সাধুদের আবির্ভাব সাক্ষাৎ দেবতার আবির্ভাবের মতো। যে পরিবারে যখন তারা যায়, সেই পরিবারের লোক তখন তাদের ভাগ্যবান বলে মনে করে। বাইরে এদের আচার-ব্যবহার, চরিত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে নানারকম কানাঘুষা শোনা যায়। পরিবারের সঙ্গে, এমনকি স্ত্রীলোকদের সঙ্গেও তারা এমন অন্ত রঙ্গভাবে মেলামেশা করে যে, সকলেই তাদের সন্দেহের চোখে না দেখে পারে না। মোগল সাম্রাজ্যের মধ্যে এই গুরুসেবা ও সাধুসেবার এই জাতীয় বিচিত্র প্রথা সর্বত্র প্রায় প্রচলিত আছে দেখা যায়।

সবচেয়ে আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এই সাধুরা নিজেদের কতোকটা খ্রিস্টান পাদ্‌রীর সমগোত্র বলে মনে করেন। এদের দেখলে আমার মনে নানারকম কৌতূহলের সঞ্চার হতো এবং চারিত্রিক দুর্বলতা ও দম্ভ দুই-ই আমার কাছে বেশ উপভোগ্য মনে হতো। মধ্যে মধ্যে তাদের ডেকে আমি আলাপ করতাম।

দেখতাম তারা আমার সম্বন্ধে বলাবলি করছেঃ 'এই ফিরিঙ্গি সাহেব আমাদের দেশের অনেক ব্যাপার জানে, কারণ অনেক দিন ধরে এখানে আছে। সাহেব জানে যে আমরা হলাম ওদের দেশের পাদ্‌রীদের মতো[১]।'

যা হোক, এই সাধু ফকির সম্বন্ধে অনেক কথা বললাম। এখন হিন্দুদের শাস্ত্র সম্বন্ধে দু-চার কথা বলবো।

হিন্দুশাস্ত্রের কথা

আমি সংস্কৃত ভাষা জানি না। ভারতে সংস্কৃত ভাষা দেবভাষা বা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভাষা। সেই ভাষা সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি বলে বিস্মিত হবেন না। আমার আগা সাহেব, দানেশমন্দ্র খান, অনেকটা আমার অনুরোধে এবং অনেকটা নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য শাস্ত্র অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে একজন বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিত নিয়োগ করেছিলেন। এরকম সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তখন ভারতে খুবই কম ছিলেন। আগে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা শিকোর অধীনে এই পণ্ডিত কাজ করতেন।[২] এই পণ্ডিত মহাশয়ের সাহচার্যে প্রায় তিন বছর কাটিয়েছি এবং তিনিই আমাকে অন্যান্য পণ্ডিতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আগা সাহেবের সঙ্গে উইলিয়াম হার্ভে ও জেন পেকেতের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্বন্ধে, অথবা গ্যাসেন্ডি (Gassendi) ও দেকার্তের দর্শন সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আমার আলোচনা হতো।[৩] আগার জন্য আমি তাঁদের রচনা পার্সী ভাষায় অনুবাদ করতাম। প্রায় পাঁচ বছর খান সাহেবের কাছে থেকে এই অনুবাদের কাজই করতে হয়েছে আমাকে। খান সাহেবের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শন নিয়ে আমার রীতিমতো তর্ক-বিতর্ক হতো। তারই ফাঁকে ফাঁকে আমরা পণ্ডিত মশাইকে ডাকতাম এবং হিন্দুশাস্ত্রের কথা ব্যাখা করতে বলতাম। পণ্ডিত মশাই এমন গম্ভীর হয়ে শাস্ত্রকথা আলোচনা করতেন যে, অনেক সময় আমাদের হাসি পেতো। অথচ শাস্ত্রলোচনার সময় তিনি একটুও হাসতেন না। আমাদের কাছে তার ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা প্রায়ই নীরস মনে হতো।

হিন্দুদের বিশ্বাস, স্বয়ং ভগবান তাদের জন্য চারখানা শাস্ত্রগ্রন্থ আদিতে

---

১. পর্তুগীজ শব্দ 'পাদ্‌রী' প্রথমে রোমান পুরোহিতদের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হতো। পরে ভারতের খ্রিস্টান পুরোহিতদের সকলকে 'পাদ্‌রী' বলে অভিহিত করা হয়।—অনুবাদক।

২. দারা শিকো যখন বারাণসীতে ছিলেন তখন সেখানকার বিখ্যাত হিন্দু পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি সংস্কৃত 'উপনিষদ' পার্সী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। সেই পার্সী অনুবাদ থেকে পরে আবার লাতিন ভাষায় উপনিষদ অনুবাদ করা হয়।—অনুবাদক।

৩. উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) ১৬১৬ সালে লন্ডনে চিকিৎসামণ্ডলীর কাছে তাঁর রক্ত চলাচলের (Blood Circulation) যুগান্তকারী তত্ত্বকথা প্রচার করেন। জাঁ পেকেতেও হার্ভের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। এ সময় ফ্রান্সের বিখ্যাত বস্তুবাদী দার্শনিক দেকার্তের আবির্ভাব হয়।—অনুবাদক।

সৃষ্টি করেছিলেন– তার নাম 'বেদ'। বেদ বা জ্ঞান; বেদ অধ্যয়ন করলে সর্ব-বিদ্যাবিশারদ হওয়া যায়। যা বেদে নেই, তা অন্য কোথাও নেই। প্রথম বেদের নাম 'অথর্ববেদ', দ্বিতীয় বেদের নাম 'যজুর্বেদ'; তৃতীয় বেদের নাম 'ঋকবেদ্'; এবং চতুর্থ বেদের নাম 'সামবেদ।'[৪]

বেদে আছে, মানুষ নানা জাতিতে বিভক্ত হয়ে যাবে, তার মধ্যে প্রধান জাতি হবে চারটি।* প্রথম ও শ্রেষ্ঠ জাতি হলো 'ব্রাহ্মণ', যারা শাস্ত্র ব্যাখা করে; দ্বিতীয় জাতি হলো 'ক্ষত্রিয়' যারা যুদ্ধ-বিগ্রহ করে; তৃতীয় জাতি হলো 'বৈশ্য' যারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে, এবং সাধারণত 'বেনিয়া' বলে পরিচিত; চতুর্থ জাতি হলো 'শূদ্র' যারা কারিগর মজুর ও দাস। এই সব জাতির মধ্যে কোনো সামাজিক লেনদেনের সম্পর্ক নেই, এক জাতির লোক অন্য জাতিতে বিবাহাদি করতে পারবে না। কোনো ব্রাহ্মণ কোনো ক্ষত্রিয়কে বিয়ে করতে পারবে না। এই বিধিনিষেধ অন্যান্য প্রত্যেক জাতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।[৫]

হিন্দুরা অনেকটা পিথাগোরীয়ানদের মতো আত্মার অবিনশ্বরতা, দেহাতীত সত্তায় বিশ্বাস করে। তার জন্য সাধারণত তারা জীবজন্তু হত্যা করা বা ভক্ষণ করা পছন্দ করে না। এটা অবশ্য মোটামুটি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা অন্যান্য জাতির মানুষরা জীবজন্তু হত্যা করতে বা ভক্ষণ করতে পারে। তবে তাদের ক্ষেত্রেও গোহত্যা করা মহাপাপ। সর্বশ্রেণির হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে গুরুর প্রতি। প্রায় দেবতার মতো গরুকে ভক্তি করে। তার কারণ তাদের ধারণা, ইহলোক থেকে পরলোক যাত্রার সময় গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। যে গরুর লেজ ধরে বৈতরণী পার হতে হবে। সেই গরুকে পারের কাণ্ডারী ভগবানের মতো ভক্তি না-করা অন্যায়। বোধ হয়, প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রকাররা রাখাল বালকদের এভাবে মিসরের নীলনদ পার হতে দেখেছিলেন, এক হাতে গরুর লেজ আর অন্য হাতে লাঠি নিয়ে। সেই সুদূর অতীতের স্মৃতি তারা এভাবে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। অথবা এমনও হতে পারে, গরুর উপকারিতার জন্য হিন্দুরা তাকে এই চোখে দেখে। গরুর দুধ-ঘি-মাখন জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করে,

---

৪. বার্নিয়ারের বেদের ক্রমভাগ ভুল। 'ঋকবেদ' সবচেয়ে প্রাচীন, তারপর যুজর্বেদ, সামবেদ এর্ব সবশেষে অথর্ববেদ রচিত হয়েছে বলে এখন পণ্ডিতেরা মনে করেন।–অনুবাদক।

* বার্নিয়ার 'tribus' বা 'tribe' কথা ব্যবহার করেছেন 'জাতি-অর্থে 'caste' কথা ব্যবহার করেননি। পর্তুগীজ 'casta' থেকে 'caste' কথা এসেছে এবং জাতিঅর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।–অনুবাদক।

৫. বার্নিয়ারের এই জাতিপরিচয় তাঁর অসাধারণ বোধশক্তির আর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতের সংস্কৃত ব্যাখার পার্সী অনুবাদ থেকে মুখে শুনে, ভারতীয় সমাজের পরিচয় এভাবে লিপিবদ্ধ করে যাওয়া যে কঠিন, তা আজ আমরা ঠিক বোঝাতে পারবো না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রি, বৈশ্য, শূদ্র ইত্যাদি কথা যেভাবে বার্নিয়ার ভাষান্তরিত করেছেন তা যথাক্রমে এই : Brahmens, Quetterys, Bescue, Seydra.–অনুবাদক।

গরু দিয়ে হালচাষ করে ফসল ফলাতে হয়, অর্থাৎ গরু জীবন দান করে। সুতরাং জীবনীশক্তির উৎস হলো ভগবান। এ ছাড়া আরও একটা বিষয় বিবেচনা করা দরকার। ভারতে উত্তম চারণভূমির খুব অভাব। তার জন্য গো-মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করা খুব বেশি সম্ভব নয়। সেই জন্য হয়তো গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়েছে, এমনও হতে পারে।[৬] ফ্রান্স, ইংল্যান্ড বা অন্যান্য দেশের মতো যদি ভারতে গোহত্যা করা হতো, তাদের দেশের চাষবাসে রীতিমতো সঙ্কট দেখা দিতো।

গ্রীষ্মকালে ভারতে উত্তাপ এতো বেশি হয় যে, মাঠের গাছপালা সব শুকিয়ে পুড়ে যায় এবং গরু-বাছুরের খাদ্য বলে কোথাও কিছু থাকে না। প্রায় আট মাসকাল গ্রীষ্ম থাকে এবং এই সময় গরু-বাছুর খাদ্যাভাবে মাঠে-জঙ্গলে যা খুশি আবর্জনা খেয়ে শুকরের মতো বেঁচে থাকে। গবাদি পশুর অভাবের জন্যই সম্রাট জাহাঙ্গীর একসময় কিছুদিনের জন্য ফরমান জারি করে গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় হিন্দুরা এই মর্মে আবেদন করেছিল। আবেদনপত্রে তারা জানিয়েছিল যে, গত পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে দেশের বনজঙ্গলের এতো দ্রুত অবনতি হয়েছে যে, গরু-বাছুর অত্যন্ত দুর্লভ হয়ে গেছে।

হিন্দু শাস্ত্রকাররা গোহত্যা বা মাংসাদি ভক্ষণ নিষিদ্ধ করার সময় হয়তো ভেবেছিলেন যে, এই নিষেধাজ্ঞার ফলে মানুষের উপকার হবে এবং লোকচরিত্রের উন্নতি হবে। জীবজন্তুর প্রতি যদি তাদের করুণার উদ্রেক করা যায়, তাহলে মানুষের প্রতি মানবতাবোধও জাগ্রত থাকবে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক মানবিক হবে। তা ছাড়ার আত্মার অবিনশ্বরতায় বিশ্বাসের ফলে কোনো জীবজন্তু হত্যা করাকে তারা পিতৃপুরুষ হত্যার সামিল মনে করে। তার চেয়ে ঘোরতর অপরাধ আর কি হতে পারে? এমনও হাতে পারে, ব্রাহ্মণ শাস্ত্রকাররা বুঝেছিলেন যে, ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে মারাত্মক অনিষ্টকর। সে জন্যও হয়তো তারা গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ বলে জারি করেছিলেন।

বেদের বিধান অনুযায়ী প্রত্যেক হিন্দুর কর্তব্য হলো, প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তিনবার পুব দিকে মুখ করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা। সকালে একবার, দুপুরে একবার, রাত্রে একবার। তিনবার গোসল করাও কর্তব্য; অন্তত মধ্যাহ্নভোজনের আগে একবার তো নিশ্চয়ই। গোসল করতে

---

৬. গোহত্যা, গোমাংস ভক্ষণ বা শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই চমৎকার ব্যাখ্যা তাঁর অনুসন্ধানী মনের পরিচায়ক। সাধারণ বিদেশীদের মতো তাঁর রচনার মধ্যে কোনো তাচ্ছিল্যের ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি। আন্তরিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিটি আচার-ব্যবহার বুঝতে চেষ্টা করেছেন।—অনুবাদক।

হলে বদ্ধ পানিতে গোসল না করে, স্রোতের পানিতে গোসল করাই শ্রেয়। এখানেও দেখা যায়, দেশের ভৌগোলিক পরিবেশের প্রতি শাস্ত্রকারদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শীতপ্রধান দেশের মানুষজন সহজেই বুঝতে পারবেন, এই ধরনের শাস্ত্রীয় বিধান যদি তাদের ওপর প্রয়োগ করা হতো, তাহলে তাদের কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হতো। অথচ আমি দেখেছি, ভারতের লোক এই শাস্ত্রীয় বিধান বর্ণে বর্ণে পালন করে, নদ-নদীর স্রোতের পানিতে গোসল করে এবং যেখানে কাছাকাছি কোনো নদী নেই, সেখানে কলসী বা অন্য পাত্রে পানি নিয়ে মাথার ঢালে।

মধ্যে মধ্যে আমি তাদের এই শাস্ত্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতাম এবং বলতাম যে, শীতপ্রধান দেশে এ বিধান মেনে চলা সম্ভব নয়। সুতরাং বেশ পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এর মধ্যে ধর্মের ব্যাপার কিছু নেই; এ হলো একেবারে নিছক স্বাস্থ্যের বিধান।

আমার এই অভিযোগের উত্তরে তারা বলেছেঃ "আমরা কি কোনোদিন বলেছি যে, আমাদের শাস্ত্রের বিধান অন্যান্য সকল দেশের সকল জাতের লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? তা তো আমরা বলিনি! ভগবান শুধু আমাদের দেশের লোকের জন্যই এই সব শাস্ত্রীয় বিধান রচনা করেছেন, বিধর্মী বিদেশীদের জন্য নয়।"

"আমরা কোনোদিন এমন কথাও বলিনি যে, তোমাদের ধর্ম মিথ্যা। তোমাদের ধর্ম তোমাদের– আমাদের ধর্ম আমাদের। তোমাদের যা প্রয়োজন ঠিক সেভাবে তোমাদের ধর্মশাস্ত্র তৈরি হয়েছে। ভগবান ধর্মাচরণের বিভিন্ন পন্থা দেখিয়ে দিয়েছেন। যে কোনো পথ ধরে স্বর্গে যাওয়া যায়!"

এরপর আমার পক্ষে উত্তর দেয়া মুশকিল হলো। আমি কিছুতেই তাদের বোঝাতে পারলাম না যে, আমাদের খ্রিস্টধর্ম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য এবং হিন্দুদের ধর্ম শুধু ভারতের জন্য। এ কথা কিছুতেই তাদের যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে পারলাম না।

বেদের শিক্ষা হলো– ভগবান এই পৃথিবী সৃষ্টি করবেন বলে সঙ্কল্প করলেন, কিন্তু প্রথমে তিনজন অবতার সৃষ্টি করলেন তার জন্য। একজন ব্রহ্মা, যিনি সর্বভূতে বিরাজমান; একজন বিষ্ণু এবং একজন মহাদেব। ব্রহ্মাকে দিলেন তিনি সৃষ্টির দায়িত্ব। বিষ্ণুকে দিলেন পালনের দায়িত্ব এবং মহাদেবকে দিলেন সংহারের দায়িত্ব। ব্রহ্মা হলেন সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালনকর্তা এবং মহাদেব ধ্বংসের দেবতা। ভগবানের আদেশে ব্রহ্মাই চতুর্বেদ সৃষ্টি করলেন এবং নিজেও সেই জন্য চতুর্মুখ হলেন।

ইউরোপীয় পাদ্‌রী সাহেবদের সঙ্গে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। তারা বলেন যে, এই ত্রয়ীর কল্পনা হিন্দুধর্মের একটি অন্যতম বিশেষত্ব।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় রহস্যাবৃত, কিন্তু তা নয়। তিনজন যদিও স্বতন্ত্র সত্তাবিশিষ্ট, তাহলেও তারা আসলে এক ও অভিন্ন। এই বিষয় হিন্দু পণ্ডিতদের সঙ্গেও আলোচনা করে দেখেছি, তারা এমন ভাষায় ব্যাখা করেন যে, তা থেকে তাদের পরিষ্কার মতামত কি তা জানা যায় না।[৭] তারা বলেন, তিনজন একই ভগবানের অংশবিশেষ এবং তাঁরা দেবতা। কিন্তু 'দেবতা' বলতে তারা ঠিক কি বোঝেন, তা বলা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিত যাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি তারাও ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন যে, তিনজন একই দেবতা, শুধু তিন রূপে কল্পনা করা হয়েছে মাত্র। একজন সৃষ্টিকর্তা, একজন ত্রাণকর্তা, একজন সংহারকর্তা।

আমার সঙ্গে রেভারেন্ড রোয়া বা রথের পরিচয় ছিল। জার্মান জেসুইট ফাদার রথ আগ্রায় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁর মতো পণ্ডিত বিদেশীদের মধ্যে তখন কেউ ছিলেন কি-না সন্দেহ। তিনি বলেন যে, এক দেবতার তিন রূপের কল্পনা নয় শুধু, দ্বিতীয়জনের অর্থাৎ বিষ্ণুর আবার দশাবর্তার রূপ আছে। এই দশ অবতার রূপ সম্বন্ধে যেটুকু তিনি হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে এবং অন্যান্য পাদ্‌রীদের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন, তা আমাকে বললেন।

পৃথিবীতে একেবার সঙ্কট দেখা দিয়েছে, ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে পৃথিবী। যতোবার এরকম যুগসঙ্কট দেখা দিয়েছে, ততোবার দেবতা বিষ্ণু বিভিন্ন অবতারের রূপ ধরে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং মানুষকে সঙ্কট থেকে মুক্তি দিয়েছেন। একরম ন'বার সঙ্কট দেখা দিয়েছে এবং ন'বার বিষ্ণু নয় অবতারের রূপে আবির্ভূত হয়েছেন মানুষের মুক্তি জন্য।[৮]

বিষ্ণুর অষ্টম অবতার রূপে আবির্ভাবের কাহিনী সবচেয়ে রোমাঞ্চকর (কৃষ্ণাবতার)। পৃথিবীতে দৈত্যদানবের প্রতিপত্তি যখন খুব বেড়ে গেলো, তখন এক কুমারীর গর্ভে মধ্যরাতে বিষ্ণু অবতার রূপে জন্ম নিলেন। দেবদূতরা তাঁর

---

৭. মুইর তাঁর 'Original Sanskrit Texts' এর মধ্যে এ সম্বন্ধে যা উদ্ধৃত করেছেন তা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

'I Shall declare to thee that form compose of Hari and Hara (Vishnu and Mahadeva) Combined, Which is without beginning middle or end, imperishable, undecaying, He Who is vishnu is Rudra; he who is Rudra is pitamaha (Braham); the substance is one, the gods are three : Rudra, Vishnu and pitamaha'—Muir's original sanskrit Texts. Vol' IV.p.237–অনুবাদক।

৮. বার্নিয়ারের 'অবতার' সম্বন্ধে আলোচনা পড়ে পাঠকরা কৌতুক বোধ করবেন। কিন্তু একজন বিদেশী বিভাষী পর্যটকের পক্ষে এতো গভীরভাবে হিন্দুধর্মের মর্মকথা উপলব্ধি করার চেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় আছে, তা সত্যই অতুলনীয়।

অনেক বিষয়ে বার্নিয়ারের ধারণা অস্পষ্ট হলেও, তিনি যে হাস্যকর বিপরীত ধারণা করেছিলেন, তা নয়। তাঁর ধারণার অনেকটাই সত্য। ঠিক যে তিনি বুঝতে পারছেন না, এ-সম্বন্ধে সচেতন হয়েই তিনি লিখেছেন।–অনুবাদক।

আবির্ভাবে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্যোৎসব করলেন। সারারাত ধরে আকাশ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হলো। কাহিনীর সঙ্গে খ্রিস্টানদের পৌরাণিক কাহিনীর বেশ সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। যা হোক, কাহিনীটা বলি:

অবতার রূপে ভূমিষ্ট হয়ে, দানবের সঙ্গে যুদ্ধে রত হলেন বিষ্ণু। দানবের বিশাল মূর্তি আকাশের সূর্যকে আচ্ছাদন করে ফেললো। অন্ধকার হয়ে গেলো পৃথিবী। বিষ্ণুর অবতার তাকে বধ করলেন। যখন দানব ভূপৃষ্টে আছাড় খেয়ে পড়লো তখন সারা পৃথিবী কেঁপে উঠলো। দৈত্য মাটি ফুঁড়ে নরকে প্রবেশ করলো। অবতার আবার উর্ধ্বে স্বর্গে চলে গেলেন।

হিন্দুরা বলে, বিষ্ণুর দশম অবতার মুসলমান যবনদের হাত থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য অবতীর্ন হবেন। এ কথা শাস্ত্রে লেখা নেই অবশ্য, এমনি প্রচলিত কিংবদন্তী।

হিন্দুরা বলে, তৃতীয় দেবতা মহাদেবেরও পৃথিবীতে আবির্ভাবের কাহিনী আছে। কাহিনীটি এই :

এক রাজার এক কন্যা ছিল। কন্যা যখন বিয়ের যোগ্য হলো তখন রাজা একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি রকম পতি সে বরণ করতে চায়। কন্যা উত্তর দিলো, দেবতা ছাড়া অন্য কাউকে সে পতিরূপে বরণ করবে না। কন্যার এই উত্তর শুনে মহাদেব অগ্নিরূপে আবির্ভূত হলেন এবং রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী হলেন। রাজা তার কন্যাকে মহাদেবের প্রস্তাবের কথা জানালেন এবং কন্যাও বিনা দ্বিধায় সম্মতি জানালো। মহাদেব অগ্নিরূপেই রাজসভায় উপস্থিত হলেন এবং যখন দেখলেন যে সভাসদরা বিবাহের বিরোধিতা করছেন, তখন তিনি তাদের দাড়িতে প্রথম আগুন ধরিয়ে দিলেন। তারপর তাদের দগ্ধ করে ভস্ম করলেন। রাজকন্যার সঙ্গে মহাদেবের বিয়ে হলো।[৯]

বিষ্ণুর অবতার সম্বন্ধে হিন্দুরা বলে যে, প্রথমে বিষ্ণু সিংহ রূপ ধারণ করেছিলেন। দ্বিতীয় রূপ বরাহের (শূকর), তৃতীয় কূর্মের (কচ্ছপ), চতুর্থ নাগের (সাপ), পঞ্চম হ্রস্বকায় বামনের, ষষ্ঠ নরসিংহের, সপ্তম ড্রাগনের, অষ্টম কৃষ্ণের, নবম হনুমানের এবং দশম বীর ঘোড়সওয়ার।[১০]

---

৯. গিরিরাজ হিমালয়দুহিতা উমার সঙ্গে মহাদেবের শুভমিলনের উপভোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন বার্নিয়ার।–অনুবাদক।

১০. বার্নিয়ার অনেক চেষ্টা করে বিষ্ণুর দশাবতার রূপ সম্বন্ধে যা নিজে বুঝেছেন, তাই বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাটি উপভোগ্য হলেও যথার্থ নয়। কিন্তু তাহলেও তিনি যে অনেকটা নির্ভুল বর্ণনা দিয়েছেন তাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। বিষ্ণুর 'দশাবতার' রূপের এই সংস্কৃত শ্লোকটির সঙ্গে অনেকেই পরিচিত :

মৎসঃ কূর্মো, বরাহশ্চ নরসিংহহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কীতি তে দশ।

রেভারেন্ড রথ যে বেদজ্ঞ পণ্ডিত এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে তিনি যা বলেছেন তা যে সত্য, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। তাঁরই কাছ থেকে শোনা পুরাণ কাহিনী আমি এখানে বর্ণনা করেছি। এ বিষয়ে অনেক বেশি লিখে ফেলছি আমি, এবং হিন্দু দেবদেবী বা দেবমূর্তি যা তাদের দেবালয়ে দেখেছি, তা স্কেচ করে নিয়েছি। শুধু তাই নয়, তাদের দেবভাষা যে সংস্কৃতভাষা, তাও আমি নক্‌শা করে নিয়েছি। ফাদার কার্কারের (Father Kirker) -China Illustrata গ্রন্থে এসব লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[১১] এখানে তার পুনরাবৃত্তি আর করবো না। ফাদার রথ যখন রোমে ছিলেন তখন কার্কার তাঁর কাছ থেকে অনেক মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন। আমার মনে হয়, সেই বইটি যদি একবার আপনি পড়েন তাহলে অনেক কথা জানতে পারবেন।

'অবতার' সম্বন্ধে একটি কথা এখানে বলে শেষ করি। ফাদার রথ যেভাবে 'অবতার' কথার প্রয়োগ ও ব্যাখা করেছিলেন, তা আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। একদল পণ্ডিত 'অবতার' কথার এই ভাবে ব্যাখা করেছিলেনঃ দেবতারা বিভিন্ন অবতারের রূপ ধরে মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হন এবং নানারকম দৈবশক্তি ও কার্যকলাপের পরিচয় দিয়ে বিদায় নেন।

অন্য পণ্ডিতেরা বলেনঃ "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব ও বীর যারা তাদের মৃত্যুর পর আত্মা অন্য কোনো দেহের ভেতর আশ্রয় নেয়। তখন সেই আত্মার সংস্পর্শে সেই দেহ ঐশ্বরিক রূপ ধারণ করে। মহামানবদের আত্মা এভাবে যখন ভিন্ন দেহান্তর্গত হয়, তখনই সে দেবতার রূপ ধারণ করে। আত্মার সঙ্গে দেবতার যে একটা সম্পর্ক আছে এ কথা হিন্দুরা যেভাবেই হোক, স্বীকার করে। মানবাত্মা দেবতারই অংশবিশেষ, এই হলো হিন্দুদের ধারণা।

কোনো কোনো পণ্ডিত অবতারবাদের আরও সূক্ষ্ম জটিল ব্যাখা করেন। তারা বলেন, দেবতার বিভিন্ন অবতারের কল্পনা তাঁর বিভিন্ন গুণাগুণ প্রকাশের

—অর্থাৎ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নরসিংহ, বামন, রাম (পরশুরাম), রাম (দাশরথি রাম), রাম (বলরাম), বুদ্ধ ও কল্কি—এই হলো বিষ্ণুর দশাবতার।–অনুবাদক।

১১. ফাদার কার্কারের China Illustrata গ্রন্থ ১৬৬৭ সালে আমস্টার্ডামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের মধ্যে সংস্কৃত অক্ষরের পুরো পাঁচ পৃষ্ঠা তাম্রখোদাই প্রতিলিপি ছাপা হয়। ইউরোপে সংস্কৃত অক্ষর প্রথম মুদ্রিত হরফে এই গ্রন্থেই ছাপা হয়। তার আগে আর-কোনো গ্রন্থে মুদ্রিত হরফে সংস্কৃত ভাষা রূপায়িত হয়নি। হবার কথাও নয়, কারণ ১৬৬৭ সালে মুদ্রণের সামান্য প্রচলন হয়েছিল মাত্র। আমাদের দেশে তখনও মুদ্রণ ও মুদ্রিত হরফে বই ছাপা আরম্ভ হয়নি। সুতরাং China Illustrata গ্রন্থের এই পাঁচ পৃষ্ঠা সংস্কৃত মুদ্রিত হরফের তাম্রখোদাই প্রতিলিপি হলো সারা পৃথিবীর মধ্যে প্রথম প্রকাশিত সংস্কৃত মুদ্রিত হরফের নমুনা। পাদ্‌রী কার্কার উর্জবুর্গ 'Wurtzburg বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্যভাষার (Oriental Languages) অধ্যাপক পদে নিযুক্ত ছিলেন। বিদেশী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে ফাদার কার্কার আদিযুগের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত।–অনুবাদক।

কৌশল মাত্র। অবতার কথার এ ছাড়া কোনো শব্দগত আভিধানিক অর্থ নেই। আধ্যাত্মিক অর্থে অবতার কথার তাৎপর্য বুঝতে হবে। খুব বিচক্ষণ পণ্ডিতের মধ্যে কেউ কেউ বলেন যে, অবতারের কল্পনার মতো আজগুবি কল্পনা আর হতে পারে না। শাস্ত্রকাররা এইসব আজগুবি কৌশল উদ্ভাবন করেছিলেন সাধারণ মানুষকে ধর্মের আওতার মধ্যে রাখার জন্য।

তারা বলেন, মানুষের আত্মা যদি দেবতার অংশবিশেষ হয় তাহলে অবতারের সমস্ত কল্পনা অর্থহীন হয়ে যায় এবং ব্যাপারটা এই দাঁড়ায়, যেনো আমরাই আমাদের পূজার্চনার জন্য নানারকম ধর্মশাস্ত্র রচনা করেছি, দেবদেবীর কল্পনা করেছি। তা হয় না। অবাস্তব কথা ও অর্থহীন যুক্তি।

পাদ্‌রী কার্কার ও রথের কাছে হিন্দুধর্মের এই বিবরণের জন্য যেমন আমি বিশেষভাবে ঋণী, তেমনি মঁশিয়ে লর্ড ও আব্রাহাম রোঁদারের কাছেও আমার ঋণ কম নয়।[১২] এই পাদ্‌রী পণ্ডিতদের মূল্যবান গ্রন্থাদি থেকে ভারতের সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উপকরণ আমি সংগ্রহ করেছি, কিন্তু তাঁরা যতোটা পরিশ্রম করে ও ধৈর্য ধরে সেগুলোর সুবিন্যস্ত বিবরণ দিয়েছেন, আমার পক্ষে তা দেয়া সম্ভব হবে না। এখানে তাঁদের সেই বিবরণ থেকে আমি যতোটা সম্ভব হিন্দুদের বিদ্যা ও বিজ্ঞান চর্চা সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটা কথা বলবো।

সংস্কৃত চর্চা ও কাশীধামের কথা

গঙ্গা নদীর তীরে কাশী। যেমন তার প্রাকৃতিক অবস্থান, তেমনি মনোরম পরিবেশ। এই কাশী বা বারাণসীই হলো হিন্দুদের সংস্কৃতবিদ্যা ও শাস্ত্রচর্চার প্রধান কেন্দ্র 'It is the Athens of India, Whither resort the Brahamns and other devotees, Who are the only persons who apply their minds to study.' এই বারাণসীই হলো ভারতবর্ষে এথেন্স। এই বারণাসীতে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ভক্তদের সমাগম হয়। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের সমাগমতীর্থ। ব্রাহ্মণরাই মনপ্রাণ দিয়ে শাস্ত্র অধ্যায়ন করে।

শহরের মধ্যে আমরা কলেজ বা স্কুল বলতে আজকাল যা বুঝি, তা নেই। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় থাকে, তার অধীন স্কুল-কলেজ থাকে, তেমন কিছু নেই

---

১২. সুরাটের চ্যাপলেন ছিলেন হেন্‌রী লর্ড। তিনি এসব বিষয়ে কয়েকটি বইও লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো : (ক) A Display of two Forraingne sects in the East Indies; (খ) A Discoverie of the Sect of the Banians; (গ) The Religion of the persees (Imprinted London for Francis Constable, and are to be sold at his shoppe in paul'ea churchyard, at the signe of crane, 1630)
আব্রাহাম রোজার পুলিকাটের প্রথম ডাচ চ্যাপলেন ছিলেন (১৬৩১-১৬৪১ সাল)। ভারতের আদি ডাচ উপনিবেশের গির্জার প্রথম চ্যাপলেন রোজারও ধর্মবিষয়ে বই লিখেছিলেন। ১৬৪৯ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বই প্রকাশিত হয়।–অনুবাদক।

বারাণসীতে। বিদ্যালয় যা আছে তা প্রাচীন যুগের বিদ্যালয়ের মতো। গুরুমশাই ও শিক্ষকরা শহরের বিভিন্ন স্থানে বা শহরের বাইরে থাকেন এবং প্রধানত বণিকরাই থাকেন শহরের মধ্যে। গুরুমশায়ের কাছে থেকে ছাত্ররা বিদ্যাভ্যাস করে। সব গুরুমশায়ের ছাত্র-সংখ্যা সমান নয়। কারো ছাত্রসংখ্যা মাত্র চারজন, কারো পাঁচ-ছয়জন, আবার কারো বারো কি পনেরোজন। তার বেশি ছাত্র কারো নেই। ছাত্ররা সাধারণত দশ বছর থেকে বারো বছর পর্যন্ত গুরুর কাছে থাকে এবং সেই সময় গুরুমশাই তাদের ধীরে ধীরে নানা শাস্ত্রে শিক্ষাদান করেন। ধীরেসুস্থে শিক্ষা দেন, তার কারণ সাধারণত দেখা যায় গুরুমশাইরা খুব যে পরিশ্রমী ও কর্মতৎপর, তা নন। ধীরেসুস্থে মন্থরগতিতে তারা সব কাজকর্ম করেন। এর কারণ বোধ হয় তাদের বিশেষ খাদ্য এবং গ্রীষ্মের প্রাবল্য। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের উত্তাপের মধ্যে ঐ ধরনের খাদ্য খেয়ে, খুব বেশি কাজকর্ম করা যায় বলে মনে হয় না।

ছাত্রদের মধ্যে কোনো পরীক্ষালব্ধ সম্মান বা কৃতিত্বের জন্য কোনো প্রতিযোগিতা রেষারেষি বলে কিছু নেই, যেমন আমাদের দেশের ছাত্রদের মধ্যে আছে। শিক্ষার্থীরা সেইজন্য গুরুমশায়ের কাছ থেকে শান্ত সংযতভাবে বিদ্যাভ্যাস করতে পারে এবং অধ্যয়ন ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ের প্রতি তাদের মন আকৃষ্ট হয় না। স্থানীয় ধনিক ও বণিকরাই সাধারণত তাদের ভোজ্য দ্রব্যাদি পাঠিয়ে দেন এবং তারা খিচুড়ির মতো খুব সাদাসিধে খাদ্য পেলেই খুশি হয়।

প্রথমে শিক্ষা দেয়া হয় সংস্কৃতভাষা। এই সংস্কৃতভাষা নাকি এই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ছাড়া অন্য কেউ ভালো জানে না এবং ভারতবর্ষের লোক যে ভাষায় বাক্যালাপ করে তার সঙ্গে এই ভাষার কোনো সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। এই সংস্কৃতভাষার অক্ষরই প্রথম পাদ্‌রী কার্কার মুদ্রিতরূপে প্রকাশ করেন, পাদ্‌রী রথের সাহায্যে।

'সংস্কৃত' কথার অর্থ হলো যা অমার্জিত বা রূঢ় নয়, অর্থাৎ যা পরিমার্জিত ও পরিশুদ্ধ এ রকম একটি ভাষা। হিন্দুদের বিশ্বাস, ভগবান ব্রহ্মা প্রথমে চতুর্বেদ সৃষ্টি করেন যে ভাষায়, সেই ভাষা হলো সংস্কৃতভাষা। সে জন্য সংস্কৃভাষা হিন্দুরা দেবভাষা ও বিশুদ্ধ পবিত্র ভাষা বলে মনে করেন। তাদের ধারণা, ব্রহ্মার মতোই এই সংস্কৃত ভাষা অনাদি ও অনন্ত। ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে এরকম আজগুবি কথায় অবশ্য বিশ্বাস করা যায় না। সংস্কৃতভাষা যে প্রাচীন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, সংস্কৃতভাষায় রচিত হিন্দুদের শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে রীতিমতো প্রাচীন গ্রন্থও অনেক আছে। দর্শনশাস্ত্র, আয়ুর্বেদশাস্ত্র এবং অন্যান্য আরোও অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ সংস্কৃতভাষায় রচিত হয়েছে। কাশীতে এই সব সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের বিশাল একটি পাঠাগার দেখেছি।

শিক্ষার্থীরা সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা পারদর্শী হবার পর 'পুরাণ' পাঠ করে। সংস্কৃত ব্যাকরণে বেশ খানিকটা দখল না থাকলে 'পুরাণ' পাঠ করা বা অর্থ বোঝা সম্ভব নয়। বেদের সারকথা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে পুরাণের মধ্যে বলা হয়েছে।*

বেদ বিরাট গ্রন্থ। অন্তত আমি যে বেদ কাশীতে দেখেছি তা সত্যিই যদি বেদ হয়, তাহলে তার বিরাটত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নেই। 'বেদ' এতো দুষ্প্রাপ্য ও দুর্লভ্য গ্রন্থ যে, আমার আগা দানেশমন্দ খান অনেক চেষ্টা করে এক কপিও সংগ্রহ করতে পারেননি। হিন্দুরা বেদ বা অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অত্যন্ত সাবধানে লুকিয়ে রেখে দেয়, কারণ তাদের ধারণা মুসলমানরা জানতে পারলে সব পুড়িয়ে নষ্ট করে ফেলবে।

পুরাণপাঠ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীরা দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ করে। দর্শনশাস্ত্র খুব তাড়াতাড়ি আয়ত্তে আনা রীতিমতো কষ্টসাধ্য। তার ওপর স্বভাব-শৈথিল্যও শিক্ষার অগ্রগতির পথে অন্যতম অন্তরায়। ইউরোপীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বা শিক্ষক-অধ্যাপকরা যেরকম তৎপর, ভারতের টোলের গুরুমশাই বা ছাত্ররা ততোটা নন। তার কারণ আগেই বলেছি। সর্বক্ষেত্রে এখানকার গতিটাই মন্থর।

ভারতবর্ষে যে সব খ্যাতনামা দার্শনিকের আবির্ভাব হয়েছে তাদের মধ্যে ছয়জনের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ছয়জন দার্শনিকের অনুগামীদের নিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ছয়টি বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের পণ্ডিতরা মনে করেন, তাদের অনুসৃত দর্শনই অভ্রান্ত এবং একমাত্র সত্য দর্শন, বেদই তার উৎস।[১৩] এ ছাড়া আরও একটি সপ্তম ধর্মসম্প্রদায় আছে, তাদের 'বৌদ্ধ' (বার্নিয়ার ভাষায়– 'Baute') বলা হয়। বৌদ্ধরা নাকি আবার দ্বাদশটি শাখা-উপশাখায় বিভক্ত। যা হোক, এখন আর বৌদ্ধদের তেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি নেই, ভারতে সংখ্যাও তেমন বেশি নয়। বৌদ্ধধর্মালম্বীদের অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ভয়ানক উপেক্ষা করে এবং তাদের নাস্তিক ও ধর্মজ্ঞানহীন বলে ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। বৌদ্ধরা এখন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক বিচিত্র জীবন যাপন করছে।[১৪]

---

* পুরাণের সঙ্গে বেদের এই সম্পর্কের ব্যাখা ঠিক নয়।–অনুবাদক।

১৩. বার্নিয়ার এখানে ভারতবর্ষের'ষড়-দর্শনে'র কথা বলছেন। এই ষড় দর্শন হলো : সাংখ্য ও যোগদর্শন, বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শন, এবং বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শন। কপিল সাংখ্যের, পতঞ্জলি যোগদর্শনের, কর্ণাদ, বৈশেষিকের, গৌতম ন্যায়দর্শনের এবং বাদরায়ন বেদান্ত বা উত্তম-মীমাংসার, জৈমিনি মীমাংসা বা পূর্ব-মীমাংসার প্রতিষ্ঠাতা বলে কথিত।–অনুবাদক।

১৪. ভারতের বৌদ্ধদেব সম্বন্ধে বার্নিয়ারের এই মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে বৌদ্ধধর্মালম্বীরা কি অবস্থায় পৌছেছিলেন, বার্নিয়ারের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।–অনুবাদক।

প্রত্যেক দর্শনশাস্ত্রেরই মূল বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে এবং এক একজন শাস্ত্রকার তা এক-এক ভাবে করেছেন। কারো পদ্ধতি ও রীতির সঙ্গে অন্য কারো কোনো সম্পর্ক নেই। কেউ বলেন, প্রত্যেক বস্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পর্দাথ দিয়ে গঠিত। এই সব সূক্ষ্ম পর্দাথ অবিভাজ্য, তবে তা নীরেট বলে নয়, কণার মতো ক্ষুদ্রতম বলে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেক তত্ত্বকথার অবতারণা করেছেন শাস্ত্রকার, যা শুনলে ডেমোক্রিটাস (Democritus) ও এপিকিউরাসে (Epicurus) কথা মনে পড়ে। কিন্তু মতামতগুলো এমন শিথিল ও অসংলগ্ন ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, সব কথা, সব যুক্তিতর্কই নিতান্ত ভাসা-ভাসা মনে হয়। কোনো অর্থ বিশেষ বোধগম্য হয় না। আর পণ্ডিতরা এমন সংস্কারগ্রস্ত ও অজ্ঞ এসব বিষয়ে যে, এই দুর্বোধ্যতার জন্য কারা দায়ী, শাস্ত্রকাররা, না তাদের ভাষ্যকার এই পণ্ডিতেরা– তা সঠিক বলা যায় না।

কোনো দার্শনিক বলেন– উপাদান ও রূপ, এই নিয়েই জগৎ। এর বেশি কিছু তাদের বক্তব্যে বোঝা যায় না এবং কোনো পণ্ডিতই ব্যাখ্যা করে বোঝাতে চান না। উপাদানটা কি বস্তু এবং রূপই বা কি, তা তারা কখনো বুঝিয়ে বলবেন না। আমার মনে হয়, ভাষ্যকার পণ্ডিতরা এ সব কথার তাৎপর্য নিজেরা কিছু জানেন বা বোঝেন না। যদি জানতেন বা বুঝতেন, তাহলে আমাদের দেশের দার্শনিকদের মতো সেটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেন। উপাদান থেকে রূপের জন্ম–এ কথা বোঝাবার জন্য তারা কুম্ভকারের মৃৎপাত্রের দৃষ্টান্ত দেন। অর্থাৎ কুম্ভকার যেমন কাদামাটি থেকে মাটির পাত্রকে নানাভাবে রূপ দেয়, তেমনি বিশ্বের বাস্তব উপাদান থেকে নানা রূপ সৃষ্টি করেন ভগবান।

কেউ বলেন যে, শূন্য থেকে সবকিছুর উৎপত্তি এবং চারটি মৌলিক উপাদান দিয়ে সবকিছু গঠিত। কিন্তু শূন্যবাদ বা উপাদান রূপান্তর সম্বন্ধে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না। যে ব্যাখ্যা তারা দেন, তা কারো বোধগম্য হয় বলে মনে হয় না।

কেউ বলেন, আলোক ও অন্ধকারই আসল। কিন্তু এই আসল তত্ত্বের ব্যাখ্যা তারা যে ভাবে করেন তা সত্যিই হাস্যকর। এমন যুক্তিতর্কের সাহায্যে তারা তাদের প্রতিপাদ্য বোঝাতে চেষ্টা করবেন এবং এমন লম্বা বক্তৃতা দেবেন যে তার ভেতর থেকে কোনো সারবস্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অনেকে আবার সাধনা, তপস্যা, আত্মনিগ্রহ, উপবাস ইত্যাদির ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করেন যে, মনে হয় যেনো ঐগুলোই চরম সত্য। একটা দীর্ঘ তালিকা তারা আওড়ে যাবেন। এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে কোনো বিচক্ষণ শাস্ত্রকার এসব কথা শাস্ত্রগ্রন্থে বলে যাননি। এতো তুচ্ছ সব ব্যাপার নিয়ে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা কোনোকালে মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না।

অনেকে আবার এমন কথাও বলেন যে, সবই দৈব বা অদৃষ্টচক্র মাত্র। এ ছাড়া আর কোনো জীবনদর্শনে তারা বিশ্বাসী নন। তারাও এমন সব কথা বলবেন যা শুনলেই বোঝা যায় যে, কোনো শাস্ত্রকার কোনোকালে তা বলেননি।

এই সব দার্শনিক মতামত সম্বন্ধে পণ্ডিতরা বিশ্বাস করেন যে, এগুলো সনাতন। এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই। শূন্য থেকে সবকিছু সৃষ্টি বা উৎপত্তি হয়েছে, এ কথা প্রাচীন দার্শনিকদের মনে জাগেনি, হিন্দু দার্শনিকদের মনেও না। একজন হিন্দু দার্শনিক নাকি এ সম্বন্ধে চিন্তা করেছিলেন।[১৫]

হিন্দুদের চিকিৎসাবিদ্যা

শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে হিন্দুদের কয়েকখানি গ্রন্থ আছে; কিন্তু তার অধিকাংশই ওষুধ ও পথ্যের তালিকা ছাড়া আর কিছু নয়। শারীরবিদ্যার বা তত্ত্বের কোনো আলোচনা তার মধ্যে করা হয়নি। এ সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থখানি পদ্যে লেখা।

হিন্দুদের চিকিৎসা প্রথার সঙ্গে আমাদের প্রথার পার্থক্য অনেক। কয়েকটি মূল নীতির ওপর তাদের চিকিৎসাশাস্ত্রের ভিত্তি গঠিত। নীতিগুলো এই:

ক. রোগীর অসুখ হলে তার পুষ্টির কোনো প্রয়োজন নেই।
খ. অসুখের প্রধান চিকিৎসা হলো উপবাস।
গ. মাংসের ক্বথ ইত্যাদি রোগীর পথ্য নয়। অসুস্থ রোগীর এই জাতীয় পথ্য বিষবৎ বর্জনীয়।
ঘ. বিশেষ প্রয়োজন না হলে রোগীর দেহ থেকে রক্ত নেয়া উচিত নয়।

এই চিকিৎসা পদ্ধতি সঙ্গত কি না, এর কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না, তা বিচক্ষণ চিকিৎসকরা বিবেচনা করে দেখবেন। আমার বক্তব্য হলো, এই চিকিৎসা পদ্ধতি ভারতে বেশ ফলপ্রদ হয়েছে। শুধু হিন্দুর নয়, মোগল ও অন্যান্য মুসলমান চিকিৎসকরা এই একই পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করেন। উপবাস করতে হবে, এ কথা সকল শ্রেণির চিকিৎসকরাই স্বীকার করেন।

---

১৫. বার্নিয়ার এখানে সংক্ষেপে পূর্বোক্ত ষড় দর্শনের ব্যাখা করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক, ন্যায়, বেদান্ত ও মীমাংসাদর্শন যে এতো সহজেও সংক্ষেপে ব্যাখা করা যায় না, তা বলাই বাহুল্য। তবু সপ্তদশ শতাব্দীতে একজন বিদেশী পর্যটকদের পক্ষে হিন্দুদর্শনের নানা দিক সম্বন্ধে এতোখানি কৌতূহলী হয়ে তার মূল তত্ত্বকথা জানার চেষ্টা কম প্রশংসনীয় নয়। এর মধ্যে বার্নিয়ারের জাগ্রত অনুসন্ধানী মনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা শ্রদ্ধার যোগ্য। তাঁর ষড়-দর্শনের ব্যাখা অনেকটাই হাস্যকর বলে গণ্য হলেও তিনি আপন বুদ্ধি ও দৃষ্টি দিয়ে তার প্রত্যেকটি প্রদিপাদ্য বুঝতে চেষ্টা করেছেন।—অনুবাদক।

মোগল চিকিৎসকরা হিন্দুদের চেয়ে রোগীর দেহ থেকে রক্ত নিষ্কাশনের পক্ষপাতী বেশি বলে মনে হয়। মাথার অসুখ, লিভার বা কিড্‌নির কোনো অসুখের সম্ভাবন থাকলে তারা রোগীর দেহ থেকে রক্ত বার করে নেন। গোয়া বা প্যারিসের ডাক্তররা যেভাবে অস্ত্রস্বল্প করে নেন, মোগল চিকিৎসকরা তা করেন না।[১৬] তারা প্রাচীন চিকিৎসকদের মতো এক-একজন রোগীর দেহ থেকে আঠারো থেকে বিশ আউন্স পর্যন্ত রক্ত নিষ্কাশন করেন এবং তার ফলে অনেক সময় রোগী অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এভাবে তারা বলেন যে, রোগীর দেহ থেকে বদরক্ত বের করে দিলে যে কোনো বিষাক্ত রোগই হোক না কেন গোড়াতেই তার মূলে আঘাত করা হয় এবং রোগের দ্রুত উপশম হয়।

হিন্দুরা শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে যে একবারে অজ্ঞ তাতে অবাক হবার কিছু নেই। মানুষের শরীরের ভেতরের গড়ন স্বচক্ষে না দেখলে, শারীরবিদ্যা সম্বন্ধে কোনো ধারণা বা জ্ঞান হওয়াও সম্ভব নয়। হিন্দুরা কোনোদিন কোনো রোগীর দেহের মধ্যে অস্ত্রোপচার করে না। তারা দেখেনি কোনোদিন দেহের মধ্যে কি আছে না-আছে। মানুষ তো দূরের কথা, কোনো জন্তু-জানোয়ারের দেহও এই জন্য তারা কোনোদিন কেটেকুটে দেখেনি। মধ্যে মধ্যে আমি যখন কোনো ছাগল বা ভেড়ার দেহ চিরে ফেলে আমার মনিব আগাকে দেহের মধ্যে রক্ত চলাচলের পদ্ধতির ব্যাখা করতাম, তখন হিন্দুরা ভয়ে ও বিস্ময়ে সেখান থেকে পালিয়ে যেতো। যারা শরীরের ভেতর একটি শিরার দিকেও কোনোদিন চেয়ে দেখনি তারা মানুষের দেহে কতোগুলো শিরা-উপশিরা আছে, তা মুখস্থ বলে দিতে পারে। হিন্দুরা বলে, মানুষের শরীরে পাঁচ হাজার উপশিরা আছে, একটি বেশি বা কম নেই। যেন প্রত্যেকটি শিরা দেখে দেখে তারা গুনে রেখেছেন মনে হয়।

হিন্দুদের জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধেও হিন্দুদের গণনা পদ্ধতি আছে এবং সেই গণনানুসারে তারা গ্রহণাদির ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। ইউরোপীয় জ্যোতিষীদের মতো তাদের গণনা একেবারে নির্ভুল না হলেও অনেকটা যে নির্ভুল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গ্রহণাদি সম্পর্কে তাদের যা যুক্তি তার সঙ্গে অবশ্য

---

১৬. এই সময় গোয়ার চিকিৎসকরা বিশেষ মর্যাদা পেতেন এবং তার জন্য মাথায় ছাতি ধরে তারা চলতে পারতেন। মাথায় ছাতি দিয়ে চলার অধিকার এককালে সকলের ছিল না। বিশেষ সম্মানিত ব্যক্তিরা সেই অধিকার অর্জন করতেন। গোয়ার ডাক্তারদের সম্বন্ধে জনৈক পর্যটক বলেছেন : There are in Goa many Heathen physitions which observe their gravities with hats carried over them for the sunne, like the protingales, which no other heathens doe, but (only) ambassadors, or some rich marchants' (Voyage to the East Indies-Haklyt soc. ed. 1885.Vol I,P.230)—অনুবাদক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। তারা বলে, সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ একই কারণে হয় এবং কোনো দানব বা রাক্ষস সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলে। এই সময় কতোগুলো নিয়ম না পালন করলে মানুষের অমঙ্গল হতে পারে, এই তাদের বিশ্বাস।

এখানকার জ্যোতিষীদের ধারণা, সূর্য থেকে চন্দ্রের দূরত্ব প্রায় চল্লিশ লাখ ক্রোশ। চন্দ্র জ্যোতির্ময় পদার্থ বিশেষ। চন্দ্র থেকে মানুষের দেহে যে তরল পদার্থ নিঃসৃত হয়ে আসে তাই প্রথমে মগজে এসে জমা হয় এবং সেখান থেকে দেহের অন্যান্য অংশে সঞ্চারিত হয়ে সমস্ত শরীরটাকে সক্রিয় ও জেতোদীপ্ত করে রাখে।

হিন্দু জ্যোতিষীদের ধারণা হলো– সূর্য, চন্দ্র ও অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্র দেবতা-বিশেষ। তাদের দৈবশক্তি আছে। সুমেরুর অন্তরালে সূর্যদেব যখন বিশ্রাম করেন তখন বাইরের জগতে অন্ধকার নামে এবং রাত্রি হয়।

হিন্দুরা বলে, এই সুমেরু পর্বত পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে অবস্থিত, দেখতে কতোটা উল্টানো পাউরুটির মতো এবং তার চূড়া যে কতো লাখ ক্রোশ দূরে তার হিসেব নেই। সুতরাং তার অন্তরালে সূর্যদেব যখন লুকিয়ে থাকেন, তখন বাইরের পৃথিবীতে আলো প্রবেশ করে না।

হিন্দুদের ভৌগোলিক ধারণা

জ্যোতিষের মতো ভূগোল সম্বন্ধেও হিন্দুদের নানারকমের বিচিত্র ভ্রান্ত ধারণা আছে। তাদের মতে, পৃথিবীটা গোলাকার নয়, চ্যাপ্টা ত্রিকোণাকার। পৃথিবীতে সাতটি 'লোক' আছে এবং প্রত্যেকটি লোক সাগরবেষ্টিত। সাগরও একরকমের নয়, নানারকমের। কোনো সাগর দুধের, কোনোটি চিনির, কোনোটি ননীর, কোনোটি বা সুরার ইত্যাদি। দুগ্ধসাগর, শর্করাসাগর, সুরাসাগর ইত্যাদি বিভিন্ন সাগরবেষ্টিত লোকে এক এক শ্রেণির অতিমানুষ ও মানুষের বসবাস। এভাবে সাগর ও মৃত্তিকার সাতটি স্তর বা বেষ্টনী নিয়ে পৃথিবী গঠিত এবং মধ্যস্থলে সুমেরু পর্বত। প্রথম স্তরে, সুমেরুর শিখরের কাছে বড় বড় দেবতাদের বাসস্থান; দ্বিতীয় স্তরে ছোট ছোট অসংখ্য দেবতারা বাস করেন। তারা মানুষের চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু বড় বড় দেবতাদের মতো শক্তিশালী নন। এভাবে পরপর ছয়টি স্তরে অনেক রকম দেবতা, উপদেবতা ও অপদেবতাদের বাস আছে। সপ্তম স্তরে মানুষের বাস। এই সপ্তম স্তরই হলো মর্তলোক বা মাটির পৃথিবী।

তা ছাড়া হিন্দুদের ধারণা, এই পৃথিবীটা অসংখ্য হাতির পিঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত। হাতিগুলো যখন দোলে তখন পৃথিবীটাও দোলে– ভূমিকম্প হয়।

ভারতের ব্রাহ্মণদের প্রাচীন শাস্ত্রবিদ্যার যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে, এতোদিন আমরা তাদের জ্ঞানবিদ্যা সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেছি। সত্যই এটা ঠিক কি না, অর্থাৎ প্রাচীন হিন্দুদের জ্ঞানবিদ্যার সম্বন্ধে এরকম ধারণা করা সঙ্গত কি না, আমি এখনও বলতে পারবো না। সুপ্রাচীন কাল থেকে হিন্দু শাস্ত্রকাররা এই সব শাস্ত্রবিদ্যার চর্চা করে আসছেন এবং তাদের শাস্ত্রও সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষায় রচিত। এতোকালের প্রাচীন ঐতিহ্যকে হঠাৎ অপাংক্তেয় বলে বর্জন করাও কঠিন। খুব মুশকিলে পড়তে হয় এই জন্য। যা হোক, এখন আমি হিন্দুদের দেবদেবীর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবো।

হিন্দু দেবদেবীর কথা

গঙ্গী নদী ধরে যেতে যেতে আমি বারণাসীতে পৌছলাম। বারণসীতে পৌছে সেখানকার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত যিনি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। বারাণসী প্রাচীন শিক্ষাকেন্দ্র বলেও হিন্দুদের কাছে প্রসিদ্ধ। যে পণ্ডিতের কথা আমি বলছি তিনি তখনকার সময় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলে খ্যাত ছিলেন। ফকির বা সাধকের মতো তিনি থাকতেন। তার পাণ্ডিত্যের এমন খ্যাতি ছিল যে, সেই জন্য তিনি সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে বাৎসরিক দু'হাজার টাকার মতো বৃত্তি পেতেন। বেশ বলিষ্ঠ সুপুরুষ চেহারা তার। সাদা সিল্কের কাপড় আর গায়ে লাল সিল্কের চাদর জড়িয়ে থাকতেন তিনি। মাঝেমধ্যে আমি পণ্ডিতমশাইকে এই পোশাক পরে দিল্লীতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছি। রাজদবারে সম্রাটের সামনেই হোক বা ওমরাহদের কাছেই হোক, সব সময় তিনি এই পোশাক পরে হাজিত হতেন। পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করতেন, মাঝেমধ্যে পাল্কিতেও চড়তেন।

প্রায় এক বছর ধরে এই পণ্ডিতমশাই আমার মনিব দানেশমন্দ্র খানের কাছে যাতায়াত করেছিলেন। যাতায়াতের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে ধরে সম্রাট আওরঙ্গজেবের কাছ থেকে বৃত্তি আদায় করা। আওরঙ্গজেব তার বৃত্তি বন্ধ করে দিয়েছিলেন বলে তিনি আগাকে ধরে বৃত্তি আদায় করার চেষ্টা করছিলেন। সেই সময় যখন তিনি আমার মনিবের কাছে যাতায়াত করতেন, তখন তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। তখন তার সঙ্গে আমি নানা বিষয়ে আলোচনাও করতাম। অনেক বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে তর্কও হতো। সুতরাং এই পণ্ডিতের সঙ্গে যখন বারণসীতে আমার দেখা হলো তখন তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠাগারে আরোও ছয়জন কাশীর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ও আলোচনার ব্যবস্থার করে দিলেন।[১৭]

---

১৭. ১৬৬৫ সালে আগ্রা থেকে বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় বিখ্যাত পর্যটক টাভার্নিয়ারের সঙ্গী ছিলেন ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার। ওই বছরের ১১ থেকে ১৩ ডিসেম্বর টাভার্নিয়ার বারানসীতে

পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনার এরকম অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে আমিও প্রস্তুত হলাম। ঠিক করলাম হিন্দুদের দেবতা সম্বন্ধে আলোচনা করবো। সভা যখন আরম্ভ হলো তখন আমি তাদের বললাম: "ভারত থেকে আমি এই মূর্তিপূজা ও বহু দেবতার পূজা সম্বন্ধে একটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর ধারণা নিয়ে যাচ্ছি। যে দেশে আপনাদের মতো এরকম বিচক্ষণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতরা আছেন, সে দেশে এরকম বহুদেবতা ও মূর্তিপূজার প্রচলন হয় কেমন করে, আমি ভাবতে পারি না। আমাকে আপনারা বুঝিয়ে দিন, এই পূজার অর্থ কি?'

এই কথার উত্তরে পণ্ডিতেরা বলেন : 'আমাদের দেবালয়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে, যেমন ব্রহ্মা, মহাদেব, গণেশ, ভবানী ইত্যাদি (নামগুলো যথাক্রমে বার্নিয়ার এভাব লিখেছেন– Brahma, Mehadev, Genich, Gavani) । এঁরাই প্রধান দেবদেবী। এঁরা ছাড়া আরোও অনেক দেবদেবী আছেন যাঁদের পূজা করে নানা কারণে। এই সব দেবদেবীর মূর্তি আমরা পূজা করি ঠিক। সাষ্টাঙ্গে আমরা মূর্তির সামনে প্রমাণ করি, ফুল, লতাপাতা, নানারকমের চাল, ঘি, তেল, খাদ্যদ্রব্য ইত্যাদির নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দিই, জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠান করি। সবই ঠিক। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, যখন দেবতার মূর্তিকে আমরা এভাবে পূজা করি তখন সত্যই তাঁরা যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু (Bechen) প্রমুখ দেবতা তা মনে করি না। এসব তাঁদেরই প্রতিমূর্তি যে, তা সব সময় মনে রাখি। সাক্ষাৎ দেবতা ভাবি না। শুধু সেই সব মূর্তি কোনো বিশেষ দেবতার রূপ বলে তার সামনে আমরা পূজা করি। মূর্তিকে করি না, দেবতাকেই করি। তবু কেন মূর্তি গড়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করি, এ প্রশ্ন করা বাইরের লোকের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।

মন্দিরে আমরা মূর্তি গড়ে এ জন্য প্রতিষ্ঠা করি যাতে সাধারণ মানুষ সামনে কিছু চোখে দেখে, সেই দেবতার ধ্যান করে তাঁর আরাধনায় মনোনিবেশ করতে পারে। এ ছাড়া মূর্তিপূজার আর কোনো কারণ নেই। সামনে একটা প্রত্যক্ষ মূর্তি থাকলে তার ওপর মনপ্রাণ নিবদ্ধ করে প্রার্থনা করা অনেক সহজ হয়। তার জন্যই মূর্তির কল্পনা। আসলে মনে মনে সব সময় আমরা দেবতার পূজা করি এবং তিনি একই দেবতা ও ঈশ্বর যে রূপেই বা যে মূর্তিতেই তাঁকে কল্পনা করি না কেন।'

কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতরা আমাকে যা বলেছিলেন তার হুবহু বিবরণ আমি দিলাম। একটি কথাও এর মধ্যে যোগ করিনি বা বাদ দিইনি। তবে আমার সন্দেহ হয় যে, আমাকে তারা এভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছিলেন আমি খ্রিস্টান

ছিলেন এবং তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী (Travles, Vol II.pp.234-235) লিখে গেছেন : প্রকাণ্ড একটি মন্দিরের কাছে একটি বিরাট গৃহ আছে কাশীতে। এই গৃহটিতেই রাজা জয়সিংহের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত। এই বিদ্যালয় উচ্চবংশীয় সন্তানদের শিক্ষা দেয়া হয়। রাজকুমারদেরও আমি এই বিদ্যালয়ে পড়তে দেখেছি। তাঁরা ব্রাহ্মণদের কাছে লেখাপড়া শেখেন এবং পুরোহিতদের ভাষা বা দেবভাষা সংস্কৃতও অধ্যয়ন করেন।–অনুবাদক।

বলে। তারা যেভাবে বহু দেবতার পূজা ও মূর্তিপূজার ব্যাখ্যা করেছেন, তাতে তা এক দেবতার পূর্জা বলে মনে হয় এবং খ্রিস্টীয় ধর্মের সঙ্গে তার যে পার্থক্য আছে তা বোঝা যায় না। অন্যান্য পণ্ডিতদের কাছে এই একই বিষয়ে যে রকম ব্যাখ্যা শুনেছি তাতে অন্যরকম ধারণা হয়, অর্থাৎ পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা করার পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে দেখা যায়।

হিন্দুদের কালগণনা

দেবদেবী সম্বন্ধে আলোচনার পর আমি কালগণনা সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করলাম। পণ্ডিতেরা এ ব্যাপারে আমাকে সবচেয়ে বেশি তাক্ লাগিয়ে দিলেন। কালগণনার এমন এক বিচিত্র হিসেব তারা দাখিল করলেন যা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন। হিন্দু পণ্ডিতেরা এমন কথা বলেন না যে সৃষ্টি অনাদি। সৃষ্টির আদি আছে এ কথা তারা স্বীকার করেন। কিন্তু তারা এমন একটা হিসেব দেন যা আমাদের কাছে অসীম অনন্তকালের মতো মনে হয়। তারা বলেন, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে কালগণনা করা হয়, এবং তাকে চারটি যুগে ভাগ করে। যুগ বলতে আমরা যা বুঝি, তারা তা বোঝেন না (বার্নিয়ারের 'Dgugues'– যুগ)। যুগের হিসেব শতক বা সহস্রকের হিসেবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। মোটামুটি এক কোটি বছর করে তারা প্রত্যেকটি যুগের হিসেব করেন। সঠিক কতো বছর তা বলতে পারবো না। প্রথম যুগের নাম সত্যযুগ (State-Dgugue)। সত্য যুগ প্রায় পঁচিশ লাখ বছর ছিল শোনা যায়। দ্বিতীয় যুগের নাম ত্রেতা যুগ (Trita-Dgugue)। ত্রেতা যুগের অস্তিত্ব ছিল বারো লাখ বছর। তৃতীয় যুগের নাম দ্বাপর যুগ (Duapar-Dgugue)। দ্বাপর যুগ প্রায় আট লাখ চৌষট্টি হাজার বছর ছিল। চতুর্থ যুগের নাম কলি যুগ (Kale-Dgugue)। কলি যুগ যে কতো লাখ বছরে ধরে চলবে তা বলা যায় না। পণ্ডিতেরা বলেন যে, প্রথম তিনটি যুগ– সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর শেষ হয়ে গেছে এবং চতুর্থ, অর্থাৎ কলি যুগের অনেকটা কেটে গেছে। কলি যুগের পরে আর কোনো যুগের অভ্যুদয় হবে না। এই চতুর্থ যুগই বর্তমান পৃথিবীর জীবনের শেষ পর্ব। কলি যুগেই সৃষ্টির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কলি যুগের শেষে পৃথিবী আবার তার প্রাথমিক স্তরে ফিরে যাবে, সৃষ্টির আদিকালের অবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। যতোবার পণ্ডিতদের (Pendets) জিজ্ঞেস করেছি যে পৃথিবীর বয়স কতো, ততোবার তারা নানভাবে অঙ্ক কষে, হিসেব করে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ একজনের সঙ্গে অন্যজনের হিসেব কিছুতেই মেলে না। মেলে না যখন তখন তারা যা বলেছেন তা থেকে এইটুকু শুধু বুঝেছি যে, পৃথিবীটা এতো প্রাচীন যে তার বয়সের কোনো হিসেব করা সম্ভব নয়। তাতেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। যখন তাদের জিজ্ঞেস করেছি যে কোথা থেকে তারা এইসব হিসেব পেলেন, তখন তারা শুধু বেদের নাম করে চুপ করে থেকেছেন। 'সব বেদে আছে'– এই তাদের বক্তব্য। স্বয়ং ব্রহ্মা তাদের জন্য বেদ রচনা করে তার মধ্যে এইসব সারগর্ভ বলে গেছেন।

দেবদেবীর প্রস্তুতি সম্বন্ধে তাদের কাছে জানার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। কেউ কেউ বলেন, দেবতা তিন রকমের আছেন– ভালো, মন্দ ও উদাসীন। কেউ বলেন, দেবতাদের উপাদান অগ্নি। কেউ বলেন, আলোক। আবার কেউ বলেন, দেবতা হলেন ব্যাপক (বার্নিয়ারের 'Biapek' ব্যাপক)। ব্যাপক কথার অর্থ আমি সঠিক উপলব্ধি করতে পারিনি। যা 'ব্যাপক', তা নাকি স্থান ও কালের উর্ধ্বে এবং তার ধ্বংস হয় না। আবার এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যারা বলেন যে, দেবতারা হলেন পরমেশ্বরের অংশ মাত্র। কেউ বলেন, দেবতারা হলেন একজাতীয় 'দৈব' জীব যারা পৃথিবীতে বিচরণ করেন।

সুফীদের ধর্ম ও দর্শন

এবার সুফীদের সম্বন্ধে কিছু বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। ভারতে সম্প্রতি এই সুফীদের মতবাদ ও দর্শন নিয়ে খুব আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। অনেকে বলে যে, হিন্দু পণ্ডিতেরা নাকি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শিকো ও সুলতান সুজার ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রাচীনকালের দার্শনিকেরা, আপনি জানেন, সৃষ্টির মধ্যে এক সনাতন প্রাণশক্তির সন্ধান করতেন এবং মনে করতেন যে জীব মাত্রই সেই অনাদি অনন্ত প্রাণশক্তির কণা-বিশেষ ছাড়া কিছুই নয়।

দার্শনিক প্লেটো ও অ্যারিস্টটল থেকে সকলেই প্রায় নানাভাবে এই অভিমত প্রকাশ করে গেছেন। হিন্দু পণ্ডিতেরাও প্রায় এই একই কথা বলেন এবং একই ধরনের মত পোষণ করেন। এই মতবাদই হলো সুফীদের মতবাদ এবং ইরানের পণ্ডিত ও দার্শনিকেরাও নাকি এই মতবাদ সমর্থন করেন। ইরানের কাব্য– গুল্‌শান রাজে[১৮] এই মতবাদই চমৎকার ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে।

ভারতের হিন্দুদের এই সব বিচিত্র আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-ধারণা, ধর্মকর্ম, দেবদেবী, দর্শন-বিজ্ঞান ইত্যাদি দেখে-শুনে এবং এতো কষ্ট স্বীকার করে আমার মনে হয়েছে যে, পৃথিবীতে এমন কোনো আজগুবি বা অবিশ্বাস্য মতবাদ নেই যা মানুষের কাছে বিশ্বাসের যোগ্য নয়।*

---

১৮. 'গুলশান রাজ' কাব্য (Mystic Rose Garden) ১৩১৭ সালে রচিত হয়, সুফীদের সম্বন্ধে পনেরোটি প্রশ্নের উত্তর হিসেবে।–অনুবাদক।

* এর পর বার্নিয়ার আওরঙ্গজেবের কাশ্মীর অভিযানের কথা লিখেছেন। তার অনুবাদ করার প্রয়োজন এখন আছে বলে মনে হয়নি। তারপর কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে তিনি বাংলাদেশের সৌন্দর্য ও সম্পদ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।–অনুবাদক।

সোনার বাংলা

ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বাংলাদেশে দু'বার এসেছিলেন, সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। বাংলাদেশের ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদেশী বণিকরা তখন বাংলাদেশে ঘাঁটি তৈরি করেছে এবং মোগল শাসনের বুনিয়াদ ক্রমেই শিথিল হয়ে ভেঙে পড়েছে। এ সময়ের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, পরবর্তী পরিবর্তনের ধারা সঠিকভাবে বোঝা কঠিন। বার্নিয়ার আসার প্রায় তিনশো বছর আগে ইবনে বতুতা বাংলাদেশে এসেছিলেন এবং তিনি বাংলাদেশের সুন্দর বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বার্নিয়ারের বিবরণ সংক্ষিপ্ত হলেও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য তিনি পরিবেশন করেছেন।—অনুবাদক।

বাংলাদেশের সম্পদ প্রসঙ্গে

যুগে যুগে বিভিন্ন লেখক মিসরকে চিরকাল সোনার দেশ বলে গেছেন। ফল-ফুল-ফসলে ভরা এ রকম দেশ নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। এখনও অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে। তারা মনে করে, মিসরের প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনা করা যায়। এ রকম দেশ কোথাও নেই। কিন্তু বাংলাদেশে দু'বার বেড়াতে গিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, তাতে আমার মনে হয় যে মিসর সম্বন্ধে এতোদিন যা বলা হয়েছে, সেটা বাংলাদেশ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে ধান চাল এতো প্রচুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় যে, আশপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেয়া হয় এখান থেকে। গঙ্গা নদীর ওপর দিয়ে নৌকাভরা ধান পাটনায় চালান যায় এবং সমুদ্রেপথে যায় দক্ষিণ ভারতের মুসলিপট্টম ও করোম্যান্ডাল উপকূলের অন্যান্য বন্দরে। বিদেশেও ধান চালান যায় বাংলাদেশ থেকে, প্রধানত শ্রীলঙ্কা ও মালদ্বীপে।

ধান ছাড়াও বাংলাদেশে চিনি পাওয়া যায় প্রচুর এবং গোলকুন্ডা কর্ণাট প্রদেশে এই চিনি চালান যায়। বাইরে আরব, মেসোপোটামিয়া ও ইরান পর্যন্ত বাংলার চিনি রপ্তানি করা হয়। বাংলাদেশে নানা রকমের মিষ্টিও তৈরি হয়। মিষ্টির বৈচিত্র্যের জন্য বাংলাদেশ বিখ্যাত। বাংলাদেশে যে সব অঞ্চলে পর্তুগীজরা বসতি গড়ে তুলেছে, প্রচলন সেই সব অঞ্চলেই নানারকমের মিষ্টি বেশি দেখা যায়। তার একটা কারণ হলো, পর্তুগীজরা খুব ভালো মিষ্টি তৈরি করতে পারে, খুব সুদক্ষ ময়রা তারা। শুধু তাই নয়, মিষ্টির ব্যবসা তাদের

অন্যতম ব্যবসা। এ ছাড়া লেবু, আম, আনারস প্রভৃতি ফলেরও ব্যবসা করে তারা।[১]

বাংলাদেশের আহার্যের প্রাচুর্য

বাংলাদেশে অবশ্য মিসরের মতো গম উৎপন্ন হয় না। কিন্তু এটা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দৈন্যের পরিচয় নয়। খুব বেশি গম বাংলাদেশে উৎপন্ন না হবার কারণ হলো, বাঙালিরা গম পছন্দ করে না। গম তাদের প্রধান খাদ্যশস্য নয়। বাঙালিরা ভাত খায়, তাই ধানের চাষই বেশি হয় বাংলায়। তাহলেও গম যে একেবারেই হয় না, তা নয়। যা হয় তাই যথেষ্ট। গম দিয়ে দেশি কারিগররা যে সব বিস্কুট তৈরি করে, ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগিজ নাবিক ও ব্যবসায়ীরা জাহাজে তাই তৃপ্তি করে খায়।[২] তিন-চার রকমের তরি-তরকারি, ভাত, মাখন ইত্যাদিই হলো বাঙালিদের প্রধান খাদ্য এবং খুব সামান্য মূল্যেই এই সব খাদ্য পাওয়া যায়। এক টাকায় কুড়িটার বেশি মুরগি কিনতে পাওয়া যায়। হাঁসও খুব সস্তা। ছাগল ভেড়ার তো অভাবই নেই। শূকরের দাম এতো সস্তা যে পর্তুগীজরা বাংলাদেশে প্রধানত শূকরের মাংস খেয়েই বেঁচে থাকে। এই শূকরের মাংসই নুনে জড়িয়ে ইংরেজ ও ডাচরা জাহাজের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করে।

বাংলাদেশে নানা রকমের মাছ এতো প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে; তা বলে শেষ করা যায় না। এককথায় বলা যায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ও খাদ্যদ্রব্যের কোনো অভাব নেই বাংলাদেশে। প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের এই

---

১. পর্তুগীজরা যে ভালো মিষ্টি তৈরি করতে পারতো এবং মিষ্টির ব্যবসা করতো, এ কথা বোধ হয় অনেকেই জানে না। এ ছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ ফলফুলের কথাও আমরা পর্তুগিজরা আসার আগে জানতাম না। এ সম্বন্ধে ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'History of Bengal' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬৮ পৃষ্ঠা) যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করছি :

'It is seldom realised that many of our commonflowers and fruits were totally unknown before the Portuguese came. The noxious weed that brings solace' to many and now forms a staple product of Rangpur was brought by the Portuguese, as was the common article of food potato-Which is relished by princes and peasants alike.Tobaco and potato came from North America. From Brazil they brought cashewnut which goes by the name of Hijli Badam, be acause it thrives so well in the sandy soil of the Hijli littoral. Ww are indebted to the portugese for kamranga which finds so much favour with childern. To this list may be added peyara which foun an appreciative poet in Monmohan Basu.The little krishnakail that cheers our countryside in its yellow red and white is another gift of the once dreaded Feringi."—অনুবাদক।

২. একসময় বাংলাদেশে যে যথেষ্ট দেশী বেকারি ছিল এবং বাঙালি কারিগররা (প্রধানত মুসলমান) যে নানা রকমের পাউরুটি বিস্কুট তৈরি করতো, বার্নিয়ার তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়ে গেছেন। বিস্কুটগুলোকে বার্নিয়ার 'Sea-biscuits' বলেছেন, তার কারণ তিনি জাহাজের কিরিঙ্গী নাবিকের এরকম দেশি বিস্কুট খুব বেশি খেতে দেখেছেন। তাই তাঁর ধারণা হয়েছে বিস্কুটগুলো বোধ হয় সমুদ্রযাত্রীদের জন্যই তৈরি হয়।—অনুবাদক।

প্রাচুর্যের জন্যই পর্তুগীজ ও অন্য খ্রিস্টানরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন বসতিকেন্দ্র থেকে ডাচদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে আস্তানা গেড়ে বসেছে।

অনেক খ্রিস্টান গির্জা আছে বাংলাদেশে এবং খ্রিস্টানদের স্বাধীন ধর্মানুষ্ঠানে কোথাও কোনো বাধা নেই। জেসুইট ও অগাস্টিন ধর্মযাজকদের মুখে শুনেছি, শুধু হুগলীতেই নাকি আট-নয় হাজার খ্রিস্টানের বাস এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে মোট খ্রিস্টানের সংখ্যা হলো পঁচিশ হাজার। বাংলাদেশের প্রতি খ্রিস্টানদের এই বিশেষ প্রীতির অন্যতম কারণ হলো, বাংলার অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বাঙালি মেয়েদের কোমল প্রকৃতি। এ জন্য পর্তুগীজ, ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু আছে যে, বাংলাদেশে প্রবেশ করার দরজা আছে একশোটা, কিন্তু বেরিয়ে যাবার দরজা একটিও নেই। অর্থাৎ বাংলাদেশে আসার আকর্ষণ আছে অনেক এবং একবার এলে আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।

বাংলাদেশের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণের কারণ

বাংলাদেশের প্রতি বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ হলো, বাংলায় পণ্যদ্রব্যের বৈচিত্র্য বেশি। বাণিজ্যের উপযোগী এতো রকমের সুন্দর সুন্দর পণ্য আর কোথাও উৎপন্ন হয় বলে মনে হয় না। চিনির কথা তো আগে বলেছি এবং চিনির ব্যবসায়ের কথাও উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া, তুলা ও রেশমের এতো রকমের জিনিস তৈরি হয় বাংলায়, এতো প্রচুর পরিমাণে হয় যে এই বাংলাদেশকে ভারতের কাপড়চোপড়ের প্রধান আড়ৎ বললে ভুল বলা হয় না। শুধু ভারতের বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, প্রতিবেশী সমস্ত দেশের এবং ইউরোপেরও কাপড়চোপড়ের আড়ৎ হলো বাংলাদেশ। সরু, মোটা, সাদা, রঙিন, নানারকমের তাঁতের কাপড় তৈরি হয় বাংলায়। তাঁতের কাপড়ের এরকম প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য আমি কখনো কোথাও দেখিনি। দেখলে সত্যিই অবাক হয়ে যেতে হয়। ডাচরা এই সব কাপড় যথেষ্ট পরিমাণ জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চালান দেয়। ইংরেজ ও পর্তুগিজ বণিক এবং দেশীয় বণিকরাও প্রধানত এই কাপড়ের ব্যবসায়ই করে।

বাংলাদেশে তাঁতের কাপড়ের মতো সিল্কের কাপড়ও প্রচুর পরিমাণে তৈরি হয় এবং তার বৈচিত্র্যও যথেষ্ট। এ কাপড় বাংলাদেশ থেকে লাহোর, কাবুল এবং ভারতবর্ষের বাইরে অন্যান্য দেশে চালান যায়। ইরান, সিরিয়া, সৈয়দ বা বৈরুতের সিল্কের মতো বাংলাদেশের সিল্ক খুব সূক্ষ্ম না হলেও, এতো সুলভ মূল্যে সিল্ক কোথাও পাওয়া যায় না।

দেশের অভিজ্ঞ লোকদের মুখে শুনেছি, বাংলার তাঁতিদের প্রতি যদি আর একটু যত্ন দেয়া হতো এবং তাদের দিকে নজর দেয়া হতো, তাহলে অনেক সস্তায় আরোও অনেক ভালো তাঁতের ও রেশমের কাপড় তারা তৈরি করতে পারতো।[৩]

ডাচদের কাশিমবাজারের রেশমকুঠিতে সাত-আটশো তাঁতি কাজ করে শুনেছি। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদেরও এরকম অনেক কুঠি আছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশে প্রচুর সোরা (Saltpetre) উৎপন্ন হয়। পাটনা থেকে যথেষ্ট পরিমাণে সোরা আমদানিও করা হয়।[৪] গঙ্গার ওপর দিয়ে নৌকা করে সোরা চালান দেয়ার সুবিধা এবং বিদেশী বণিকরা এভাবে ভারতের নানা অঞ্চলে সোরা চালান দিয়ে থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশে গালা, মরিচ, ডাল, আফিম, মোম প্রভৃতি বিপুল পরিমাণে পাওয়া যায়। মাখনও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কিন্তু এতো বড় বড় মাটির পাত্রে ঘি ও মাখন রাখা হয় যে, বাইরে চালান দেয়া কষ্টকর। তবু নানা দেশে সমুদ্রপথে যথেষ্ট মাখন চালান দেয়া হয়।[৫]

বাংলার জলবায়ু

বিদেশীদের কাছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক আবহাওয়া বা জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর ছিল না। বিশেষ করে সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চল খুবই অস্বাস্থ্যকর ছিল। ডাচ ও ইংরেজরা যখন প্রথম বাংলাদেশে আসে তখন তাদের মৃত্যুর হার ছিল খুব বেশি। আমি একবার বালাসোরের বন্দরে দুটি ব্রিটিশ জাহাজকে অবস্থান করতে দেখেছি। প্রায়

---

৩. বাংলাদেশের রেশমের কাপড়ের সুলভতা এবং বাঙালি তাঁতিদের প্রতি দেশের কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা সম্বন্ধে বার্নিয়ারের অভিমত প্রণিধানযোগ্য হলেও বাংলার রেশমের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে তিনি যে মন্তব্য করেছেন তা ঠিক নয়। এ সম্বন্ধে "History of the Cotton Manufacture of Dacca District" এবং যতীন্দ্রমোহন রায়ের "ঢাকার ইতিহাস" গ্রন্থে যে বিবরণ আছে তা পড়ে দেখা যেতে পারে।—অনুবাদক।

৪. ইংরেজ, ডাচ ও পর্তুগীজদের একাধিক সোরার কারখানা ছিল ছাপরা জেলায়।—অনুবাদক।

৫. ঘি-মাখনের ব্যবসা ভারতের অন্যতম ব্যবসা। তার মধ্যে বাংলাদেশের ভূমিকাও প্রধান। ভারতের এই ঘিয়ের ব্যবসার প্রাধান্যের কথা বোঝা যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকের এই হিসেব থেকে।

তিন মাসের হিসেব (এপ্রিল-জুন)

	১৮৮৯	১৮৯০	১৮৯১
পরিমাণ (পাউন্ড)	৪৬৯,৫৮১ :	৬১১,২৫৪ :	৫৩০, ৫৪৩
মূল্য : (টাকা)	১,৬৯,৯০৫ :	২,২৬,৯৪০ :	২,০০,১১৭

উনবিংশ শতাব্দীতে ঘিয়ের ব্যবসা বাংলাদেশে যে কি রকম চলতো, তা পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির ঘিয়ের ব্যবসার কাহিনী থেকে বোঝা যায়। তাঁর জীবনচরিত থেকে এই ব্যবসায়ের কথা উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

"১৮৫২ সালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় বীরভূমে প্রত্যেক বিঘায় দুই আনা কর ধার্য করিয়া দশ হাজার বিঘা জঙ্গলভূমির চাষ করিতে প্রবৃত্ত হন। কৃষিকার্যোপযোগী পাঁচ শত গরু ক্রয় করেন। যে সকল গাভী ক্রয় করিতেন, তাহাদের দুগ্ধ হইতে যে ঘৃত উৎপন্ন হইত, তাহা কলিকাতায় আনাইয়া বিক্রীত হইত। তৎকালে রেলের পথ হয় নাই, সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ ঘৃত কলিকাতায় আনাইতেন। উক্ত কার্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন।" (শ্রীশম্ভুচরণ বিদ্যারত্ন তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত্র : ১৩০০ সাল : পৃষ্ঠা ২৪)।

এক বছর জাহাজ দুটি বন্দরে থাকতে বাধ্য হয়েছিল, কারণ হল্যান্ডের সঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছিল বলে ইংল্যান্ড প্রত্যাবর্তনের কোনো উপায় ছিল না।

এক বছর পরে যখন জাহাজ দুটির দেশে ফিরে যাবার সময় হলো তখন দেখা গেলো যে জাহাজ নিয়ে যাবার মতো নাবিক-লস্কর নেই। জাহাজের অধিকাংশ নাবিক-লস্করই অসুখে ভুগে মারা গেছে। কিছুকাল পর অবশ্য ডাচ ও ইংরেজরা আরও সাবধানে থাকতে আরম্ভ করে এবং অসুখ-বিসুখের প্রাবল্য কমে যায়। জাহাজের ক্যাপ্টেনরা লক্ষ্য রাখেন যাতে জাহাজের লস্কর-নাবিকেরা বেশি মদ্যপান না করে এবং এদেশীয় নারীর সংস্পর্শে আসতে না পারে। তাতে কিছুটা রোগব্যাধির উপদ্রব্য কমে যায়। মদ সম্বন্ধে বলা যায় যে, ক্যানারী, গ্রেভ বা শিরাজী জাতীয় মদ খারাপ।

জলবায়ু স্বাস্থ্য রক্ষার পক্ষে মন্দ নয়, পরিমিত পানে ক্ষতি হয় না। সুতরাং একটু হিসেব করে সংযত হয়ে চললেই স্বাস্থ্যহানির কোনো কারণ ঘটতে পারে বলে আমার মনে হয় না। মৃত্যুর হারও অনেক পরিমাণে কমে যেতে পারে। বুলেপঞ্জ নামে এক জাতীয় দেশী মদ আছে যা গুড় থেকে তৈরি হয় এবং এ দেশী লোক লেবু পানি ইত্যাদি মিশিয়ে পান করে। আস্বাদ খুব ভালো, পানীয় হিসেবেও মনোরম, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।[৬]

---

৬. 'বুলেপঞ্জ' কথাটি মনে হয়, দুটি কথার বিচিত্র সংমিশ্রণ এবং বার্নিয়ার তাকে দেশী মদের নাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। 'Bowl' ও 'Punch' এই কথা দুটির পরিণতি হয়েছে বুলেপঞ্জ। H. Meredith Parker জনৈক সিভিলিয়ান (নিম্নবঙ্গে সুপরিচিত) 'Bole-Ponjis containing the tale of the Bucaneer : A Bottle of Red Ink :The Decline and Fall of Ghosts, and other Ingredients, 2 vols.'—নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন ১৮৫২ সালে। দেশী মদের গুণাগুণ অবশ্য আরও অনেক বিদেশী পর্যটক করে গেছেন।

ওভিংটন (Ovington) তাঁর ' A Voyage to surattiee in the year 1686 (London, 1696) গ্রন্থে বাংলাদেশের দেশী মদ সম্বন্ধে লিখেছেন:

Bengal is a much Stronger spirit than of Goa, though both are made use of the Europeans in making punch.:'

বার্নিয়ার ও টার্ভানিয়ারের (Tavernier) বাংলাদেশের বিবরণের মধ্যে অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। টাভার্নিয়ারও তাই বলেছেন। অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের জন্য টাভার্নিয়ারের বর্ণনা কিছু-কিছু উদ্ধৃত করা হলো।

বাংলাদেশের চিনি প্রসঙ্গে টাভার্নিয়ার বলেছেন: 'Further it (Bengal) also abounds in sugar, so that it furnishes with it the kingdoms of Golkonda and Kamates'... (Tavernier Vol.II p. 140)

বাংলাদেশের তুলা ও রেশম প্রসঙ্গে টাভার্নিয়ার বলেছেন: 'As to the commodities of great value, and which draw the commerce of strangers thither (to Bengale) I know not whether there be a country in the world that affords more and greater variety : for besides sugar...there is store of cottons and silks, that it may be said that Bengale is as it were general magazine there of not for Hindostan...but also for all the circumjacent kingdoms and for Europe itself. (Tavernier Vol.II p. 140 f.)

বাংলাদেশের মাখন প্রসঙ্গে টাভার্নিয়ার বলেছেন: 'Butter is to be had there in so great plenty... (Tavernier Vol.II p. 141)

বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করার আগে মনে রাখা দরকার যে, রাজমহল থেকে সমুদ্রের মুখ পর্যন্ত প্রায় তিনশো মাইল লম্বা গঙ্গার উভয় তীর সে দেশের শোভাবর্ধন করছে। এর মধ্য অসংখ্য খাল আছে, যা পণ্যদ্রব্যের চলাচলের সুবিধার জন্য এবং জলপ্রবাহের জন্য সুদূর অতীতকালে কাটা হয়েছে।[৭] মানুষের দৈহিক মেহনতের এ অপূর্ব ভারতীয় নিদর্শন। এই সব খালের দুই দিকে সারিবদ্ধ নগর ও গ্রাম গড়ে উঠেছে। লোকজনের বসতিও যথেষ্ট আছে। তারই মধ্যে সুবিস্তৃত ধানক্ষেত আখক্ষেত, ফসলক্ষেত, নানারকমের সবজিবাগান, সরষে ও তিলের ক্ষেত, আর দু-তিন ফুট উঁচু তুঁতগাছের সারি রেশমি গুটিপোকার খাদ্যের জন্য বিরাজ করছে। কিন্তু বাংলাদেশের সবচেয়ে লোভনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হলো, গঙ্গার দুই তীরের মধ্যবর্তী ছোট ছোট দ্বীপগুলো। দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে যেতে অনেক সময় ছ-সাতদিনও লেগে যায়। ছোটবড় নানা আকারের সব দ্বীপ, কিন্তু একটি বিশেষত্ব সকলেরই আছে– এমন শস্য-শ্যামল উর্বরা দ্বীপ সচরাচর দেখা যায় না। প্রত্যেকটি দ্বীপ নিবিড় অরণ্যে ঘেরা, তার মধ্যে নানারকমের ফলের গাছ, আনারসের বাগান। হাজার হাজার আঁকাবাঁকা খাল-নালা তার ভেতর দিয়ে চলে গেছে, কতো দূরে যে তা বলা যায় না– একেবারে দৃষ্টির অন্তরালে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় দ্বীপের মধ্যে গাছের বাঁকানো তোরণশ্রেণি দিয়ে সাজানো আঁকাবাঁকা পথ সব।

মগ দস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী

সমুদ্রের কাছাকাছি অনেক দ্বীপ এখন প্রায় জনবসতিশূন্য হয়ে গেছে। প্রধানত আরাকানের জলদস্যু বা বোম্বেটেদের অত্যাচারে এই সব দ্বীপ ছেড়ে লোকজন পালিয়ে গেছে। এখন এই দ্বীপগুলো দেখলে মনে হয় না যে এককালে এখানে লোকালয় ছিল। ধূ-ধূ করছে জনমানবশূন্য গ্রামের পর গ্রাম। মানুষ নেই, বন্য জন্তুর উপদ্রব বেড়েছে তার বদলে। একসময় সেখানে মানুষের বসবাস ছিল, এখন সেখানে হরিণ, শুকর আর বনমোরগ চরে বেড়াচ্ছে। তারই আকর্ষণে বাঘেরও আনাগোনা আছে সেখানে। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে অনেক সময় বাঘগুলো সাঁতার দিয়ে চলে যায়।

বিদেশীদের আকর্ষণ প্রসঙ্গে টাভার্নিয়ার বলেছেন : In a word, Bengale is a country abounding in all things; And it is for this very reason that so many portugueses Mesticks and other chirstians are filed thither...(Vol;.IIp140)–অনুবাদক।

৭. বার্নিয়ার যে সব কাটা খালের কথা এখানে বলেছেন, তার অধিকাংশই অবশ্য কাটা খাল নয়। নদ-নদীর প্রাচুর্য দেখে এবং তার পাশের বাঁধগুলো দেখে বার্নিয়ারের মনে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে নদীগুলো মানুষের মেহনতে কাটা খাল ছাড়া কিছু নয়। আসলে বার্নিয়ার যাকে খাল বলেছেন তার অধিকাংশই হলো ক্ষীণনদী।–অনুবাদক।

গঙ্গার ওপর সাধারণত ছোট ছোট নৌকায় করে চলে বেড়াতে হয়। এ ছাড়া নদীপথে চলাচলের আর অন্য কোনো যান নেই। নৌকা থেকে এই সব দ্বীপের যে কোনো স্থানে অবতরণ করার বিপদ আছে অনেক।[৮] তার কারণ, স্থানগুলো নিরাপদ নয়। রাত্রিবেলা নৌকা কোনো গাছের ডালের সঙ্গে বেশ শক্ত করে দড়ি দিয়ে বেঁধে, তীরে থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখতে হয়। তা না হলে রাতের ঝোঁকে নৌকায় যে কোনো বাঘে ছোঁ মেরে আরোহীকে নিয়ে যেতে পারে। এরকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। রাতে তীরে নৌকা নোঙর করে আরোহীরা যখন নিশ্চিন্তে নিদ্রা যায়, তখন বাঘ এসে সন্তর্পণে নৌকার ভেতর ঢোকে এবং শিকার ধরে নিয়ে চলে যায়। এ অঞ্চলের মাঝিদের মুখে এরকম কাহিনী অনেক শোনা যায়।

---

৮. বার্নিয়ার এর আগেও মগদস্যুদের লুণ্ঠনেরে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। মগ ও পতুর্গীজ জলদুস্যদের অত্যাচার যে কতোদূর চরমে উঠেছিল এবং বাংলার পারিবারিক ও সামাজিক জীবন যে কিভাবে বিপর্যস্ত করেছিল, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য বিভিন্ন বংশের (প্রধানত ব্রাহ্মণ) কুলজী থেকে তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সব সংগ্রহ করেছেন (প্রবাসী : চৈত্র ১৩৫৩)। বাংলার বহু সম্ভ্রান্ত পরিবারও দেখা যায়, মগের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পায়নি। মগের এই দৌরাত্ম্যের জন্য সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলার রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে এক নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তাকে 'মগদোষ' বলা হয়। কুলপঞ্জীতে এই মগদোষের বিবরণের মধ্যে ঘটকরা অজ্ঞাতসারে বহু করুণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই জাতীয় ঐতিহাসিক উপকরণ অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন কুলপঞ্জী (হাতে লেখা) থেকে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এগুলো যদি উদ্ধার না করতেন, তাহলে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি মর্মান্তিক অধ্যায়ের কথা আমরা সম্পূর্ণ জানতে পারতাম না।

কুলগ্রন্থ থেকে মগদৌরাত্ম্যের কয়েকটি বিবরণ উল্লেখ করছি : (ক) 'বন্দ্যঘাট' অর্থাৎ ব্যানার্জি বংশের একটি বিখ্যাত শাখা 'সাগরদিয়া' নামে পরিচিত। এই শাখায় জহ্নু প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন। তাঁর এক পৌত্র (বলভদ্রের পুত্র) শ্রীপতির নাম ধ্রুবানন্দ তাঁর মহাবংশাবলী' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শ্রীপতি ১৫০০ সালে জীবিত ছিলেন। তাঁর এক প্রপৌত্র রামচন্দ্রের কুলবিবরণ মধ্যে পাওয়া যায়: 'ততো বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কন্যা মগেন নীতা সর্বানাশদ্বানি।' এই ঘটনা আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৬০০-১৬৫ সালে) ঘটে। রামচন্দ্রের বাড়ি কোথায় ছিল জানা যায় না। কুলাবস্থান থেকে মনে হয়, নদীয়া যশোর অঞ্চলেই তাঁর বাস ছিল।

(খ) উক্ত রামচন্দ্রের এই ভাইয়ের নাম রাঘব। তিনিও ঐ একই অঞ্চলের বাসিন্দা বলে মনে হয়। তাঁর আট পুত্রের মধ্যে চতুর্থ চাঁদ সদ্বংশে বিবাহ করেন। কিন্তু- 'চাঁদ পিতৃভদ্রকালে মুং যাদবেন্দ্র রায়স্য কন্যাবিবাহ অত্র সাধুঃ পশ্চাৎ মগের নীতা।' তাঁর বাকি চার ভাইকেও মগদস্যুরা ধরে নিয়ে যায়- 'চাঁদ বিনোদ রাজারাম যদু মধু মগেন নীতা।' শুধু তাই নয়, তাঁর তিন ভগ্নীকেও মগেরা নিয়ে যায়- 'ততঃ স্বরূপা মণিরূপা কর্পূর- রমঞ্জরী এতাঃ কন্যাঃ মগেন নীতা সর্বনাশদ্বানিঃ।'

(গ) খড়দেহ মেলের প্রসিদ্ধ কুলীন ছিলেন ভগীরথপুত্র শ্রীমন্ত। শ্রীমন্তের প্রপৌত্র কৃষ্ণচরণ সম্বন্ধে লিখিত আছে: 'কৃষ্ণচরণস্য ফিরাঙ্গি অপবাদর বিক্রমপুর কাঁঠালতলি গ্রামে।' কৃষ্ণচরণের ভাই রামদেব সম্বন্ধে লেখা আছে: 'রামদেবস্য ফারাঙ্গিতে নীতা মগসংপর্কঃ।' রামদেব নিঃসন্তান ছিলেন। একটি গ্রন্থে কৃষ্ণচরণ নামে একটি কারিকা উদ্ধৃত হয়েছে-

কৃষ্ণচরণ বন্দ্যবর পাইয়া ফিরিঙ্গি ডর
কাঁঠালতলা করি পরিত্যাগ।'-অনুবাদক।

পিপ্‌লি বন্দর থেকে হুগলীর পথে বার্নিয়ার

পিপ্‌লি বন্দর[৯] থেকে হুগলী পর্যন্ত আমার নৌকাযাত্রার অভিজ্ঞতার কথা এবারে বর্ণনা করবো। এই সব দ্বীপ ও ছোট ছোট অসংখ্য খাল-নালার ভেতর দিয়ে পিপ্‌লি থেকে নদীপথে নৌকায় করে আমার হুগলী পৌঁছতে প্রায় নয় দিন সময় লেগেছিল। সেই নৌকাযাত্রার বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা আমার আজও মনে আছে। এমন কোনো দিন যায়নি যেদিন নতুন কোনো অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিনি। হয় কোনো অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অথবা দুঃসাহসিক কোনো ঘটনা, একটা-না একটা কিছু ঘটেছেই।

যে নৌকাটিতে আমি যাত্রা করেছিলাম সেটি একখানি সাতদাঁড়যুক্ত নৌকা। পিপ্‌লি থেকে বেরিয়ে যখন আমরা প্রায় দশ-বারো মাইল জলপথ পার হয়ে সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়েছি, উপকূল ধরে তখন এই সব দ্বীপ ও খালের দিকে যেতে যেতে দেখলাম, বড় বড় রুইমাছের মতো মাছের ঝাঁককে একজাতীয় তিমি মাছ পানির মধ্যে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। মাছগুলোর কাছাকাছি নৌকা নিয়ে যেতে বললাম। কাছে গিয়ে মনে হলো মাছগুলো মড়ার মতো অসাড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে। দু-চারটি মাছ মন্থরগতিতে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে আর বাকিগুলো আত্মরক্ষার জন্য দিশাহারা ও বিহ্বল হয়ে প্রাণপণ লড়াই করছে।

আমার হাত দিয়েই প্রায় গোটা চব্বিশ মাছ ধরলাম এবং দেখলাম মাছগুলোর মুখ দিয়ে ব্লাডারের মতো রক্তাভ একরকম কি যেনো বেরিয়ে আসছে। আমার মনে হলো এই ব্লাডারের সাহায্যেই বোধ হয় মাছগুলো ভেসে বেড়ায়, ডুবে যায় না। কিন্তু তাহলেও এগুলো এভাবে মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসবে কেন বুঝতে পারলাম না। ডলফিন বা তিমি মাছের তাড়া খেয়ে ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে লড়াই করতে গিয়ে হয়তো ব্লাডারটা মুখের বাইরে বেরিয়ে এসেছে এবং রক্তাভ হয়েছে। কথাটা অন্তত শতাধিক নাবিক ও মাঝির কাছে বলেছি এবং তাদের জিজ্ঞেস করেছি। অনেকেই আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি। একজন ডাচ নাবিক মাত্র আমাকে বলেছিল যে বড় নৌকা করে চীনের উপকূল দিয়ে যেতে সে এইরকম মাছ দেখেছে এবং ঠিক আমাদেরই মতো হাত দিয়ে অনেক মাছ ধরেছে।

---

৯. পিপ্‌লি বা পিপ্‌লিপত্তন বলে পরিচিত। একদা উড়িষ্যার উপকূলে সুবর্ণরেখা নদী থেকে প্রায় ১৬ মাইল দূরে, বিখ্যাত বন্দর ছিল। ১৬৩৪ সালে ইংরেজরা এখানে পর্তুগীজদের কুঠির বদলে একটি নতুন কুঠি স্থাপন করেছিলো বাণিজ্যের জন্য। নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য অনেক বন্দরের মতো পিপ্‌লিপত্তনের পতন হয়। এখানেই বার্নিয়ার পূর্বোল্লিখিত ইংরেজদের বাণিজ্যপোত দেখেছিলেন।—অনুবাদক।

পরদিন বেলা পড়ে গেলো, আমাদের নৌকা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে ধীরে ধীরে ভিড়লো। এমন একটি স্থান আমরা নোঙর করার জন্য বেছে নিলাম সেখানে বাঘের উপদ্রব বিশেষ নেই। সেখানে নেমে আমরা সেদিনের মতো (রাতে) বিশ্রাম নেয়ার জন্য প্রস্তুত হলাম। তীরে নেমে প্রথমে আগুন জ্বালানো হলো তারপর একটু নিশ্চিন্ত হয়ে আমি আমার খাবার জন্য গোটা দুই মুরগি আর কয়েকটা মাছ তৈরি করতে বললাম। তাই দিয়ে বেশ ভালোভাবেই সান্ধ্যাভোজন শেষ করা গেলো। মাছগুলোর স্বাদ খুব চমৎকার। তারপর আবার নৌকায় উঠে মাঝিদের বললাম রাত পর্যন্ত নৌকা বাইতে।

রাতের অন্ধকারে খালের আঁকাবাঁকা পথ চিনে নৌকা চালানো খুবই কঠিন। যে কোনো সময় পথ হারিয়ে বিপন্ন হবার সম্ভাবনা। সুতরাং বড় খাল থেকে সন্ধ্যার অন্ধকারের আগে বেরিয়ে এসে আমরা একটা ছোট খালের মধ্যে ঢুকে রাত কাটাবার সংকল্প করলাম। একটি বড় গাছের মোটা ডালে নৌকাটি শক্ত করে বাঁধা হলো। বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য তীর থেকে অনেকটা দূরে নৌকা সরিয়ে রাখা হলো।

রাতে নৌকায় বসে আছি, চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, এমন সময় প্রকৃতির এক বিচিত্র রূপ আমার নজরে পড়লো। দিল্লীতে থাকাকালীন এরকম দৃশ্য বারদুই দেখেছিলাম বলে মনে আছে। দেখলাম, চাঁদের রঙধনু। নৌকার সঙ্গীদের সব ঘুম থেকে ডেকে তুললাম দেখাবার জন্য। সকলেই দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলো।

আমার নৌকায় দুজন পর্তুগীজ নাবিক ছিল। এক বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে আমি তাদের আমার নৌকায় স্থান দিয়েছিলাম। সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়ে গেলো সেই পর্তুগীজ নাবিক দুজন। তারা বলল যে, এরকম রঙধনু তারা এর আগে আর কখনো দেখেনি এবং কারো কাছে শোনেওনি রাতের এই রঙধনুর কথা।

তৃতীয় দিন আমরা খালের মধ্যে একরকম পথ হারিয়ে নিখোঁজ হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিলাম বলা চলে। কাছাকাছি দ্বীপে কয়েকজন পর্তুগীজ লবণ তৈরির কাজ করতো। তারাই আমাদের সে যাত্রা নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে উদ্ধার করেছিলো। তারা না থাকলে আমাদের পক্ষে পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতো কি না সন্দেহ। সেই রাতে আবার আমরা একটি ছোট খালের মধ্যে নৌকা ভিড়ালাম। আমার পর্তুগিজ সঙ্গীরা তার আগের দিন ঐ রকম বিচিত্র দৃশ্য দেখে সেই রাতে আর নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেনি। আকাশের দিকে চেয়ে জেগে ছিল। সেই রাতে তারা আমাকে আবার সেই রঙধনুর দৃশ্য দেখবার জন্য ঘুম থেকে ডেকে তুললো। ঠিক সেদিনের রঙধনুর মতোই সুন্দর ও মনোহর কোনো আলোকমণ্ডল বা তারকামণ্ডলকে যে আমি ভুল করে রঙধনু বলছি তা

নয়। বর্ষাকালে দিল্লীতে সেরকম তারকামণ্ডলি আমি আকাশ আলোকিত করতে বহুবার দেখেছি। কিন্তু সাধারণত সেগুলো অনেক উঁচুতে দেখা যায়। পরপর তিন-চার রাত ধরে আমি দেখেছি এবং মধ্যে মধ্যে দ্বিগুণ আকারে দেখেছি। কিন্তু আমি যে আলোকমালার কথা বলছি তা চাঁদকে ঘিরে বৃত্তাকারে উদ্ভাসিত নয়। চাঁদের বিপরীত দিকে, ঠিক দিনের আলোর রঙধনুর মতো উদ্ভাসিত। যখনই রাতের এই রঙধনু দেখেছি তখনই দেখেছি চাঁদ রয়েছে পশ্চিমে আর ঐ আলোকমালা পূর্বে। চাঁদ মনে হয় পূর্ণিমার চাঁদ। তা না হলে ঐ রকম আলোকমালা বিচ্ছুরিত হয়ে রঙধনুর আকার ধারণ করতো না। আলো যে খুব উজ্জ্বল সাদা তা নয়, নানা রঙের ছটা তার মধ্যে পরিষ্কার দেখা যায়। সুতরাং আমি প্রাচীনদের চাইতে অনেক বেশি ভাগ্যবান বলতে হবে। কারণ দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, তাঁর আগের যুগের কেউ কোনোদিন চাঁদের রঙধনু দেখেনি।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যবেলা আমরা আবার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বড় খাল থেকে বেরিয়ে এসে ছোট খালের মধ্যে ঢুকলাম। সেই রাতটি একটি স্মরণীয় রাত। হঠাৎ যেনো মনে হলো চারদিকে স্তব্ধ হয়ে গেলো। পরিপার্শ্ব থমথমে হয়ে উঠলো। হাওয়ার কোনো চিহ্ন দেখা যায় না, অনুভবও করা যায় না। বাতাস বন্ধ হয়ে গেলো। মনে হলো যেনো আমাদের স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে। ক্রমে বাতাস বেশ গরম হয়ে উঠলো। চারদিকের ঝোপে-ঝাড়ে জোনাকি পোকাগুলো এমনভাবে জ্বলছিল যে মনে হচ্ছিলো যেনো বনে আগুন ধরে গেছে! তারই মধ্যে আবার সত্যই আগুনের মতো কি যেনো ধপধপ করে জ্বলে উঠেছিলো। দূরে গভীর বনের মধ্যে আগুনের শিখা দাউদাউ করে জ্বলে উঠে নিভে যাচ্ছে। মাঝিরা বেশ ভীত হয়ে উঠলো দেখলাম। তাদের বিশ্বাস, এসব বনের ভূতপ্রেতের অপকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। আগুনের এই বিচিত্র লীলার মধ্যে দুটি দৃশ্যের কথা আমার বেশ মনে আছে। একটি গোলাকার বলের মতো আগুন, আর একটি প্রজ্বলিত বৃক্ষের মতো দেখতে। মিনিট পনেরো জ্বলে উঠে আবার নিভে গেলো।

পঞ্চম রাত্রিটি সবচেয়ে বিপজ্জনক ও মারাত্মক হয়েছিলো। প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিলাম আমরা। এমন ভয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিলো যে হঠাৎ যে আমার গাছপালার মধ্যে নিরাপদে থেকেও এবং আমাদের নৌকা বেশ শক্ত করে বাঁধা থাকলেও প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো আমরা ছিটকে গিয়ে বড় খালের মধ্যে পড়ে তলিয়ে যাবো। তা যেতামও, কারণ নৌকার দড়ি ঝড়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু হঠাৎ আমাদের মাথায় অনেকটা প্রাণের দায়ে বুদ্ধি খেলে গেলো। আমরা তৎক্ষণাৎ (আমি ও আমার দুজন পর্তুগীজ সঙ্গী) গাছের ডাল প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে ঝুলতে লাগলাম। প্রায় দু-ঘণ্টা এভাবে ডাল ধরে ঝুলে

রইলাম। প্রবল বেগে ঝড় বইতে লাগলো। আমার ভারতীয় মাঝিরা নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত ছিল। কেউ আমরা কারো দিকে চেয়ে দেখার সুযোগ পাইনি। গাছের ডাল ধরে ঝড়ের মধ্যে যখন আমরা ঝুলে ছিলাম, তখন আমাদের রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিলো। কলকল করে অঝোরে বর্ষণ হচ্ছিল এবং এমন সশব্দে চারদিক আলোকিত করে বজ্রপাত হচ্ছিলো যে আমাদের প্রতি মুহূর্তেই মনে হচ্ছিলো এখনই বুঝি মাথায় পড়বে। এভাবে সে রাত আমাদের কাটলো। কোনোরকমে আমরা প্রাণে বেঁচে গেলাম।

বাকি পথটা আমাদের ভালোই কেটেছিলো, বেশ আরামে। নয় দিনের দিন আমরা হুগলী (Ogouly) পৌঁছলাম। চারদিকে যতোদূর দৃষ্টি যায়, গঙ্গার উভয় তীরের মনোরম দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে গেলো। একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইলাম। নৌকা গঙ্গার বুকে ভেসে চললো। হুগলী পৌঁছলাম। আমার বাক্স-পেট্‌রা জামা-কাপড় সব ভিজে গেছে তখন। মুরগিগুলো মরে গেছে, মাছের অবস্থাও তথৈবচ এবং বিস্কুটগুলো সব পানিতে ভিজে ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

–অনুবাদকাল: ২৩. ১২.২০১৬

পরিশিষ্ট

MARX TO ENGELS
London, 2, june, 1853

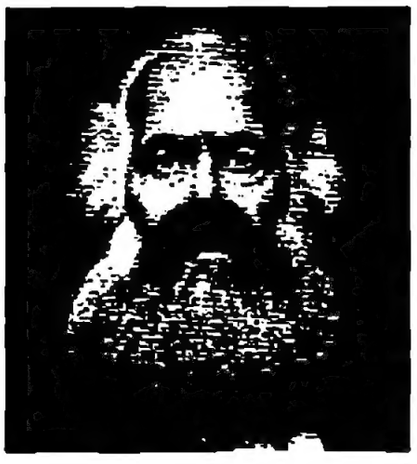

About the Hebrews and Arabians yours letter intersted me very much. For the rest: (1) A general relationship can be proved among all oriental tribes, between the settlement of one section of the tribe and the continuance of the other in nomadic life, since history began. (2) In Mohammed's time the trade route from Europe to Asia had been considerably modified and the cities to Arabia, Which took a great part in the trade to India, etc, were i a state of commercial decay; this in any case contributed to the impulse. (3) As to religion, the question resovles itself into the general and therefore easily answered one; why does the history of the East appear as a history of religions?

On the formation of oriental cities one can read nothing more briliant, vivid and striking than old Francois Bernier (nine years physician to Aurengxebe) : Voyages conteant la description des etats du Grand Mogol, etc. [Travels containing a Description of the states of the Great Mogul, etc.] He also decribes the military system, the way these great armies were fed, etc, very well. On these two pointsz he remarks among other things: The cavalry forms the principal section, the infantry is not so bis as is generaly remoured, unless all the servants and people from the bazars or markets who follo the army are confused with the real fighting force; for in that case i could well belive that they would be right in putting the number of men in the army accompanying the king along at 200, 000 or 300,000 and sometimes even more, when for example it is certain that he will be a long time absent from the principal town, And this will not appears so very astonishing to one who knows the strang encumbrance of tents, kitchens, clothes, furniture and quite frequently even of women, anc consequently also the elephants, camles, oxen, horses, porters, foragers, provision sellers, merchants of all kinds and servitors which these armies carry in their wake; or one who understands the particular state and goverment of the country, namely that the king is the sole and only proprietor of all the land* in the kingdom, from which it follows by a certain necessary

---

* Underlined by marx

consequence that the whole of a captial city" like Delhi or Agra lives almost entirely on the army and is therefore obliged to follow the king of he takes the field for any length if times. For these towns are cannot be anything like a paris, being properly speaking nothing but military camps" a little better and more conveniently situated than in the open country."

On the occasion of the march of the great Mogul into kashmis with an army of 400,000 men, etc. he says: The diffcultu is to understand whence and how such a great army, such a great number of men and animals, can subsist in the field. For this it is only necessary to suppose, what is perfectly true, that the Indians are very sober and very simple in their food, and that of all great number of horsemen not the tenth nor even the twentieth part eats meat during the march. So long as they have their kicheri, or mixture of rice and other vegetables over which when it is cooked they pour melted butter, they are satisfied. Further it is necessary to know that camels have extreme endurance of work, hunger ant thirst, live on little and eat anything, and that as soon ad the army has arrived the camel drivers lead them to graze in the open country where they eat everything they can find. Moreover, the same merchants who keep the bazaars in Delhi are forced to maintain them in the country too, likewise the small merchants, etc.And finally with regard to forage, all thse poor folk go roaming on all sides in the villages to buy and to earn something, and their great and common ressort is to scrape whole fields with a sort fo small trowel, to cruch or cleanse the small hereb which they have scratched up and to bring it to sell to the army.."*

Bernier rightly considers that the basic froms of all phenomena in the East-he refers to turkey, Persia, Hindustan-is to be found in the fact that no private property in land existed. This is the real key, even to the oriental heaven.

ENGELS TO MARX

[Manchester] 6 june [1853]

The absence of property in lands is indeed the key to the whole of the East. Here lies its politicaql and religious history. But how it come about that the Oriental do not arrive at landed property, even in its feudal from? I think it is mainly due to the climalt, together with the natutres of the soil, especially with the great stretches of desert which extend from the sahara straight across Arabia, Persia, India and Tarstary up to the highest Asiatic plateau. Artificial irrigation is here thre first condition of agriculture and this is a matter either for the

---

* Quated from the French Marx and Engels: Selected correspondence: translated and edited by Dona Torr; London 1943, Letters 22 and 23.

communes, the provinces or the cmtral government. And an oriental goverment never had more than three departments: finance (plunder at home), War (plunder at home and abroad), and public works (provision for reproduction). The British government in India has administered numbers 1 and 2 in a rather more formal manner and dropped number 2 entirely, and Indian agriculture is being ruined. Free competion discredits itself there completely. This artficail fertilisation of the land, which immediately ceased when the irrigation system fell into decay, explains the otherwise curious fact that whole stretches which were one briliantly cultivated are now waste and bare (plmyra, petra, the ruins in the Yemen, districts in Egypt, persia and Hindustan); it explains the fact that one single devastating war could depopulate a country for centuries and strip it of its whole civilisation. Here too, I think, comes in the destruction of the southern Arbians trade before Mohammed, which you very rightly regard as one of the chief factors in the Mohammedan revolution. I do not the trade history of the first six centuries after christ thoroughly enough to be able to judge how far general material world conditions casued the trade routes paersia to the Black Sea and through the persian Gulf to syria and Asia Minor to be perferred to the route over the Red Sea. But in any case the relative security of the caravans in the ordered persian Empire of the Sassanids was not without considerable effect. while between the year 200 and 600 the Yemen was almost continuously subjugated, invaded and plundered by the abyssinians. The cities of Southern Arabian, Which were still flourishing in the time of the Romans, were sheer ruined wastes in the seventh century; within five hundred years the nighbouring Bedouins had adopted purely mythical, fabulous traditions of their origin (See the koran the Arabian historian Novairi), and the alphabet in which the inscription in that part are written was almost totally unknown, although there was no other, so that even writing had actually fallen into oblivion. Things of this sort imply, besides a "Superseding" caused by some kind of general trade conditions, some absolutely direct and violent destruction which can olny be explained by the Ethiopian invasion. The expulsion of the abyssinians took place about forty years before Mohammed and was obviouly the first act of the awakening Arabian natioan consciousness, which was also spurred by persian invasions from the North, pushing forward almost to Macca. I am only starting on the history of Mohammed himself in the next few days; up till now, however, the movement has seemed to me to have the characher of a Bedouin raction against the settled but degenrate fellahin of the towns, who at that

time had also become very decadent in their religion, mingling a corrupt nature-cult with corrupt judaism and christianity.

Old Bernier's things are really very fine, it is a real delight once more to read something by a sober old clear-headed Frenchman, who keeps hitting the nail in the head without appearing to notice it...